প্রাচীন কাব্য

সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত

প্রচ্ছদ পরিচিতি : সমুদ্রবক্ষে শ্রীমন্তের কমলে-কামিনী দর্শন [কাষ্ঠ খোদাই] ।

প্রকাশক :



শ্রীরূপশো, মিত্র
৬০ জেমস লঙ্‌, সরণি
কলিকাতা : ৭০০ ০৩৪

প্রথম প্রকাশ :
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৬

মুদ্রক :
শ্যামলকুমার সাউ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা-৭০০০ ০৬

মৃন্ময় গুপ্তশর্মা
সরযূবালা দেবী
বাবা-মায়ের শ্রীচরণে
আমার প্রথম কাজ

আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্তের আশীর্বাণী

[প্রথম সংস্করণের]

সাম্প্রতিক কালে বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকখানি বই প্রকাশিত হইয়াছে। তরুণ ও প্রবীণ বিভিন্ন লেখকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী হইয়াছেন। সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে ঐকমত্য অপেক্ষা দৃষ্টিকোণের এই বৈচিত্র্যই অধিকতর স্বাগত, কারণ এই দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্য স্বভাবতঃই আমাদের সাহিত্য-সমালোচনাকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতেছে।

দৃষ্টিভঙ্গির সেই স্বাতন্ত্র্য লইয়াই অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয়ও আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সমালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রথম প্রয়াসে রচিত 'প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন' গ্রন্থখানি আস্বাদন ও আলোচনের জন্ম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বাঙলা প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-কবিতা লইয়াই আলোচনা, কিন্তু নামটি দেখিলেই বা গ্রন্থের কিয়দংশ পড়িলেই বোঝা যাইবে, গ্রন্থখানি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ঠিক ইতিহাস গ্রন্থ নয়, অর্থাৎ এখানে লেখকের কোনও ঐতিহাসিক নবাবিষ্কারের অথবা ঐতিহাসিক নববিস্থা-নৈপুণ্যের দাবী নাই; এ-সকল বিষয়ে তিনি প্রচলিত সাহিত্য-ইতিহাসগুলির উপরেই মোটামুটিভাবে নির্ভর করিয়াছেন। বাঙলা-সাহিত্যের যুগ-বিভাগ সম্বন্ধে তিনি অবশ্য গ্রন্থের ভূমিকাভাগে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন—উন্মেষপর্ব, অন্ধকারপর্ব, প্রতিষ্ঠাপর্ব, ঐশ্বর্যপর্ব এবং অবক্ষয়পর্ব; কিন্তু আলোচনার সময়ে, লেখক নিজেও এই যুগবিন্যাসকে খুব কঠোরভাবে অনুসরণ করেন নাই। লেখকের বৈশিষ্ট্যের দাবী তাই ইতিহাস রচনায় নয়, আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের কাব্যসৌন্দর্যের বিশ্লেষণের সাহায্যে আমাদের সমস্ত অতীত সাহিত্যের নব মূল্যায়নে। লেখকের এই অভিপ্রায়টিকে প্রথম হইতে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা হয়ত তিনি তাঁহার গ্রন্থে যে কাজ করিতে চাহেন নাই, তাহা তাঁহার গ্রন্থে কেন করা হয় নাই এমন অভিযোগ আমাদের পাঠকমনে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে পারে।

কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নব মূল্যায়নের জন্যও একটি ইতিহাস-চেতনার প্রয়োজন এই মৌলিক সত্যটি সম্বন্ধে বর্তমান লেখক যথেষ্ট অবহিত, এবং এই কার্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি স্পষ্ট ইতিহাস-চেতনা যে তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে 'প্রাচীন বাংলা কাব্যপাঠের ভূমিকা' শীর্ষক প্রারম্ভিক আলোচনাটিতেই তিনি তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন। এই আলোচনাটি

সুসংহত এবং চিন্তা-উদ্রেককারী সঙ্কেতযুক্ত। এই আলোচনাটি পড়িলে বোঝা যায়, ইতিহাস-চেতনার ক্ষেত্রে তিনি মার্ক্সপন্থী; মানুষের সাহিত্য, সৌন্দর্য ও অন্যান্য সকল সুকুমার-বোধের মূলভিত্তি যে অর্থনীতিতে এ-বিষয়ে তাঁহার প্রত্যয় দৃঢ়। বিভিন্ন যুগের কাব্য-কবিতার সৌন্দর্য বা অন্যান্য সাহিত্যগুণ বিচার-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি ইতিহাসের পটভূমির প্রতি মার্ক্সীয় পন্থায় মাঝে মাঝে ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও তাঁহার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ছাঁচে-ঢালা নয়; তাঁহার প্রত্যয়ের অনুকূল তথ্য যেখানে সহজলভ্য নহে সেখানে তিনি অনুকূল তথ্যের অনুমানের উপরে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। চিন্তার কঠোরতার পরিবর্তে এই স্থিতিস্থাপকতা-গুণ তাঁহার দৌর্বল্যের পরিচায়ক হয় নাই, সত্যনিষ্ঠারই পরিচায়ক হইয়াছে।

প্রারম্ভিক আলোচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যহীনতার কারণ সম্বন্ধে তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। বাঙলার ভূমিনির্ভর কৃষিপ্রধান অর্থনৈতিক জীবনের সহিত এই তথ্যের যে নিবিড় যোগ রহিয়াছে এ-কথা অনস্বীকার্য। শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগে কেন, বর্তমান যুগেও লক্ষ্য করিতে পারি আমাদের সাহিত্যে বিষয়বস্তুর দিক হইতে এবং লেখকের পরিপ্রেক্ষিতের দিক হইতেও কতকগুলি সীমা আছে; এই জন্য আধুনিক যুগের শক্তিশালী লেখক-গণের মধ্যেও ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাভাবের আত্মানুবৃত্তির প্রবণতা দেখা যায়। কৃষি-জীবিকার পরিবর্তন ঘটিয়া সমাজজীবনে যত বেশী আলোড়ন দেখা দিতেছে বৈচিত্র্যের বাসনা ও সাধনাও ততই আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক এই সত্যটির প্রতি সার্থকভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া লেখক এই সময়কার সমগ্র সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন নাই; তাঁহার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য তাহার জন্য ইহার প্রয়োজনও ছিল না; তিনি তাই আলোচনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ বিশেষ কবির কাব্য-কবিতাই বাছাই করিয়া লইয়াছেন। বিশেষ বিশেষ ধারার মুখ্য কাব্য কবিতার বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের সম্মুখে থাকিলেই আমরা আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সাহিত্য-মূল্যের মোটামুটিভাবে পূর্ণ পরিচয়ই লাভ করিতে পারিব এই বিশ্বাসই লেখককে এই-জাতীয় নির্বাচনে অনুপ্রেরিত করিয়াছে। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে—বা নির্বাচিত কাব্য-কবিতার বিচার-বিশ্লেষণ এবং তল্লব্ধ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লেখকের সহিত সর্বত্র পাঠক-সাধারণের ঐকমত্য থাকিবে এই-জাতীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে সেই জাতীয় বাসনা লইয়া অগ্রসর হওয়া কোন ক্ষেত্রেই সমুচিত নয়। আমার নিজের সহিতও লেখকের মতের ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্য কিছু কম নহে; কিন্তু এই মতের ঐক্য-অনৈক্য গ্রন্থখানির মূল্য নির্ধারণে নিশ্চয়ই প্রধান কথা নহে। সর্বক্ষেত্রেই লেখকের বিচার-বিশ্লেষণ ও মতামতের অভিনবত্ব ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিবে এমন আশাকেও সাধু আশা বলিতে পারি

না; স্থানে স্থানে আমাদের কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু মন যদি সচকিত হইয়া ওঠে তবেই লেখকের চেষ্টা সার্থক। গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ সচকিত হইয়া উঠিবার অনেক অবকাশ রহিয়াছে, ইহাকেই আমি গ্রন্থখানির সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ বলিয়া মনে করি এবং সেই কারণেই প্রাচীন ও মধ্য বাঙলার সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ হিসাবে আমি এই গ্রন্থখানিকে স্বাগত জানাইতেছি।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৫শে আগষ্ট, ১৯৫৯

নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের জন্মকাল থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত প্রধান প্রধান কবিদের কাব্য-কবিতার সাহিত্য-সৌন্দর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ড. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী, ড. শ্রীসুকুমার সেন, ড. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীবিভূতি চৌধুরী এবং শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সাহিত্য-বোধের প্রথম পাঠ লাভ করার যে সুযোগ পেয়েছিলাম আমার নিজস্ব ধারণাকে গড়ে তুলতে তা নানাভাবে সাহায্য করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ড. শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে বন্ধুবর অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে বন্ধুবর শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার, বন্ধুবর শ্রীচিন্ময় মজুমদার, বন্ধুবর অধ্যাপক বিজিত দত্ত যে সাহায্য করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। জ্যোৎস্না গুপ্ত এ গ্রন্থের মৌল চিন্তার [যদি আদৌ কিছু থাকে] ভিত্তি স্থাপনে লেখককে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ ত্রুটিমুক্ত হয় নি। এ জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। নিবেদক—

ক্ষেত্র গুপ্ত

সিটি কলেজ, কলিকাতা।
২৬শে আগষ্ট, ১৯৫৯।

বিষয়সূচী

১. প্রাচীন কাব্যে সৌন্দর্যের খোঁজে

এক

প্রাচীন শব্দটির দ্বারা আমি উনিশ শতকের আগেকার বাংলা সাহিত্যকে নির্দেশ করছি। তুর্কিবিজয়-পূর্ববর্তী চর্যাপদ এবং মধ্যযুগের তাবৎ রচনাকে আমি 'প্রাচীন'-এই পরিচয়ে উপস্থিত করছি। অবশ্যই তাবৎ রচনাকে আলোচনায় আনিনি, নির্বাচিত অল্পকিছু লেখারই বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। যে-সব রচনায় সাহিত্যিক রূপ-উপভোগের মতো কিছু আমার চোখে পড়েছে তাদের প্রসঙ্গই মাত্র এ বইয়ে আনা হয়েছে। গোড়াতেই তাই বলে রাখি—এ-বই সাহিত্যের ইতিহাস নয়। কোনো লেখক বা লেখার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয় এখানে আমার লক্ষ্য নয়। সেকালের সমাজ ও ধর্মকে বোঝার চেষ্টা আমি করিনি। অথচ সে-সবই আমার ভাবনায় থেকেছে, কোনো না কোনো দিক থেকে আমার সৌন্দর্য-বিচারকে প্রভাবিত করেছে। ইতিহাসকে, সমাজকে, ধর্মকে, ট্রাডিশন বা ঐতিহ্যকে এড়িয়ে গিয়ে শিল্প-মূল্যের ব্যাখ্যা তো করা সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যাস্বাদকে ইতিহাস বিচার, সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কিংবা ধর্মীয় বোধের প্রতিফলনের সঙ্গে একাকার করে ফেলাও মোটেই কাজের কথা নয়। পুরনো যুগের কিংবা আধুনিক যুগেরই হোক, কোনো লেখা হয়তো ঐতিহাসিক বিচারে খুব মূল্যবান। কিন্তু তা সাহিত্য হিসেবে মূল্যবান নাও হতে পারে। আবার সাহিত্য হিসেবে মূল্যবান লেখামাত্রেই যে সাহিত্যের ইতিহাসে বড় জায়গা পাবে তার মানে নেই।

সেকালের সাহিত্যমাত্রের ধর্মের এবং বিবিধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও তত্ত্বদর্শনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ লক্ষ্য করা যায়। অনেক লেখাই নির্দিষ্ট ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত। এই কাজ নিপুণভাবে করতে পারার সঙ্গে শিল্পরূপের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং উল্টে দেখা যায় ধর্মপ্রচারের জন্য তথা তত্ত্ববোধের ফলে বহু লেখা তার শিল্পগুণ হারিয়েছে। কেউ কেউ ধর্মতত্ত্বকে আত্মসাৎ করে ভাষায় আকৃতি দিতে পারেন। তিনি সার্থক শিল্পী। যিনি আত্মসাৎ করতে পারেন না, যাঁর ভাষা ও প্রকাশরীতি তত্ত্ব ও ধর্মকে বহনই করে বেড়ায়, তিনি সাহিত্যিক হিসেবে ব্যর্থ। কোনো লেখক রূপ-সৌন্দর্যের পক্ষে ধর্ম-দর্শনের চাপের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কেউ জেতেন। তিনি সফল সাহিত্যিক। কেউ হারেন। তিনি সাহিত্যিকরূপে বিফল। কারও লেখায় এই যুদ্ধের চিহ্ন লেগে থাকে। সাহিত্য-শিল্পের দিক থেকে সেরূপ লেখক খুবই ইণ্টারেস্টিং—কৌতূহলোদ্দীপক।

অনেকেই পুরনো দিনের সমাজ-বাস্তবতার পরিচয় নিতে গিয়ে সেকালে সাহিত্যের এক ধরনের ব্যাখ্যা করেন। সেই চর্চার দাম থাকলেও শিল্পগুণ

নির্ণয় একটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া। একালে সাহিত্যশিল্প চর্চার বাইরে, অন্যান্য বিদ্যা-শৃঙ্খলায় যেমন ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিতে সাহিত্যকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার একটা রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সেইসব চর্চার অন্য যে কোনো মূল্যই থাকুক, তাকে 'লিটেরারি এসথেটিক্‌সের' সঙ্গে যেন গুলিয়ে ফেলা না হয়। আন্তর্বিদ্যা-শৃঙ্খলার চর্চা আজকাল খুবই আদৃত হচ্ছে, তার মানে অবশ্য এ নয় যে প্রতিটি বিদ্যা-শৃঙ্খলার নিজস্ব বিশিষ্ট চর্চাকে বিসর্জন দিতে বা গুলিয়ে ফেলতে হবে।

দুই

পুরনো বাংলা সাহিত্যের শিল্প সৌন্দর্য নিয়ে মাথা কম ঘামিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের গবেষকেরা। পুরনো সাহিত্যের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেনের একটি সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ ছিল, যদিও তার প্রয়োগ অল্পস্বল্পই করতে পেরেছিলেন তিনি। ড. সুকুমার সেন এদিকে নজর দেননি। যদিও রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার ব্যাখ্যানে বারংবার শিল্পবোধের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। পরে নব্য সাহিত্যের সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষ্ণব কবিতা এবং মঙ্গলকাব্যে সমানভাবে তাঁর নব্য সমা-লোচন-দৃষ্টি ফেলেছেন। যেভাবে কোনো উপন্যাসের বিচার করেন, সেইভাবে একটি মঙ্গলকাব্যের বিচার, এবং যেভাবে একালের গীতিকবিতার সৌন্দর্যসন্ধান করা হয় সেইভাবে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর বিচার, এটাই শ্রীকুমারবাবুর পদ্ধতি ছিল। খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। শ্রীকুমারবাবুর সমালোচন-আদর্শ এবং পদ্ধতির সঙ্গে আমার কিছু পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু মধ্যযুগের কাব্য আলোচনাকে আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার সমপর্যায়ে নিয়ে আসার যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন, আমি গুরু-নির্দেশিত সেই পথেই চলতে চেয়েছি। তবে চলাটা আমার নিজের, তাই কিছু স্বাতন্ত্র্য পদ্ধতিগতভাবেও সতর্ক পাঠক দেখতে পাবেন।

কাব্য-কবিতার আঙ্গিক পর্যালোচনা, আবয়বিক নিরীক্ষা, ঘটনাসংস্থান, বর্ণনা ও সংলাপের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য-বিধান, বিবৃতি-লিরিক-নাট্যরস মিশ্রিত করার কৌশল এগুলি বিশ্লেষণ করতে করতে কবির মনের হদিশ যেমন নিতে চেয়েছি, তেমনি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে লেখকের জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে বোধ আমি ধরতে চেয়েছি। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে শব্দ-বিশ্লেষণের উপরে জোরটা পড়েছে বেশি। শব্দ-অর্থের সম্পর্ক ও বিবাদ, শব্দে শব্দে মিলন ও বিচ্ছেদ, শব্দ-চিত্রে প্রতি-ফলিত কবিচিত্তের স্বরূপসন্ধান আমার লক্ষ্য ছিল।

সর্ববিধ কবিতায় বর্জন করেছি অলংকারের তালিকা। কারণ আধুনিক রীতির সমালোচনায় ঐ তালিকা—ঐ নামকরণের জটিল প্রাচুর্য, কাব্য-সৌন্দর্য বিচারে আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। কিন্তু অলংকার ব্যবহারের প্রবণতা, তার বাহুল্য বা স্বল্পতা অথবা একেবারে নিরলংকার হবার মধ্য দিয়ে রচনার স্বাদের যেমন তারতম্য ঘটে তেমনি লেখকের মনেরও বিচিত্র প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথার্থ সাহিত্য-

মূল্যায়নের সঙ্গে এই ধরনের অলংকার-বিচারই মাত্র সংশ্লিষ্ট।

তিন

বাংলা পুরনো কাব্য-কবিতা সমালোচনায় কতকগুলি বিশেষ ধরনের সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলির উদ্ভব ঘটেছে ঐ যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের ফলে। শিল্পরূপ সন্ধানী পাঠক ও সমালোচককে তাই ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে হয়। এখানে উক্ত সমস্যাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।—

১ অধিকাংশ লেখাই ধর্মপ্রচারের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি। অনেকে সচেতন-ভাবে শিল্প-সৌন্দর্যের কথাটা ভাবেনও নি।

২. অধিকাংশ লেখাই ঐতিহ্যবাহিত। একই কাহিনী একই চরিত্র নিয়ে অনেক লেখক লিখেছেন। কয়েকটিমাত্র কাহিনী বিপুল মঙ্গলকাব্যের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কবিতায় নির্ধারিত কতকগুলি মুড। শ্যামাসঙ্গীতে একই ধরনের রূপকল্পনা, একই রকমের প্রার্থনা। কাহিনীর বিন্যাসে একই ফ্রেম, লিরিকের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পর্যায় বিভাগ। ফলে বিষয় ও বিন্যাসে মৌলিকতার সুযোগ নেই।

৩ শিল্পীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রচনার দৃষ্টিকোণে প্রতিফলিত হয়। এগুলি মিলে লেখায় আসে পৃথক পৃথক উপভোগ্যতা—রঙ গন্ধ স্বাদ। সেকালে কবিদের ব্যক্তিত্ব থাকত অবগুণ্ঠিত। ফলে শিল্পভোগের ঐ মাত্রাটি প্রায়ই ধরা পড়ত না।

এই তিনটি বাধা সত্ত্বেও দেখা যায়, যদি কেউ তীক্ষ্ণ শিল্পবোধ নিয়ে দেখতে চান তো—ধর্মাদি প্রচারের মধ্য থেকেও কমবেশি শিল্পচেতনার পরিচয় দিচ্ছেন লেখকেরা। একই ধরনের কাহিনী কাঠামোয় কিংবা একই ফর্মাটের ভাবাবেগ ও মুডের মধ্যেও কেউ বেশি কেউ কম নতুন বাঁক, উপাখ্যান, স্বভাব চরিত্রে কিছু মোচড় নিয়ে আসেন। প্রথার চাপে ক্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে ঘুমন্ত মৌলিকতা খুঁজে বের করার দৃষ্টি এই ধরনের কাব্য-কবিতার সমালোচকের থাকা চাই। নইলে তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। মঙ্গলকাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা একটি প্রথাগত প্রসঙ্গ। অথচ এই বাঁধাধরা বৈচিত্র্যহীন বিষয়ে দুজন কবির লেখা কত পৃথকই না হতে পারে। ভারতচন্দ্র এর মধ্য দিয়ে সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, বিশেষত যারা রাজকীয় কর্মে নিযুক্ত তাদের প্রতি ব্যঙ্গবর্ষণ করেন। কবির সমাজ-চেতনা এবং সোশ্যাল স্যাটায়ারের রস এর মধ্যে লভ্য। আবার বিজয় গুপ্ত একে একটু যৌনতাশ্রয়ী উদ্ভট রসের আশ্রয় করে তুলেছেন। ভারতচন্দ্রে যেখানে মার্জিত বৈদগ্ধ, বিজয় গুপ্ত সেখানে স্থূল—উচ্চহাস্য।

□

২. চর্যাগীতি

এক

চর্যাগীতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলা ভাষায় লেখা কবিতার এই প্রথম সংকলনটির প্রতি বাঙালি মাত্রেরই দুর্বলতা আছে,—এর ঐতিহ্য আর বৈশিষ্ট্যকে আলোচনায়-বিতর্কে সগর্বে উল্লেখ করে বাঙালির জাতিসত্তা তৃপ্তি পায়। কিন্তু রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে, চর্যাপদের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কেউ নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করেছে বলে জানা যায়নি। মধুসূদন কিংবা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা জীবনানন্দ—এঁদের কবিতা পড়তে পড়তে কেবলমাত্র রসবোধের খাতিরে কেউ চর্যার একটি পদও আবৃত্তি করেছে কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ জাতীয় গৌরব-বর্ধনে চর্যাগীতি-সঙ্কলনকে আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু উপভোগের জগতে তার প্রবেশাধিকার স্বীকার করিনি।

বাংলা গদ্যের প্রথম চেষ্টার যুগে লেখা একান্ত স্কুলপাঠ্য কিংবা স্ত্রী ও শিশুসেব্য পুস্তিকাগুলিকে সাহিত্যের ইতিহাসে পরমোৎসাহে এবং সুগভীর তাৎপর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয়েছে, সম্মান দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সে তাদের সাহিত্যিক গুণের জন্য নয়, লেখ্য সাহিত্যে গদ্যভাষার ব্যবহারের ঐতিহাসিক সম্ভাবনার দিক থেকে। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' কিংবা মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলী' রসসাহিত্য হিসেবে অবশ্যই গ্রাহ্য নয়, যদিও গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে গর্বোন্নত মস্তকে তাদের সম্যকপ্রতিষ্ঠা।

চর্যাগীতি সম্বন্ধেও কি একই কথা?

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ—এ-কথা কি কেবল বাংলা ভাষার দিক থেকে সত্য, না বাংলা সাহিত্যের দিক থেকেও?

দুই

চর্যার সাহিত্যরস আস্বাদে বাধা অনেক,—ভাষার, বর্ণনাভঙ্গির আর ধর্মতত্ত্বেরও।

হাজার বছর আগেকার এই কাব্যসঙ্কলনের ভাষা যে বাংলা, আজকের বাঙালিকে অন্ধের চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। ভাষাই সাহিত্যের দেহ—তার অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা সাহিত্য-সৌন্দর্যে পৌঁছবার পক্ষে প্রধান বাধা। অনেকের কবিতা 'বুঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য'—কিন্তু কবিতা সেখানে সঙ্গীতের কাছে সমর্পিত-আত্মা। কবিতা কবিতা থেকেই যদি হৃদয়ের তারে বাজতে চায় তো বুঝবার পথ ছাড়া নান্য পন্থা।

প্রসঙ্গত আর একটি কথা স্মরণযোগ্য—image-এর অস্পষ্টতা-দুর্বোধ্যতা আর ভাষার অস্পষ্টতা-দুর্বোধ্যতা কিন্তু সমার্থক নয়। Image বা চিত্রকল্প কবি-ব্যক্তিত্বের

জটিল মিশ্রণে কখনও বহুবক্র, অজস্র বর্ণ-বিচ্ছুরিত আর অতল অভীর; রসিক-চিত্তের নিষ্ঠায় তাদের মর্মোদ্‌ঘাটন চলে। অপরপক্ষে ভাষার বোধগম্যতা কিন্তু সদর দরজা, এটি উন্মোচিত না হলে অন্তরের সরল গভীর কোন রস-লোকেই 'প্রবেশ সম্ভব নয়।

চর্যাগীতির সামনে দাঁড়িয়ে তাই মনে হয়, অভিধানের সাহায্যে প্রতিটি শব্দার্থ ভেদ করে পরীক্ষার পাঠ তৈরি হয়, রসাস্বাদ হয় না। চর্যার কিছু শব্দ পরিচিত, কিছু বা অর্ধপরিচিত, তারা আকর্ষণ করে কিন্তু আশ্বাস দেয় না।

দ্বিতীয় বাধা এর সুপ্রাচীন রহস্যমণ্ডিত ধর্মতত্ত্ব আর সাধনপ্রণালী। এ সাধনপ্রণালী গুহ্য তাই সাধারণের কাছে প্রকাশিতব্য নয়:

অইসন চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়। / কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইড়॥

অর্থাৎ এই চর্যা কুক্কুরীপাদ গাইল, কোটির মাঝে গুটিকের হৃদয়ে প্রবেশ করল।

ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই॥

অর্থাৎ ভুসুকু বলছেন, মূঢ়ের (সাধারণ মানুষের, যারা সাধনতত্ত্ব জানে না) হৃদয়ে কিছুই প্রবেশ করছে না। গুরুশিষ্য পরম্পরায় এর বিস্তৃতি। সহজিয়া মতবাদের নানা সূক্ষ্মতা, বজ্রযান-সহজযান-কালচক্রযানের বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণ, যোগ-তন্ত্র-কায়াসাধনের অজস্র জটিলতায় এর আনাগোনা। কোন কোন পদে আবার আভ্যন্তর অর্থটি বক্রবাচনে, বিপর্যস্ত চিত্রকল্পে অর্থবোধকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়।

অপরিচিত ভাষার বাধা আর অজ্ঞাত রহস্যাবৃত ধর্ম ও সাধনতত্ত্বের নিষেধ রসিক পাঠককে চর্যার সৌন্দর্য আস্বাদের পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। পাঠককে এখানে ধর্ম ও ভাষার নানা গ্রন্থি উন্মোচনে গবেষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, রসিকপ্রাণ আশ্রয় পায় না।

তিন

এ বাধা পাঠকের—আস্বাদের বাধা।

কিন্তু এর থেকেও প্রবলতর বাধা কবিদের, সৃষ্টির বাধা। এর জন্ম তাদের বিশিষ্ট ধর্ম ও দার্শনিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। ধর্ম ও বিশ্বাসমাত্রেই যে সাহিত্যের রসসৃষ্টিতে বিঘ্ন এমন কোন ঢালাও সিদ্ধান্ত না নিয়েও বলা চলে যে যেখানে ধর্ম বিশুদ্ধ অরূপ সাধনার, সৃষ্টির উৎস সেখানে রুদ্ধ। রূপময় জগৎ ও মানবজীবন যে দর্শন অস্বীকৃত কিংবা ধিকৃত সাহিত্যসৃষ্টিতে তার সহায়তা তো নেই-ই, নিষেধ আছে। সাহিত্যিকের অন্য নাম রূপকার। ভাষার তুলিতে তিনি রূপাঙ্কন করেন। রূপদ্রষ্টাই তো রূপস্রষ্টা; আর এ দৃষ্টিতে আসক্তি জড়িয়ে গেলেই সে সৃষ্টি সত্যকার সাহিত্য হিসেবে সম্মান পাবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের চৌহদ্দীতে যে কবি-সম্প্রদায় গড়ে ওঠেন তাঁদের সৃষ্টিতে রূপময় জগতের গন্ধ-রস-প্রাণ লেগেছিল, কারণ তাঁদের দর্শন জীব আর জগৎকে নস্যাৎ করে দেয়নি, তাকে শাশ্বত না বললেও মায়া বলেনি, ভ্রান্তি বলেনি;

সে অপুষ্পভাব হলেও শূন্যস্বভাব নয়। বিশেষত মানব-সম্পর্ককে আধ্যাত্ম অনুভূতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করায় তাঁদের সাহিত্য-প্রাণ সহজেই মুক্তি পেয়েছিল।

কবি হিসেবে চর্যাকারদের সমস্যা তাই বৈষ্ণব কবিদের ছিল না, এমনকি মঙ্গল কবিদেরও নয়। ধর্ম ও ভক্তির স্থূল অমার্জিতবোধের পোষক হয়েও, দেববাদের উগ্রতায় ব্যক্তিত্বকে বারবার বিসর্জন দিলেও কোন দার্শনিক তত্ত্বলোকে মঙ্গলকাব্যের কবিরা অবরুদ্ধ ছিলেন না, আর ছিলেন না বলেই রূপময় পৃথিবী তাঁদের কাছে সত্য, মানবিক কামনা-বাসনার পূর্তিই তাঁদের আদর্শ, সর্ব প্রাপ্তির সুখস্বর্গ তাঁদের চরম লক্ষ্য। কাজেই এঁদের ধর্মবোধ সৃষ্টির উৎসকে শুকিয়ে দেয় না, এঁদের সাম্প্রদায়িকতা কঠোর দার্শনিকতার খাঁড়া উঁচিয়ে রাখে না রূপলোকের বিরুদ্ধে।

চর্যার ধর্মমতে নিষেধ অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ। তাঁদের কাছে জগতের অস্তিত্বটা একান্ত-ভাবেই মিথ্যা। সবৈব মিথ্যা এই জগৎ, ভ্রান্তি এমনকি নির্বাণের কল্পনাও।

অপ্পণে রচি রচি ভব নিব্বাণা

অমাদের অজ্ঞান-চঞ্চল-চিত্তের সৃষ্টি এ, বস্তুগত কোন সত্য তাই নেই এ-পৃথিবীর। এ যেন :

মরুমরীচি গন্ধর্বণঅরী দাপণ-পড়িবিম্বু জইসা। / বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপে পাথর জইসা॥ / বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা। / বালুআ তেলেঁ সসরসিংগে আকাশ-ফুলিলা॥

অর্থাৎ, এ পৃথিবীটা মরুভূমির মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণের প্রতিবিম্ব, বায়ু আবর্তে সৃষ্ট জলস্তম্ভের দৃঢ়তা, বন্ধ্যা নারীর সন্তানের ক্রীড়ার ন্যায় মিথ্যা ; বালুর তেল, শশকের শৃঙ্গ বা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক।

রূপজগতের এই ভ্রান্তিবিলাস থেকে আপন চেতনাকে উদ্ধার করা, চিত্তের চাঞ্চল্য নিরুদ্ধ করাই চর্যাকারদের সাধনা। এই সাধনার পথ আর কাব্যসৃষ্টির পথ বিপরীতমুখী।

সীতারাম উপন্যাসের শ্রী ও জয়ন্তী একদা একটি ফুলের পাপড়ি-কেশর ইত্যাদি শতধাছিন্ন করে সৃষ্টিকর্তার মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিম এদের ডাকিনী আখ্যা দিয়েছিলেন ; আর ডাকিনী নিঃসংশয়ে কবির থেকে ভিন্ন জাত। চর্যার কবিও নলিনীবনে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু আসলে সে মহাসুখরূপ কমল—তার সঙ্গে পার্থিব পদ্মাদির সম্পর্ক নেই, বরং পার্থিব সব কিছুকে প্রতিভাস বলে বিসর্জন দিলেই ঐ বোধে প্রবেশ সম্ভব।

এই গোষ্ঠীর চতুঃসীমায় আবদ্ধ এবং এই ধর্মবোধের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সাধকদের কাছ থেকে কবিতার সৌন্দর্য প্রত্যাশা করা যায় না।

চার

কিন্তু চর্যাপদের সৃষ্টির উৎসে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যার ফলে আমাদের হয়ত একেবারে নিরাশ হতে হবে না। কাদের জন্য চর্যাকারেরা এই গানগুলো

লিখেছিলেন—এর উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে সেই কারণটি। সে তথ্য এর সৌন্দর্য-বিচারেও পরিহার্য নয়। চর্যাগীতিগুলি রচনার উৎস ছিল বাংলা দেশের অশিক্ষিত অব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অগণিত আপামর সাধারণ। এই সংবাদ চর্যার বিচারে অন্তত দুটি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

সাহিত্য-স্রষ্টার সামনে স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্টভাবে তার পাঠক-শ্রোতার একটি ছবি থাকবেই। চর্যাকারদের কাছে এ ছবি যে স্পষ্ট ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে শিক্ষিত সমাজ তাদের কণ্ঠের নাগালের বাইরে ছিল বলেই মনে হয়। অন্ত্যজ শ্রেণীর সাধারণ মানুষকে সহজযানের পতাকাতলে আহ্বানের চেষ্টায় তাই ঘাটতি পড়েনি। আর এরই জন্য সংস্কৃত ভাষায় কাব্য তাঁরা লেখেননি, জন-সাধারণের মুখের ভাষাকেই তাঁরা আশ্রয় করেছেন। সদ্যোজাত শিশুভাষাকে তত্ত্বব্যাখ্যার গুরুভার বহনের দায়িত্ব দিয়ে তাঁরা একটা বিরাট সম্ভাবনার পথিকৃৎ হয়েছেন। জনতার মুখের অস্বীকৃত অবজ্ঞাত এবং অমার্জিত ভাষার চেয়ে তাদের জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার কোন মহত্তর উপায় তাঁদের জানা ছিল না।

সমসাময়িক সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার প্রতি শ্রদ্ধা 'বাংলাভাষায়' প্রথম কবিতার জন্ম দিয়েছে। আর ঐ একই কারণে চর্যার তত্ত্ববিবৃতিতে 'সাহিত্যিক প্রচেষ্টা'র স্বাক্ষর পড়েছে।

মুখের ভাষায় বলা না হলে সাধারণ মানুষের মনের কাছে পৌছানো যাবে না ঠিকই, কিন্তু মুখের ভাষায় বলা হলেই যে তাদের মনের মধ্যে প্রবেশ ঘটবে একথা ঠিক নয়। বিষয়ের কাঠিন্যকে, দুর্জ্ঞেয় এবং ব্যাখ্যাতীত [ওঁদের ভাষায় বাক্‌পথাতীত, অর্থাৎ বোবা যেখানে বক্তা আর শ্রোতা যেখানে কালা] তত্ত্বসাধনাকে হজম করার জন্য বিশেষ মশলার প্রচুর মিশ্রণ প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়াতীতের তাই ইন্দ্রিয়ানুগ হতে হয়, মূর্তিহীনের মূর্তিগ্রহণ করতে হয়। যার আকার নেই তাকে ধরা যায় না, যার বর্ণ নেই তাকে দেখা যায় না; যুগে যুগে তাই চাই উদাহরণ ছাত্রদের শিক্ষিত করবার জন্য, শিষ্যদের বোঝাবার জন্য তাই উপমা ও রূপকের আয়োজন। রূপকের পোষাকে তত্ত্ব স্পষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়-জগতের আয়ত্তগম্য হয়ে পড়ে।

চর্যার দুর্গম জটিলতত্ত্বের উপলব্ধির জন্য তাই রূপক সঙ্কলিত হল বস্তুজগৎ থেকে, আপামর মানুষের প্রত্যাহের কর্ম ও ধর্মের অভিজ্ঞতা থেকে।

সমালোচক এই বস্তুজগৎ থেকে সঙ্কলিত রূপকের মধ্যেই অনুসন্ধান করবেন সাহিত্য-সৌন্দর্যের। কিন্তু চর্যার রূপকের অঙ্গীকার তো রূপজগতের নয়, তার তত্ত্বলোকে উত্তীর্ণ হবার সোপানমাত্র। সাহিত্যরসিকের কিন্তু এই উপলক্ষের বিচারেই কর্তব্য-সমাপ্তি, চরম লক্ষ্যের দিকে তার নজর নেই। ধর্মতত্ত্বের পরমহংস সরোবরে সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে পৌছবেন, পক্ষ-বিধুনন জলের শেষ কণাটিও ঝরিয়ে দেবে। পল্লীগীতির সেই গ্রাম্য বধূটির মতো—'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে / চুল ভেজাব না। / জলে নামব জল ছড়াব / জল তো ছোঁব না॥'

প্রয়োজনের তাড়নায় এঁরা রূপকে গ্রহণ করেন, কিন্তু ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ডের মতো তাকে পরিত্যাগ করে তত্ত্ববুদ্ধির সিদ্ধিই তাঁদের একমাত্র অভিপ্রেত। সাহিত্য-রসিক সিদ্ধি চান না, রূপজগতের সরোবরে ভেসে ভেসেই তাঁর তৃপ্তি, মলাটের বর্ণালী বিষয়বস্তুর শুষ্ক তর্ককণ্টকের তুলনায় অনেক মূল্যবান, কারণ আত্মা কোথাও থাকলে সে দেহের মধ্যেই, "দেহই অমৃত ঘট আত্মা তার ফেন অভিমান।" উপলক্ষের সবকিছু ছেঁকে লক্ষ্যের সার-নির্যাস বের করবার প্রণালীতে তাঁর আস্থা নেই। উপলক্ষ কোথায় লক্ষ্যকে আবৃত করেছে, রূপ কোথায় তত্ত্বকে নির্জিত করেছে—সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টিতে সেখানে চর্যার সার্থক কৃতিত্ব, কিন্তু চর্যাকারের দৃষ্টিতে সেখানেই তার চরম ব্যর্থতা।

পাঁচ

লক্ষ্য ও উপলক্ষের পারস্পরিক প্রাধান্যের বিচারে চর্যাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব। ১) যেখানে লক্ষ্যের প্রাধান্য। ২) যেখানে উপলক্ষ বা লক্ষ্য কারও প্রাধান্যই নিশ্চিত নয়। ৩) যেখানে উপলক্ষ নিঃসংশয়ে লক্ষ্যকে আবৃত করে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মেজাজের দিক থেকে যাঁরা আদৌ কবি নন, ধর্মতত্ত্বের প্রচারই যাঁদের কবিতা রচনার একমাত্র কারণ তাঁদের হাতে রূপক রচনাও সার্থক নয়।

চর্যার কতকগুলি কবিতায় রূপক ব্যতীতই তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে—নিরাবরণ এবং নিরাভরণ প্রকাশ। এদের কাব্যত্ব স্বীকার্য নয়।

রূপক রচনার প্রথম সর্ত, বক্তব্যের আদ্যন্ত একটি রূপাবরণে আবৃত থাকবে। রূপ ও তত্ত্ব পাশাপাশি সমান্তরালে হবে প্রবাহিত। রূপের আবরণ উন্মোচনে পরিচ্ছন্ন তত্ত্ব-বিবৃতি প্রকাশিত হবে। রূপক কবিতার সীমাবদ্ধ কাব্যসার্থকতায় এইটুকুই প্রত্যাশিত। চর্যাসংকলনে এই দ্বিতীয় শ্রেণীরই সংখ্যাধিক্য। কোন কোন চর্যায় বাইরের রূপরচনা বস্তুবোধে জীবন্ত, কোন রচনার রূপকে কবিহৃদয়ের স্পর্শ লেগেছে। আবার আনন্দ বেদনার দোলায়, অনুভূতির ব্যঞ্জনায় দু-চারটি পঙ্‌ক্তি চিত্রকল্পে সমুন্নীত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সীমায় তাই কাব্যসৌন্দর্যের পরিমাণে নানা অনুপাত লক্ষণীয়।

তৃতীয় শ্রেণীতে অঙ্কিত আবরণ-চিত্রটি আদ্যন্তই চিত্রকল্প। কবিহৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শ সেখানে গভীরতর, বর্ণ সেখানে বহুবিচিত্র। তত্ত্ববুদ্ধির ও গোষ্ঠীচেতনার আস্তরণ-ভেদী ব্যক্তিত্ব বোধ সেখানে স্পষ্ট প্রকাশিত। এরা তাই তত্ত্বটি ভুলিয়ে দেয়, রূপের আসক্তি জড়িয়ে দেয় পাঠকের দুচোখে। রূপজগতের দিকে তাকাবার বিপদ এখানেই। তত্ত্ব প্রকাশের প্রয়োজনেই রূপজগতের প্রতি অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানব জীবনলীলার দিকে চর্যাকারেরা তাকিয়েছেন। কিন্তু এই রূপজগতের পথ বড়ই পিচ্ছিল, কোথাও একবার পা দিলে সমাপ্তিতে আসক্তির মোহে মজ্জিত হতে হবে। বোধ হয়, এই কারণেই সর্বথা রূপলোকের মায়ামোহকে পরিহার করবার উপদেশ দিয়েছেন

তত্ত্বদর্শীরা। চর্যাকারদের মধ্যে যাঁদের মনের কোণে কিছুমাত্র দুর্বলতা ছিল তত্ত্বজ্ঞান যাদের প্রাণরসকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে পারেনি রূপপিচ্ছিল পথে তাঁদের পতন তো স্বাভাবিক। শূন্যতার আদর্শে যাঁরা যথেষ্ট দৃঢ় নন, এমন লোক করুণার পথ ধরলে লক্ষ্যচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয় শ্রেণীর চর্যাকারদের এই দিক্‌ভ্রান্তির খবর তাঁদের আশ্রমিকরা কতদূর রাখতেন জানা যায় না, কিন্তু তাঁদের কবিতায় এর প্রকাশ স্পষ্ট। যদিও সচেতনভাবে রূপসৃষ্টিতে নিষ্ঠা হয়ত তাঁদের নেই, কিন্তু অন্তর্লোকবাসী কবিসত্তা আপনার নিঃশেষ স্বাক্ষর দিয়ে গেছে।

ছয়

লুইপাদ, কাহ্নুপাদ, কুক্কুরীপাদ, শান্তিপাদ ও সরহপাদ মোটামুটিভাবে প্রথম শ্রেণীর লেখক—কবি নন, সাধক ও প্রচারক। ভাষা ও ছন্দে কিংবা রূপনির্মাণের ছলনায় তত্ত্ববিবৃতির ও প্রচারের চেষ্টাই প্রকট।

লুইপাদের দুটি কবিতায়ই রূপক নির্মাণের চেষ্টা আছে, তবে তা ব্যর্থ। 'কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল' কিংবা 'উদক-চান জিম সাচ না মিছা'—কবিতা দুটির একটি করে চরণে চিত্র না হলেও চিত্রের আভাস আছে, পঞ্চডালবিশিষ্ট বৃক্ষ কিংবা জল-মধ্যবর্তী চন্দ্রের প্রতিবিম্বনের রূপকে। সাধনার সত্য-বর্ণনার যে চেষ্টা তার সীমা ঐ একটি চরণেই। পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলির তত্ত্ববিবৃতি একান্ত আবরণহীন। বৃক্ষ কিংবা প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের উল্লেখমাত্র কবিতা দুটিতে দ্বিতীয়বার ঘটেনি।

মূলত কবিপ্রাণ না হলেও লুইপাদের মতো রূপদৃষ্টিতে অন্ধতা ছিল না কাহ্নুপাদের। লুইপাদের ১নং কবিতাটির সংগে কাহ্নুপাদের ৪৫ নং কবিতার তুলনায় এ-সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে। উভয় কবিতায়ই বৃক্ষের রূপক গ্রহণের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু লুইপাদ যেখানে প্রথম চরণের পরে বৃক্ষের কথা বিস্মৃত, কাহ্নুপাদের কবিতায় সেখানে শেষ পর্যন্ত এই একই রূপকের অনুসরণ। কাহ্নুপাদের এই কবিতাটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু একটি কবিতার বিশ্লেষণে কাহ্নুর প্রতিভার স্বরূপ-উপলব্ধি ঘটবে না। চর্যাগীতি সঙ্কলনে সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক [সর্বসমেত তেরোটি] কবিতা রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর কোন কোন রচনায় তত্ত্ববিবৃতি রূপহীন এবং স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, কোথাও বা রূপকানুসরণের সার্থক প্রচেষ্টা, আবার অন্তত তিনটি কবিতায় মনের একটি বিশিষ্ট প্রবণতার দ্যোতনা আছে বলেই মনে হয়। ডোম্বীকে অবলম্বন করে কবি ১০, ১৮ এবং ১৯ নং কবিতা রচনা করেছেন। চর্যাকারদের প্রত্যয়ে 'ডোম্বী'র একটি বিশেষ সাধনাগত তাৎপর্য আছে। নির্মাণকায়ে নিদ্রিতা অগ্নিরূপিণী শক্তি এই নামেও বারংবার অভিহিতা হয়েছেন। সম্ভোগকায়ে সাধক যদি তার সঙ্গে মিলিত হতে পারেন তবে তাঁর সাধনার সিদ্ধি হস্তগত-প্রায়। ডোম্বীর সঙ্গে কাহ্নুর বিবাহের বর্ণনায় এই সাধন সংকেতই-এ। কিন্তু ডোম্বীর যৌবনের উদ্দাম লীলাচাঞ্চল্যের যে চিত্র ১০ নং কবিতায় বর্ণিত:

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহারি কুড়িআ। / ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মণ নাড়িআ ॥

অর্থাৎ নগরের বাইরে ডোম-যুবতীর কুঁড়ে, সে অস্পৃশ্য; কিন্তু নেড়া ব্রাহ্মণদের সে অসংকোচে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ব্রাহ্মণেরা তার যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্যে বিভ্রান্ত, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে তাকে লাভ করতে পারে না। অথবা, ১৮ নং কবিতায় ডোমযুবতীর কামলীলার চিত্র :

'কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী। / অন্তে কুলিণছন মাঝেঁ কাবালী' ॥

একটি উদ্দাম চঞ্চল লীলাকৌতুকপূর্ণ প্রেমের প্রতি কবির ব্যক্তিক হৃদয়প্রবণতার স্পর্শ বহন করে। কবি প্রথম শ্রেণীর হলেও, এ দুটি কবিতা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

শান্তিপাদ ও কুক্কুরীপাদের তত্ত্বাশ্রয়ী চেতনা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ২৬ নং কবিতায় শান্তিপাদ রূপকানুসরণের যে চেষ্টা করেছেন, তুলো ধোনার যে চিত্র অঙ্কিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন সমাপ্তির চার চরণে তার মায়াজাল ছিন্ন, তত্ত্ববিবৃতি নিরাবরণ। ১৫ নং কবিতায় আদ্যন্ত অখণ্ড তত্ত্বকথন, রূপাকর্ষণের চেষ্টামাত্র নেই। কুক্কুরীপাদের ২০ নং কবিতাও অনুরূপ রূপহীন, তবে ২ নং কবিতায় চরিত্রহীনা চঞ্চলা বধূর ব্যবহারে কবির ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকের স্পর্শ লেগেছে : 'দিবসই বহুড়ী কাগ ডরে ভাঅ। / রাতি ভইলে কামরু জাঅ' ॥

অর্থাৎ দিনে কাকের ডাকেও বধূর ভীতি, কিন্তু রাত্রে কামার্থে তার নিত্য অভিসার। কুক্কুরীপাদের এ কবিতায় বধূর রূপকটি সম্পূর্ণ। তার ঘরে চোরের প্রবেশ ও কর্ণভূষণ অপহরণ করে পলায়ন এবং তার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষে রূপটি তত্ত্বের তুলনায় অনেক মনোহর বলেই প্রতীত হয়। এ কবিতাটি নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এর তৃতীয় শ্রেণীর দিকে ঝোঁকটিও একেবারে অস্বীকার্য নয়।

সরহের মনের একটি স্পষ্ট ভঙ্গি অপভ্রংশে লেখা দোঁহাকোষে মেলে। সে ভঙ্গি প্রতিপক্ষের ধর্মাচরণকে নির্মম শ্লেষে বিক্ষত করায়। চর্যার একটিমাত্র পদে [২২ নং] তার আভাস আছে নাথপন্থী রসায়নবাদীদের ব্যঙ্গের তীরে বিদ্ধ করায় :

জাইসো জাম মরণ বি তইসো। / জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো ॥ / জা এথু জাম মরণ বিসঙ্কা। / সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা ॥

অর্থাৎ জীবন আর মরণে কোন পার্থক্য নেই। রসায়নবাদীরা [নাথপন্থীরা] এই তত্ত্বে অজ্ঞ, তাই অমর হবার সাধনায় মত্ত।

কিন্তু তীক্ষ্ণতায় দোঁহার সমকক্ষতা এর নেই। সরহের এই কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব থাকলেও নিরাবরণ তত্ত্বের তর্কে এর আবেদন সীমিত। চর্যাপদে সঙ্কলিত কবির অপর তিনটি কবিতায় রূপকানুসরণে সীমিত সার্থকতা ঘটেছে, কিন্তু স্পষ্টোচ্চার তত্ত্বকে প্রায়ই তা আবৃত করেনি।

সাত

পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। চাটিল, মহীধর, গুণ্ডরী, বিরুবা, ঢেণ্ঢণ এবং ভুসুকুর পদে ও আরো কোন কোন চর্যায় এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলবে। এদের শ্রেণীগত ঐক্য সত্ত্বেও সাহিত্য সৌন্দর্যের দিক থেকে স্তরভেদ লক্ষ্য করা চলে। কোথাও রূপকানুসরণে সম্পূর্ণতা, কোথাও চিত্রটির মনোহারিত্ব কোথাও তার সঙ্গে সীমিত অর্থে কবির হৃদয়-রসের সংযোগ।

বিরুবাপাদ মদ্যশালার যে রূপক এঁকেছেন, সুস্পষ্ট চিত্রেই তার সীমা। অপর পক্ষে ঢেণ্ঢণের বক্র বাচনভঙ্গিতে রূপচিত্রাঙ্কনের বিপর্যয় ঘটলেও পাঠকহৃদয়কে কৌতূহলী করে তুলতে তার সামর্থ্য লক্ষণীয়:

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী। / হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ / বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ। / দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ॥ / বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে ··· / জো সো বুধী শোধ নিবুধী। / জো সো চোর সোই সাধী॥ / নিতি নিতি সিআলা সিহে যম জুঝঅ।

[টিলার উচ্চতায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়ীতে ভাত নেই, নিত্যই অতিথির আনাগোনা। ব্যাঙের মত বেড়ে যাচ্ছে সংসার, দোহা দুধ কি বাঁটে ঢোকে? বলদের বাচ্চা হয়েছে, গরুটা বন্ধ্যা।···বুদ্ধিমানেরাই এখানে নির্বোধ, আর চোরেরাই সাধু, এ রাজ্যে সিংহের সঙ্গে শিয়ালের চলে নিত্যই সংগ্রাম।] কবির জীবনের এই বিপর্যস্ত অভিজ্ঞতার পশ্চাতে একটি দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নৈরাশ্যব্যঞ্জক হৃদয়ের আভাস আছে।

গুণ্ডরীপাদের কবিতায় [৪নং] কায়াসাধনের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যোগিনীরূপিণী স্ত্রী-শক্তির নাভিমূল থেকে অবধূতিকার পথ বেয়ে ঊর্ধ্বগমনের কথা। রূপকের আবরণে তত্ত্ব সর্বত্র আবৃত নয়, তবে অন্তত দুটি চরণে প্রেমানুভূতির তীব্র আর্তি অকস্মাৎ প্রকাশিত। বাংলা ভাষায় আদি প্রেমকবিতা হিসেবে এই শ্লোকটিকে গ্রহণ করা চলে—অন্তরালের তত্ত্বটি এখানে সম্পূর্ণ নির্জিত:

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবনি। / তো মুহ চুম্বি কমলরস পিবমি॥

[যোগিনী, তোমাকে ছেড়ে ক্ষণকালও বাঁচব না, তোমার মুখ চুম্বন করে আমি পদ্মমধু পান করব।]

চাটিলের কবিতাটিতে [৫নং] নদী ও সেতুর রূপক আরোপিত। কবির বস্তুবোধের স্পষ্টতায় এ কবিতার চিত্রটি জীবন্ত। এর প্রতিটি শ্লোকের বাইরের রূপ ও অন্তরের তত্ত্ব সমান্তরালে প্রবাহিত। খরস্রোতা নদী আর ক্ষণস্থায়ী জীবন, সেতুবন্ধে দুই তীরের সম্মিলন ও সহজসাধনার অদ্বয়বোধ, মোহতরু ছেদন করে সেতু নির্মাণ, একটি আদ্যন্ত পরিচ্ছন্ন খাঁটি রূপক হিসেবে এ কবিতাকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু এর প্রথম চরণে রূপকের সীমা অতিক্রান্ত। ভাব ও রূপের পার্বতীপরমেশ্বর যোগ যদি কবিতা হয়, তবে এই পঙ্‌ক্তি বিচ্ছিন্নভাবে কাব্যলক্ষণযুক্ত:

'ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী'।

গহন অতল ভবনদীর গম্ভীর শব্দে প্রবহমাণতা এ পংক্তিতে শব্দঝঙ্কারে মূর্ত হয়ে আছে।

মহীধরপাদের কবিতায় [১৬নং] মত্তহস্তীর শৃঙ্খলছিন্ন মুক্তির আবেগে রূপকের সীমা লঙ্ঘিত : 'মাতেল চীঅ-গএন্দা ধাবই'।

স্তম্ভলগ্ন শৃঙ্খল ছিন্ন করে মদমত্ত হস্তীর পলায়ন, পারিপার্শ্বিক সবকিছুকে উপেক্ষা করে, দলিত করে, শুঁড় দিয়ে ছিঁড়ে একাকার করে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের দিকে তার অভিযান এবং অবশেষে : 'খররবি কিরণ-সন্তাপেঁ রে গঅনাঙ্গন গই পইঠা'।

উজ্জ্বল সূর্যকিরণস্নাত পর্বত-শৃঙ্গে মুক্তির আবেগে তার কম্পিত হৃদয়ে অবস্থান —কবিতাটির তত্ত্ববোধের স্পষ্টতা সত্ত্বেও আমাদের বন্ধনমুক্ত প্রাণের উল্লাসে উৎফুল্ল করে তোলে। নিঃসন্দেহে এটি একটি উঁচুদরের কবিতা।

আট

ভুসুকুপাদ সংখ্যার দিক থেকে কাহ্নপাদের পরেই উল্লেখযোগ্য রচয়িতা। তাঁর আটটি পদের সর্বত্রই রূপকল্পনার মাধ্যমে তত্ত্বকে প্রকাশ করার অভ্রান্ত নৈপুণ্য আছে। কোথাও আদ্যন্ত একটি রূপকের অনুসরণ—যেমন চিত্তমূষিকের চাঞ্চল্য বর্ণনায়, চণ্ডালীকে বিবাহ করে সংসারী হওয়ার চেষ্টায়। আবার কোন কোন চর্যায় শ্লোকে শ্লোকে বিভিন্ন উপমার সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ববস্তু গড়ে তোলা —যেমন জগতের প্রাতিভাসিকতা প্রমাণ করবার জন্য ৪১ নং ও ৪৩ নং দুটি শ্লোকে একাধিক উপমা সঙ্কলিত। ৪৩ নং কবিতার সমাপ্তিতেই কেবল একবারের জন্য নিরাবরণ তত্ত্বের উপস্থাপনা ৬ নং, ২১ নং, ২৩ নং তিনটি কবিতায় মূল রূপক কল্পনায় এবং অন্যত্র কোথাও [৭১ নং] খণ্ড উপমা সঙ্কলনে ভুসুকুর দৃষ্টির কিছুটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীচেতনাজাত নয়, অর্থাৎ তাঁর বৌদ্ধ সহজিয়া বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। সম্ভবত সংসারজীবনে ভুসুকু ব্যাধ ছিলেন এবং ব্যাধজীবনের অভিজ্ঞতাই হরিণ, মূষিক, সাপ, শশক প্রভৃতির উপমা-রূপকের প্রতি কবিহৃদয়কে আকর্ষিত করেছে। কিন্তু ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির চরম স্ফূর্তি ৬ নং কবিতায়। হরিণ শিকারের রূপকে হরিণ-হরিণীর প্রেম-লীলার যে চিত্র অঙ্কিত তাতে মানবজীবনের বিরহ-মিলন-প্রেম-মৃত্যু-বোধের ব্যঞ্জনা আছে।

তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী / হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী ॥ / হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো / এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥ / তরংগতে হরিণার খুব ন দীস অ।

[ব্যাধের দ্বারা আক্রান্ত হরিণ হরিণীর সন্ধান পায় না। সে তাই তৃণ ছোঁয় না, জলও পান করে না। এমন সময় কোথেকে এসে হরিণী উপস্থিত। সে বলে,

হরিণ এ বন ছেড়ে চল। ঢেউএর মত হরিণের খুর দিগন্তে অদৃশ্য হল।]

হরিণী-হারা হরিণের উদাস বেদনা, মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও নীরব সুদৃঢ় প্রতীক্ষা, মানবপ্রেমের গভীর অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছেছে। ঢেউএর বেগে হরিণের অদৃশ্য হবার চিত্রে গতির ব্যঞ্জনা লেগেছে। এ কবিতায় যে তত্ত্ব বিবৃত, আশ্রিত-রূপের মনোহারিত্বে তার গুরুত্ব বিবর্ণ ও বিস্মৃতপ্রায়। খাঁটি কবিতা হিসেবে, অবশ্য সমসাময়িক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা সীমিত অর্থে, একে স্বীকার করা চলে।

কিন্তু সার্থক কবি হিসেবে চর্যাকারদের মধ্যে শবরপাদ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। শবরপাদের দুটি কবিতাই ব্যক্তি-অনুভূতির বাণী হয়ে উঠেছে। শবরপাদের হৃদয়ে তত্ত্ববোধের আঘাতে মোহগ্রস্ত একটি কবিসত্তা ছিল। জড়জগতের রূপাঙ্কনের প্রয়োজনে সে যখন প্রকৃতি ও জীবনলীলার দিকে তাকাতে চাইল স্মৃতির লোক থেকে অনুভূতি-আসক্তিতে জড়িত তার পূর্বজীবনকে দেখতে পেল। জীবনরস ও প্রকৃতি-সৌন্দর্যের এই মায়া-মোহ তার চোখে আবার মোহের অঞ্জন পরিয়ে দিল। শবরপাদের কবিতায় তাই কবিসত্তার জয় সম্পূর্ণ।

> উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী / মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ / উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি। / নিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী ॥ / নানা তরুবর মউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী। / একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥ / তিঅ ধাউ খাট পাড়িলো সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী। / সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥ / হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই। / সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই ॥

উচ্চ পার্বত্য প্রদেশে শবর বালিকার বাস। ময়ূরের পুচ্ছ সে পরিধান করেছে, গলায় দিয়েছে গুঞ্জার মালা। শবর এই অপরূপ বেশে শবরীকে সজ্জিত দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, শবরী তাকে বলছে যে এত চঞ্চল হবার কোন কারণ নেই। অভিনব বেশের জন্য শবরের ভ্রান্তি ঘটেছে, আসলে সে তো তারই ঘরণী। নানা বৃক্ষ মুকুলিত। আকাশ স্পর্শ করেছে তাদের পুষ্পিত শাখা। শবরী বিচিত্র ভূষণে সজ্জিত হয়ে এই সুন্দর কাননে ভ্রমণ করছে। শবর শয্যা প্রস্তুত করল এবং শবরীর সঙ্গে প্রেমানন্দে নিশা যাপন করল, কর্পূর তাম্বুলের সহযোগে তাদের দেহমিলন সুন্দরতর হয়ে উঠল। চরণগুলির মধ্যে কবির সুগভীর রূপানুরাগ ও বর্ণবিলাস লক্ষণীয়। শবরীর ময়ূরপুচ্ছের সজ্জায় প্রেম-মিলনের উদ্দামতার ব্যঞ্জনা। হৃদয়ানুভূতির এই উদ্দামতা শবরের ব্যবহারে স্পষ্ট। কিন্তু দেহমিলনের পটভূমিকায় প্রকৃতি-সৌন্দর্যের আরোপে কবিমনের সচেতন সৌন্দর্যচেতনার চিহ্ন আছে। পুষ্পিত তরুশাখা আর নীল আকাশের পরিবেশ শবর-শবরীর মিলনশয্যার উপরে চন্দ্রাতপ রচনা করেছে, দেহ-মিলন এখানে তাই দেহকে ছাপিয়ে সৌন্দর্য রাজ্যে পৌঁছেছে।

শবরপাদের ৫০ নং কবিতার ভাববৃত্ত ও রূপাঙ্কনে একই কবিপ্রাণের স্পর্শ স্পষ্ট।

উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে শবর-শবরীর মিলনকুঞ্জের একটি জ্যোৎস্না রাতের চিত্র এখানে অঙ্কিত :

হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা। / সুকড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা॥ তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা। / ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ। / কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরশবরী মাতেলা।

[আমার সে গৃহ উচ্চে অবস্থিত, কার্পাসফুলে তার চারপাশ ভরে গেছে। বাড়ীর পাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় কেটে গেছে অন্ধকার, অজস্র ফুল যেন ফুটে উঠেছে আকাশে। কঙ্গুচিনা ধান পেকেছে আর শবরশবরী মত্ত হয়ে উঠেছে প্রেমানন্দে।] উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত গৃহ, চারপাশে সাদা কার্পাসফুলের সমারোহ, আকাশে চাঁদ, পৃথিবীতে জ্যোৎস্না, আলোয় আলোয় কালো আকাশ ফুলে ফুলে সাদা। পাকা কঙ্গুচিনার গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল। এই পরিবেশে নরনারীর জীবনে মিলন-কামনায় চাঞ্চল্যজাগে। শবর-শবরীও তাই মত্ত। প্রকৃতি-সৌন্দর্যের স্পর্শে এ মত্ততায় যৌনতা এবং যৌনতা উত্তীর্ণ রোমান্টিক প্রেমানুভূতির ব্যঞ্জনা আছে।

নানা চেষ্টায় ও বাধায় এবং বাধা-অতিক্রমে চর্যার বেশকয়েকটি লেখার সাহিত্য-মূল্য প্রতিষ্ঠিত।



মণীন্দ্র বসু সম্পাদিত 'চর্যাপদ' অবলম্বনে উপরে কবিতার সংখ্যাক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এক

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুরনো বাংলা সাহিত্যের এক বহু আলোচিত সমস্যা যা স্থান-কাল-পাত্রে বিস্তৃত প্রচুর বিতর্কে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর চিন্তাকাশ আচ্ছন্ন করেছে। সমস্যার তর্ক-তথ্যের প্রাচুর্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যসৌন্দর্যের আস্বাদ গৌণ হয়ে গেলেও এর বিশিষ্ট রূপ-লক্ষণ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার ধারায় পুষ্ট পাঠকচিত্ত রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে লেখা এই কাব্যে স্বভাবতই 'সিদ্ধ' রসের অনুবর্তন চেয়েছে এবং ব্যর্থ হয়ে নানা অভিযোগে মুখর হয়ে উঠেছে।[১]

প্রথমত, এ কাব্য 'বৈষ্ণব সাধনা ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এবং রসাভাসদুষ্ট বলিয়া আজও ভক্ত ও রসিক-সমাজ কর্তৃক বর্জিত'।

দ্বিতীয়ত, কাব্যটি প্রায় আদ্যন্ত যৌনকামনা এবং মিলনের বর্ণনায় অশ্লীল। রুচিহীন গ্রাম্যতা এর সর্বদেহে।

তৃতীয়ত, এর পদগুলি তথ্যভারে স্থূল; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির ব্যঞ্জনার অভাবে কবিতগুলি লিরিক লক্ষণচ্যুত।

অভিযোগের নেতিবাচনে এ গ্রন্থের কাব্যবিচার প্রায়ই স্খলিত। তাই প্রথমেই মুক্তমনে এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত—বাইরে থেকে নির্ধারিত কোন আদর্শ বা প্রত্যাশার উপর নির্ভর না করে কাব্যটির অন্তর পরিচয় গ্রহণের চেষ্টাই এর সমালোচনা। লেখকের কাছ থেকে আমার প্রত্যাশাকে আদায় না করে, লেখকের জীবনবোধ ও বাচনভঙ্গির পথই অনুসরণীয়। সে পথে আমাদের হৃদয়তারে ঝঙ্কার উঠলে পাঠক এবং সমালোচক হিসেবে খুশি হবার কথা।

কাব্যটির রুচি এবং অশ্লীলতা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করে লাভ নেই, রাধা-প্রেমের বিকাশপথে এর সংস্থান বিচার্য। এবং এর পদগুলির লিরিক সূক্ষ্মতার প্রশ্ন আমরা কাব্যগঠন প্রসঙ্গে আলোচনা করব কারণ বড়ু চণ্ডীদাসে পদগুলি বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়, সমগ্র কাহিনীগতির সাপেক্ষতায় তার সার্থকতা।

বড়ু চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব—পদরচয়িতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর স্থিতিকাল নিয়েও ভাবনা আছে।

বর্তমানে প্রবন্ধের মুখবন্ধ হিসেবে একটি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন। বড়ু-চণ্ডীদাসের অধ্যাত্মচেতনা এবং বৈষ্ণবতা কতদূর এ-জিজ্ঞাসার উত্তর না পেয়ে এ-কাব্যে প্রবেশ করা যায় না।

[১] বিশেষত কাল্পনিক কৃষ্ণকীর্তন নামে পরিচিত ভক্ত পরিচিতি ভক্ত পাঠকের মনে অকারণ প্রত্যাশা জাগিয়েছিল ড. বিমানবিহারী ভট্টাচার্যের ন্যায় কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত।

এ সম্পর্কে বহু তর্ককণ্টকিত আলোচনা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি : [এক] বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি। [দুই] তাঁর জীবনকাহিনীর যে খণ্ডবিচ্ছিন্ন টুকরোগুলি ভেসে আসছে তাতে তাঁর বৈষ্ণববিশ্বাসের বিশেষ পরিচয় নেই। বাসলী সেবক চণ্ডীদাস নিজেকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণভক্ত বলে ঘোষণা করেননি একবারও। [তিন] নানা পুরাণে তাঁর জ্ঞান থাকা সম্ভব। তবুও তিনি ভাগবত ইত্যাদির পৌরাণিক বিশ্বাসে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করে লোকবিশ্বাসের মতোই কৃষ্ণের জন্মকারণ নির্দেশ করেছেন। নারায়ণের ধলো-কালো দুই কেশ থেকে উৎপত্তি হল বলরাম ও কৃষ্ণের।

চৈতন্যপূর্ব বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের চেহারা ছিল মোটামুটি পৌরাণিক। মালাধরাদির ভাগবত-অনুবাদ তাঁদের ধর্মচেতনার প্রধান আশ্রয় বলেই গণ্য হত। বড়ুর কাব্যে ভাগবতের অনুসরণ অল্পই। জয়দেব প্রমুখ প্রাচীনতর কবিদের রাধাকৃষ্ণের গানের ধারার কিছু অনুসরণ তিনি করেছেন, বেশি নির্ভর করেছেন লোকপ্রচলিত বিবিধ কৃষ্ণকথার উপরে। ভাগবতের কৃষ্ণবিজয় কাহিনীর নয়। রাধা তখন বাঙালি বৈষ্ণবদের চেতনায় তত্ত্ব হয়ে ওঠেনি।

বড়ু চণ্ডীদাসে কাব্যের অবলম্বন রাধা এবং কৃষ্ণ। কৃষ্ণভক্তি নয়। এদিক থেকে বিদ্যাপতির প্রণয়-কবিতার প্রসঙ্গ মনে আসে। পঞ্চোপাসক হিন্দু হয়েও মধুর রসাত্মক পদরচনায় তিনি রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলাকেই গ্রহণ করেছেন। যদিও পাশা-পাশি শিবস্তোত্র রচনায়ও তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল না। এদিক দিয়ে সেকালের বাংলার লোকচিন্তার একটি বিশেষ প্রবণতার কথা মনে হয়। যখনই গার্হস্থ্য প্রেমের প্রাত্যহিক সাংসারিকতা-সীমায়িত জীবনচর্যার কথা বলেছেন কবিরা তাঁদের বোধ একটি প্রতীককেই আহ্বান করেছে,—শিব-পার্বতীর কাহিনী। তাই মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, গোর্খ-বিজয়, শিবায়ন প্রভৃতি নানা কাব্যে শিব-কথার ছড়াছড়ি। অপরপক্ষে অবৈধ প্রেমের গান বা মুক্তপ্রেমের লীলা অঙ্কনে কবিচিত্তে যখনই প্রবণতা জন্মেছে তখন প্রায়ই রাধাকৃষ্ণ কথাকে অবলম্বন করে কবিতার উচ্ছ্বাস বহু ধারায় বিকশিত হয়েছে। তাই রাধা-কৃষ্ণ অবলম্বন হিসেবে গৃহীত হলেই বৈষ্ণব ধর্মের পরিমণ্ডলে প্রবেশ কর হয় না। প্রাচীনতম কাল থেকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকবিতার ধারা অনুসরণ করে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে এ প্রত্যয় সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, 'ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া রাধা-প্রেমের যে প্রথম প্রকাশ তাহা রসবিদগ্ধ কবিগণের প্রেম-কবিতার ভিতরেই। সেই প্রেম-কবিতার ভিতরে প্রাকৃত প্রেম এবং অপ্রাকৃত প্রেম লৌহ এবং স্বর্ণের ন্যায় স্বরূপ-বিলক্ষণ ছিল না।…সাহিত্যের দিক হইতে তাই বিচার করিলে আমরা রাধার পরিচয়ে বলিতে পারি, রাধা হইল ভারতীয় কবিমানস-ধৃত নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যত শৃঙ্গার বর্ণনা রহিয়াছে, রসোদ্গার, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতির বর্ণনা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণই ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য

এবং রতি-শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রাকৃত রতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা বৈচিত্র্যময় সুনিপুণ বর্ণনা যে সর্বদা প্রাকৃত প্রেমের দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত প্রেমের একটা আভাস দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল এ কথা স্বীকার করা যায় না। প্রথমে ইহা ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পার্থক্য রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে অনেক পরে। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় গোস্বামীগণ কর্তৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়া সহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; কায়া ও ছায়া অবিনাবদ্ধ ভাবে একটা মিশ্ররূপের সৃষ্টি করিয়াছে'।

তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নানা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে। কেউ কেউ এর একটি রূপকার্থ আবিষ্কার করেছেন। ভগবান এবং মানুষের রূপক। এখানে ভগবান কৃষ্ণের ভূমিকা ইংরেজ কবি কথিত 'গ্রে-হাউণ্ডে'র মতো। রাধারূপী ভক্ত এড়িয়ে যেতে চায় ভগবানের প্রেম আর ভক্তিকে, ভগবান কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাই চলে 'স্বর্গীয় বলপ্রয়োগ'।[১] রূপক-ব্যাখ্যায় এতটা প্রবণ হলে সর্বযুগের লেখা যাবতীয় প্রেম কাহিনীকেই এ ধরনের রূপকের ছাঁচে ফেলা খুব অসম্ভব হবে না।

কেউ কেউ আবার কাহ্নাইয়ের 'দশমী দুয়ার' চেপে যোগাভ্যাস করাকে যথেষ্ট গম্ভীরভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এই সূত্রে তান্ত্রিক দেহ-সাধনার একটি ব্যাখ্যাও দাঁড় করিয়েছেন। 'চণ্ডীদাস' নামটির সঙ্গে সহজিয়া শব্দের যোগ তাঁদের এই ধারণাকে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

আসলে এ জাতীয় কোন রকম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়াই সমগ্র কাব্যটির অর্থ-বোধ হয় এবং রসবোধে বাধা হয় না কোথাও। বরঞ্চ কোন তত্ত্বাবিষ্কারের চেষ্টাই কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়, গল্প এবং চরিত্রের আদ্যন্ত ব্যাখ্যায় বাধা জন্মায়। তাই তা পরিত্যাজ্য।

দুই

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি বিচিত্র রচনা। এর রূপবৈশিষ্ট্যটি সেকালের বাংলা কাব্যে অদ্বিতীয়। আখ্যানকাব্য বা পদসঙ্কলন হিসেবে এর বিচার করলে কোন সিদ্ধান্তেই পৌছনো যাবে না। কতকগুলো ত্রুটিই প্রধান হয়ে পীড়া দেবে। এটি একটি যাত্রার পালা ছিল বলে মনে হয়। কাব্য হিসেবে ভাষাবিধৃত করবার সময় সংস্কৃত শ্লোক-গুলির সংযোজন ঘটনার ফাঁকগুলিকে পূর্ণ করেছে।[২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যাত্রারূপ অনেক সমালোচক এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা

১ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'প্রেমধর্ম' দ্রষ্টব্য।

২ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' বর্ণনা ও গীতের মধ্যে ঘটনার ক্ষীণসূত্রটি বাঁচিয়ে রেখেছে কয়েকটি শ্লোক—তা কিন্তু কাব্যের অংশ। কৃষ্ণকীর্তনে তা যেন পরে সংযোজিত।

করেছেন। পদগুলির উপরে স্বয়ং কবি অভিনয়গত সাংকেতিক ভাষায় যে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে বিশ্লেষণ করে ড. সেন দেখিয়েছেন : " 'দণ্ডক' হচ্ছে বর্ণনাত্মক [descriptive] বা বিবৃতিময় [narrative] গান।··· 'লগনী' দ্বি-সংলাপময় [dialogue] নাট্যরসাশ্রিত গীতপদ্ধতি।···দ্বি-সংলাপগানে যদি বিবৃতির ঠাট থাকে তবে হয় 'দণ্ডকলগনী' বা 'লগনীদণ্ডক'।···দ্বি-সংলাপ গানে যদি চেষ্টিতের [action] বা উদ্যোগের [Contemplated action] ইঙ্গিত থাকে তবে হয় 'চিত্রক লগনী' বা 'লগনী চিত্রক'।···সচেষ্টিত দ্বি-সংলাপগানের অংশ বর্ণনাত্মক বা বিবৃতিময় হলে হয় 'বিচিত্র [চিত্রক] লগনী দণ্ডক'।···গানে একাধিক দ্বি-সংলাপময় ও বর্ণনা বিবৃতিময় অংশ থাকলে হয় 'প্রকীর্ণ [প্রকীর্ণক] লগনী'। 'প্রকীর্ণ [প্রকীর্ণক] লগনী' যদি আদ্যন্ত বর্ণনা বিবৃতি-আত্মক হয় তবে 'প্রকীর্ণ [প্রকীর্ণক] লগনী দণ্ডক'।—গানে চেষ্টাময় একাধিক দ্বি-সংলাপ অংশের সঙ্গে বর্ণনা বিবৃতি অংশ থাকলে হয় 'চিত্রক প্রকীর্ণ [প্রকীর্ণক] লগনী দণ্ডক'।—'প্রকীর্ণক লগনী' গানে হৃদয়াবেগযুক্ত চেষ্টিতের প্রাধান্য থাকলে হয় 'কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক লগনী'।" এই আবিষ্কারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যাত্রারূপ নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং যাত্রাকার হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসের অতি তীক্ষ্ণ চেতনা প্রমাণিত হয়েছে।

পুরানো কৃষ্ণযাত্রার কোন নিদর্শন বলতে এই কৃষ্ণকীর্তন। প্রাচীনতর গ্রন্থ জয়দেবের গীতগোবিন্দেও লোকপ্রচলিত যাত্রা-পালার আঙ্গিক কতক গৃহীত হয়েছে। পুরনো যাত্রায় পাত্র-পাত্রী থাকত তিনটি এবং আদ্যন্ত সংলাপ চলত গানে গানে।

কিন্তু এই যাত্রারূপ অনুসরণ করতে গিয়ে আপন সাহিত্যবোধের বিশিষ্টতার ফলেই বড়ু নাটকীয়তার মূল্য অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং এই পালার সীমাবদ্ধ সুযোগে তার বহু সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। যাত্রা একটি প্রাচীন গ্রাম্য অভিনয়োপযোগী সাহিত্যরূপ। নাটকীয়তা কিন্তু একটি চিরন্তন সাহিত্য-লক্ষণ। এযুগের নাটকে—য়ুরোপে প্রাচীন কাল থেকেই—এর প্রধান নিদর্শন মিললেও কাব্যোপন্যাসেও এর লক্ষণ সুপ্রচুর। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক 'নাটক' হলেও তাতে কাব্যলক্ষণই প্রধান, নাটকীয়তার যথেষ্ট অভাব আছে বলেই সমালোচকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'যাত্রা' আর যাত্রা অভিনেয় সাহিত্যকর্ম, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয়তা মিলবে এ ধরনের যুক্তিপরম্পরার কোন মানে হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয়তার জন্য দায়ী বড়ু চণ্ডীদাসের সৃষ্টিকৌশল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয়তা নানাভাবে প্রকাশিত —আখ্যানগ্রন্থনের আদ্যন্ত অখণ্ডতায়, মূল কাহিনীর মধ্যেই কবিদৃষ্টির কেন্দ্রীকরণে, পার্শ্বকাহিনী বা উপকাহিনীর পথে পথে দিগ্‌ভ্রান্তির অভাবে, ঘটনাগত ও চারিত্রিক দ্বন্দ্বে এবং সংলাপগত সংঘাতে। কিন্তু নাট্যধর্মের সবচেয়ে বড় অভাব এর ঘটনা-বিরলতায়।

প্রথমে এর আখ্যানবিচার প্রসঙ্গে নাট্যধর্মের পরিচয় নেওয়া যাক।

কাব্যের প্রথম খণ্ডটি কবির সচেতন রূপবোধের প্রকাশ। এই 'জন্মখণ্ড'কে গ্রহণ

করা যেতে পারে সমগ্র নাট্যপালার মুখবন্ধ হিসেবে। এই অংশে কাহিনীর দ্রুতগতি ও সংক্ষিপ্ততা বিস্ময়কর বলে মনে হয়, বিশেষ করে মূল কাহিনীর অতি বিলম্বিত গতির সঙ্গে তুলনীয়। জন্মখণ্ডে কংসের অত্যাচারে সৃষ্টির ধ্বংস, দেবতাদের পরামর্শ, নারায়ণের সাদা-কালো দুটি কেশ প্রদান, নারদ-সংবাদ, বসুদেব-দেবকীর বন্দীদশা, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, অন্ধকার রাত্রির আড়ালে বসুদেবের কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে রেখে আসা এবং সেখানে কৃষ্ণের কৈশোর প্রাপ্তির সংবাদ কবি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে অতি দ্রুতবেগে দিয়েছেন। এরপরে রাধার জন্ম ও বড়ায়ির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রচুর ঘটনা—এবং ঘটনাগুলিও কম কৌতুককর ও কৌতূহলোদ্দীপক নয়। বিশেষ করে ভাগবতের বিস্তৃত বর্ণনায় এর অনেকগুলিই বাঙালি পাঠকদের কাছে পূর্ব থেকেই প্রিয়। কিন্তু একবার মাত্র নারদ-সংবাদ বর্ণনে কবি তাঁর সংযম ও সংক্ষিপ্ততা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। মনে হয়, নারদমুনি যাত্রার পালায় স্মরণাতীত কাল থেকে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে মুখ বিকৃত করে যে হাস্যরসের যোগান দিয়েছেন তা থেকে দূরে সরে যাওয়া বড়ুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাত্রাপালার পক্ষে এ বোধ হয় এক অবশ্যপালনীয় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পরে কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় দীর্ঘ একটি সঙ্গীত রচনা করেছেন কবি। বড়ায়ির রূপবর্ণনায়ও। মনে হয় দীর্ঘপথ দ্রুত উত্তরণের পরে কবি আপন লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছেন। কংস, নারদ, বসুল, দেবগণ, নন্দ, যশোদা কারও আর প্রবেশ নেই এ রাজ্যে। কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়ায়িকে আমাদের সামনে পরিচিত করিয়ে কবি সংলাপ-সঙ্গীতময় নাটকের মূল প্রাণ-অংশে প্রবেশ করলেন।

অজস্র ঘটনার উল্লেখ এবং অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমাদের আরও বিস্মিত করে যখন আমরা সেকালের ভারতীয় গল্প-কথনরীতির কথা মনে করি। ভারতীয় কবিরা নানা শাখা কাহিনীর বর্ণনায় প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট। এক কাহিনী থেকে অন্য কাহিনীতে একটি সামান্য সূত্র মাত্র অবলম্বন করে তাদের সুদূর বিহার করতে বাধে না। সেখানে বিচিত্র কাহিনীর এত আহ্বান-আকর্ষণকে অবহেলা করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

কৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর ঐক্য আমাদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করবে। আদ্যন্ত এর কাহিনীর একমুখী গতি, একটি সমস্যার চারপাশে আবর্তন। কোন শাখা কাহিনী নেই—শাখার অত্যধিক বিস্তার তো দূরের কথা। বিশেষ করে এ কাহিনীর কেন্দ্রীয় সমস্যাটি দ্বন্দ্ব-মূলক। এ দ্বন্দ্ব ঘটনা এবং ব্যক্তি-ইচ্ছা ও চেষ্টার টানাপোড়েনে বিকশিত এবং চারিত্রিক বিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই দ্বন্দ্ব আখ্যানটিকে হৃদয়গ্রাহী করেছে এবং নাটকীয়তার সঞ্চারে এর আস্বাদ বাড়িয়েছে। চারিত্রিক বিবর্তনের কথা রাধা-প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। বর্তমানে ঘটনাগত সংঘাতের কেন্দ্রটিকে খুঁজে বের করা যাক।

তাম্বুলখণ্ড থেকে কৃষ্ণ রাধাকে কামনা করেছে, এবং রাধা আপত্তি করেছে; দ্বন্দ্বের কেন্দ্রটি এখানেই। কৃষ্ণের ইচ্ছা এবং রাধার ইচ্ছার বৈপরীত্য—তা থেকে চেষ্টা এবং ক্রিয়ার বৈপরীত্য কাহিনী-আকারে বিন্যস্ত। বাণখণ্ড থেকে রাধার ইচ্ছায়

বৈপরীত্যের লক্ষণ নেই আর। কিন্তু কবি তখনও একটি সংঘাতাভাস সৃষ্টি করেছেন বংশীখণ্ডে। অবশ্য এখানে দ্বন্দ্বে কৌতুক-রসিকতারই প্রাধান্য। বিরহ খণ্ডে এ দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে উঠেছে। রাধা এবারে চেয়েছে আর কৃষ্ণ চায়নি। কাব্যটির এখানেই সমাপ্তি। আপাত দৃষ্টিতে খণ্ডে খণ্ডে কাহিনীটি বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব এর মূল সূত্র রচনা করেছে, সেই সূত্র ধরেই এর বিকাশ সম্ভব হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, খণ্ডে খণ্ডে কাহিনীর বিকাশও এই দ্বন্দ্বেরই ফল।) রাধা-চরিত্র বিশ্লেষণে পাঠকের কাছে তা স্পষ্টতর হবে।

ঘটনা-বিরলতা আখ্যানকাব্য হিসেবে এর সবচেয়ে বড় ত্রুটি। অবশ্য এটি একটি আখ্যান কাব্য নয়, আখ্যান ধর্ম এর অঙ্গ ধর্ম মাত্র। কিন্তু সে কথা মনে রেখেও বলব সংলাপের তুলনায় এর ঘটনা-বিরলতা দৃষ্টি এড়ায় না। এক একটি খণ্ডে যে পরিমাণ ঘটনাগত বিবর্তন আছে এবং চরিত্রগত নবতর পরিচিতি প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনায় সঙ্গীতময় সংলাপের প্রাচুর্য ভারসাম্যহীন বলেই মনে হবে। রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ির গানে ঘটনা কম এগিয়েছে। অর্থাৎ যত গান ঘটনা ততটা এগোয় নি। তাই পুনরুক্তি ঘটেছে প্রচুর। রূপবর্ণনা আবশ্যক-অনাবশ্যকে বার বার এসেছে, একই ভাবের কামনা-বাসনা-আর্তি সামান্য ভাষান্তরিত হয়েই প্রকাশ পেয়েছে বহুবার। সঙ্গীতের এই অতি বিস্তৃতিতে এ-কাব্য কাহিনীর সূত্রে গাঁথা সঙ্গীতের মালা বলেও কখনও কখনও মনে হতে পারে। এই ত্রুটির জন্য বড়ু চণ্ডীদাসের শিল্পবোধ কতটা দায়ী নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ পুরানো যাত্রায় গানে সংলাপই শুধু বলা হত না, গানই ছিল এর প্রধান আকর্ষণ। কাহিনী বা চরিত্র প্রায় কোথাও প্রাধান্য পেত না। সঙ্গীতপ্রাধান্যের প্রথানুগত্য থেকে তাই বড়ু চণ্ডীদাসের মুক্ত হবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রথানুসরণে তাঁর কবিপ্রাণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাঁর কৃষ্ণকীর্তন একটা অকিঞ্চিৎকর যাত্রাপালায় পরিণত না হয়ে চরিত্রানুভূতির গভীরতায় এবং আখ্যানগ্রন্থনের একটি পরিচ্ছন্ন নৈপুণ্যে অমরত্ব পেয়েছে। যাত্রাপালায় সঙ্গীত-প্রাচুর্যের অনুসরণ এই অমরত্বের বিনাশ সাধনে সমর্থ হয়নি, একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে।

(এবারে এই সঙ্গীত-সংলাপের কথা। কৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি নিরপেক্ষ বিচারের বিষয় নয়। কারণ পদাবলীর মত স্বতন্ত্র খণ্ড-কবিতা হিসেবে কবি এদের রচনা করেননি।) পদাবলীর প্রতিটি কবিতা এক একটি মনোভাবের বাহন। তার কোথাও বর্ণনা, কোথাও বিবৃতি, কোথাও বা চিত্রাঙ্কন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই একটি বিশিষ্ট ভাব বা অনুভূতির রঙে তা রঞ্জিত। (পদাবলীর কোন তথ্য বিবৃতির দায়িত্ব নেই, কোন আখ্যানের অংশ তারা নয়—তাদের সঙ্গে সম্পর্ক একটিমাত্র ব্যক্তিমানুষের হৃদয়ের, তাদের ভিত্তিতে একটিমাত্র বিশিষ্ট মুড।

কৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি সমগ্র কাব্য-কাহিনীর অচ্ছেদ্য অংশ। কবি প্রথানুসরণে সীমাবদ্ধ না হলে এদের সংখ্যা হয়ত অনেক কমে যেতে পারত, কিন্তু বর্তমানে এরা

যেভাবে কাহিনীবদ্ধ তাতে সমগ্র কাব্যের মধ্য থেকে এদের কাউকে পৃথকভাবে নিয়ে এলে এরা অক্ষত থাকে না। কারণ প্রত্যেকটি পদ এখানে পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত। সামান্য যে কয়েকটি বিবৃতি-বর্ণনাত্মক কবিতা আছে, তারা আখ্যানটির প্রকাশে ও বিবর্তনে প্রায় অপরিহার্য। আর অধিকাংশ পদই এক বা একাধিক পাত্রের সংলাপ। যে পদগুলিতে একাধিক পাত্রের সংলাপ সংহত সেখানেই নাটকীয়তার প্রকাশ সর্বাধিক। কিন্তু যে পদগুলি একটি পাত্রের সংলাপ, সেখানে গীতিধর্মের প্রকাশ অনেক বেশি প্রত্যাশিত। এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। কাহিনীবদ্ধ এবং সংলাপধর্মী হওয়ায় এদের দায়িত্ব ত্রিবিধ। [এক] কাহিনী-বিকাশে এদের ভূমিকা। [দুই] এরা প্রত্যেকেই পূর্ববর্তী সংলাপের কিছুটা উত্তর আবার পরবর্তী সংলাপের প্রতি কিছুটা প্রশ্নও বটে। [তিন] নিজের হৃদয়-উদ্ঘাটন, সঙ্গে সঙ্গে অপরের চরিত্রের সম্পর্কে মন্তব্যও এদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। কাজেই এ জাতীয় পদে খাঁটি লিরিকের অনুভূতিসর্বস্বতা ও বস্তুভারহীন অ্যাবসট্রাকসনের অভাব ঘটাই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে-কোন স্থান থেকে একক সংলাপ-সঙ্গীতগুলিকে গ্রহণ করে উপরোক্ত মন্তব্য প্রমাণ করা চলে। তবে সংলাপ সঙ্গীতের প্রাচুর্যে উপরে নির্দিষ্ট সম্পর্কসূত্র অনেক জায়গায় খুব ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।)

অবশ্য অনেক পদে রাধার হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটনা পরিক্রমার সামান্যসূত্রে বদ্ধ বলেই অনেকটা তথ্যভারমুক্ত বিশুদ্ধি অর্জন করেছে। বড়ুর লিরিসিজম বিচারে এরাই অবলম্বন। এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, বংশীখণ্ডে এবং অন্যত্র দু-চারটি করে আছে, বাকি সবগুলিই বিরহখণ্ডে। বিরহখণ্ডের গানে প্রকাশিত রাধার প্রেম-বোধের স্বরূপ রাধাচরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখন এটুকুই বলব—এগুলিতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর অরূপ ইন্দ্রিয়াতীতের ব্যঞ্জনা না থাকলেও, গভীর আন্তরিকতার অভাব নেই। রাধার বিরহ মানবিক এবং দেহমূল হলেও হৃদয়ের আর্তি-প্রকাশে তাদের সার্থকতার প্রশ্ন ওঠে না। এদের গীতিরস আমাদের রহস্য-সংশয়ের রাজ্যে পৌঁছে দেয় না ঠিকই, তা বলে এরা লিরিসিজম্-বিবর্জিত নয়। পুরনো সাহিত্যে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত কিছু পদ ছাড়া রোমান্টিক চেতনার বস্তুভেদী রহস্য-সৌন্দর্যের অস্পষ্টতা বড় বেশি মেলে না। এবং বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতিভা চণ্ডীদাস থেকে মূলত পৃথক।

(বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্ব দ্বি-সংলাপময় পদগুলিতে। যেখানে রাধা বা কৃষ্ণ পরস্পর কথোপকথনে এক একটি পুরো পদ গান করেছে, সেখানে নাটকীয়তার স্থানে গীতিধর্মের আধিক্য ঘটেছে। সংক্ষিপ্ততা ও দ্রুততার উপরে নাটকীয় সংলাপের গতি নির্ভরশীল। কারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, ভাবের সঙ্গে ভাবের সংঘাত, সেখানে সহজেই সংক্ষুব্ধ এবং আকৃতিগত সংহতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে কম্পমান হয়, দীর্ঘ বিতানিত পদসঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হবার সুযোগ পায় না। দ্বি-সংলাপ পদে যেখানে প্রত্যেকের সংলাপ শ্লোকের ন্যায় সংক্ষিপ্ত

সংহতি পেয়েছে, অন্যোন্য কথোপকথন যেখানে আয়ন্ত বিস্তৃত এবং ব্যক্তি-বোধ বিপরীতমুখী সেখানে দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ ভাবাবেশ রচনা সার্থকতর, তাই বড়াইয়ের সঙ্গে রাধা বা কৃষ্ণের কথোপকথনে নাটকীয় দ্বন্দ্ব কম অভিব্যক্ত।)

কিছু উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যেতে পারে। বংশীখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করে নিয়েছে। কৃষ্ণ রাধাকে বারবার নানাভাবে বলেছে বাঁশী ফিরিয়ে দিতে, কখনও অনুরোধ কখনও ভয়প্রদর্শন চলছে। এ নিয়ে দীর্ঘকাল তাদের কথা কাটাকাটি কলহ চলেছে। কৃষ্ণ রাধাকে চুরি-দোষ দেওয়ায় রাধা একটা দীর্ঘ পদ জুড়ে কান্না শুরু করে দিল :

কোন অশুভখনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ। / হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ॥

কোথায় কখন কি কি অলক্ষণ-ব্যঞ্জক ঘটনা ঘটেছিল, শুকনো ডালে কোথায় কাক ডেকেছিল, হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যোগিনী চলছিল ভিক্ষায়, বাঁ দিকের শেয়াল ছুটে পালাচ্ছিল ডানদিকে, তেলী তেলের ভাঁড় নিয়ে চলছিল সামনে ইত্যাদি। উত্তরে কৃষ্ণও একটি দীর্ঘ গান করল :

কিসক নাগরী রাধা যোডসি কান্দনে।/তিরীকলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহি কাহ্নে॥

বাঁশীর সাতলাখ টাকা মূল্য। সোনা রূপা হীরা দিয়ে তৈরি। রাধা বাঁশীটি এখনি ফিরিয়ে না দিলে তাকে বেঁধে রাখা হবে, সমস্ত আভরণ কেড়ে নেয়া হবে, তাতেও ফল না হলে প্রাণ নিতে দ্বিধা করবে না সে। কৃষ্ণের এ কথা শুনে বড়ায়ি হাসছে দখে রাধা বড়াইকে দোষ দিয়ে একটি গান গাইল। উত্তরে কৃষ্ণ বলল : 'তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষে / বড়ায়ি তোহ্মাকে দোষে / সব মোর করমের ফল'।

তারপরে নানা কথায় রাধাকে দীর্ঘ অনুরোধ করল বাঁশীটি ফিরিয়ে দেবার জন্য। রাধা তখন ভাটিয়ালী রাগে সতেরো পঙ্‌ক্তির একটি গান গাইল। কেন তার নামে চুরির অপরাধ? এজন্মে এবং পূর্বজন্মেও কি কি পাপ সে করেছিল তারই সম্ভাব্য এক তালিকা কেঁদে কেঁদে প্রকাশ করল।

লক্ষণীয় এই পদগুলিতে দ্বন্দ্বের সুর আছে, কিন্তু সঙ্গীত বিস্তারে তা শিথিল। কিন্তু রাধার এই গানের পরেই সংলাপ সংক্ষিপ্ত হল এবং ফলে বিতর্ক উদ্দাম, দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ এবং নাটকীয় হয়ে উঠল :

কৃষ্ণ। গাই রাখিতেঁ নিন্দ গেলোঁ বাঁশী মাথে। / সে না বাঁশী আলো রাধা নিলি কোন ভিতে॥

রাধা। নান্দের নন্দন কাহ্নাঞি বোলোঁ মো তোহ্মারে। / কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে॥

পরবর্তী আর একটি পদে সংলাপগত দ্বন্দ্ব আরও বেশি নাটকীয় হয়ে উঠেছে :

কৃষ্ণ। সুণহ আইহনদাসী / তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী / তোঁসি তোর পাছে বেডায়িএ। / বাঁশীগুটী দেহ যবেঁ / বড় পুন পাহ তবেঁ / বাঁশী পাইলেঁ সুখেঁ ঘর জাই এ॥

রাধা। শুণহ নটক কাহ্নু কেহ্নে কর আপমান / তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ নীএ।/ বাঁশী যবে পাই এ / তবেঁ ঘসি ঘাটিএ / চারি চীর করি বা পোড়াই এ॥

কৃষ্ণ। সগ্‌গ মর্ত্য পাতালে / চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে / তোঁ মোর নিআঁছিস বাঁশী / উচিতেঁ গরুঅ মনে / তোঞ মুচুকে হাসী / তাকে দেহ আইহনের দাসী॥

রাধা। পান্তরে হারাআঁ বাঁশী / মোর থানে খোজসি / এহা না সহে মোর পরাণে। / হেন যবেঁ বোলে আন/ কাটোঁ তার নাক কান তোহ্মা তেজোঁ ভাগিনা কারণে॥

তুলনায় একটি জিনিস দেখা যাবে বড়ায়ি-রাধা বা বড়ায়ি-কৃষ্ণের দ্বি-সংলাপ গানে দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভ অনেক স্তিমিত। কারণ মূল বৈপরীত্য এদের সম্পর্কে নয়। যেমন :

রাধা। বড়ায়ি হাথে ভাণ্ড / মাথে করী চান্দ / চন্দন চর্চ্চিত গাএ / যমুনার তীরে / কদমের তলে / কে না বাঁশী বোলাএ॥

বড়ায়ি। রাধা পাএ মগড় খাড়ু / হাথে বলয়া / মাথে ঘোড়াচুলা।/ ধুলাএ ধুসর / নীল কলেবর / সেই সে নান্দের বালা॥

একটি বিষয়ে কৃষ্ণকীর্তনের সংলাপ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দ্বি-সংলাপ গানে রাধা-কৃষ্ণ, রাধা-বড়ায়ি, কৃষ্ণ-বড়ায়ি. এদের পারস্পরিক কথোপথন আছে। একটিও ত্রি-সংলাপ গান নেই।[১] অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ি তিনে মিলে পারস্পরিক সংলাপ নেই। একক সংলাপে তিনের অন্যোন্য কথোপকথনও একবার মাত্র মিলছে। দ্বি-সংলাপ এবং ত্রি-সংলাপে কেবলমাত্র একটি সংখ্যার সামান্য পার্থক্য নয়, পার্থক্যটি গুণগত। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে ইউরিপিডিসকেই বিশেষ করে অন্যোন্য ত্রি-সংলাপের তাৎপর্য আবিষ্কারক হিসেবে সম্মান দেওয়া হয়। সংলাপের নাটকীয় রস এর ফলে দৈর্ঘ্য প্রস্থের সীমা ছাড়িয়ে বেধ-এর গভীরতায় বিবৃত হয় বলে নাট্যসাহিত্যের সমালোচকেরা মনে করেন।

প্রাচীন বাংলা যাত্রায় ত্রি-সংলাপের তাৎপর্য অনাবিষ্কৃত ছিল বলে মনে হয়। ভারখণ্ডে একবার রাধা-কৃষ্ণের দ্বি-সংলাপ পদের প্রথম শ্লোকে বড়ায়ি রাধাকে পরামর্শ দিয়েছে। বংশীখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের কলহের মাঝখানে একবার বড়ায়ির প্রবেশ ঘটেছে।[২] এবং অন্তহীন কলহের পুনরাবৃত্তিতে বড়ায়ির মধ্যস্থতা শান্তি বিধানে সাহায্য করেছে মাত্র। কিন্তু ঘটনার বিবর্তনে সামান্য ভূমিকা গ্রহণ ছাড়া বড়ায়ির এই সংলাপ এর নাটকীয় রসকে বেশি সাহায্য করেনি। সম্ভবত ত্রি-সংলাপের গভীর নাটকীয় তাৎপর্য বড়ু চণ্ডীদাসের আয়ত্ত ছিল না।

১ কেবল রাধা-কৃষ্ণের একটি সংলাপের গোড়ায় [ভারখণ্ডে] বড়ায়ি রাধাকে উপদেশ দিচ্ছে। ফলে ত্রি-সংলাপের আমেজ এসেছে।

২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ [পৃ. ১২৮-১২৯] বড়ায়ি-কৃষ্ণের একটি দ্বি-সংলাপ পদ কৃষ্ণের সংলাপাংশে শেষ হল। পরের একক সংলাপটি বড়ায়ির, তার পরেরটি রাধার।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান আকর্ষণ রাধাচরিত্র। এই চরিত্রকে কেন্দ্র করেই আখ্যান-বস্তুর বিবর্তন। নানা শিথিলতা এবং সংলাপ-বিস্তারের অপ্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যের মধ্যেও এই চরিত্র-চিত্রণে কবিচিত্ত অতন্দ্র।

রাধা চরিত্র সম্পর্কে প্রধান কথা হল এর বিবর্তন-ধর্ম। বিজয় গুপ্তের মনসায় এ-বিবর্তনের কিছু পরিচয় আছে; বড়ু চণ্ডীদাসের রাধায় তা পূর্ণ বিকশিত। পরিবর্তমান চরিত্র-চিত্র পুরনো সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ; চাঁদসদাগরের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ পরম কৌতূহল ও আনন্দের আকর্ষক হলেও সে চরিত্র স্থির।

রাধা-চরিত্রের বিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক। এ মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ভিত্তিতে রাধিকার যৌবন-চেতনাই প্রধানত ক্রিয়াশীল। বড়ু চণ্ডীদাসও যে এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন তা-ই আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করব।

তাম্বূলখণ্ড থেকে বিরহখণ্ড পর্যন্ত চরিত্র এবং আখ্যান-বিকাশের পিছনে কালগত একটি পরিমাপ স্পষ্টভাষায় নির্দেশ করেছেন কবি। বসন্তকালে তাম্বুল প্রেরণ, শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় :

> কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ। / তাত মধুকর মধু পীএ॥ / সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে। / তেকারণে থীর নহে মনে॥

ভারবহন, ছত্রধারণ শরতের রৌদ্রে : 'শরতের রৌদেঁ রাধা বড়য়ি বিকলী'।
বৃন্দাবনখণ্ডের সূচনায় আবার বসন্ত-বর্ণনা :

> এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল। / মনমথক জাগাএ॥ ল।
> সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল। / ফুটি বিরহি হৃদয়॥ ল॥

যমুনাখণ্ডে গ্রীষ্মকালে রৌদ্রতপ্ত পরিবেশ :

> উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ। / শীতল গম্ভীর জলে বহিতেঁ সুখাএ॥

আবার বিরহখণ্ডে ফিরে এসেছে চৈত্র মাস :

> আইল চৈত মাস। / কি মোর বসতী আশ / নিফল যৌবন ভারে॥

এক বসন্তে কাহিনীর আরম্ভ, তারপরে এল দ্বিতীয় বসন্ত, আবার ঘুরে, তৃতীয় বসন্ত এলে রাধা-বিরহে কাহিনী সমাপ্ত হল। অর্থাৎ দীর্ঘ দুই বছরের কাল ব্যবধান এ গল্পের আরম্ভ থেকে শেষপর্যন্ত বিস্তৃত। গল্পের আরম্ভে রাধা 'এগার বৎসরের বালী'। রাধার এগারো থেকে তেরো বৎসর বয়স পযন্ত চিত্তোন্মোচন এবং দেহ-মন-সমন্বিত উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিত্বের কাহিনী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। মানুষের জীবনে সাধারণভাবে দু-বছরের মূল্য যাই হোক না কেন এই বয়সে তা বিশেষ তাৎপর্যবহ। এই সময়টিই প্রকৃত বয়ঃসন্ধির কাল, দেহে-মনে যৌবন ও যৌবন-চেতনার আবির্ভাবের সময়।

কবি জন্মখণ্ডেই রাধার রূপবর্ণনায় বিশিষ্ট এবং সচেতন মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন : 'তীনভুবন জনমোহিনী। / রতিরস কাম দোহনী॥ / শিরীষ কুসুম-কোঁঅলী। / অদ্ভুত কনকপুতলী॥

-এর ভাব এবং ভাষার ব্যঞ্জনায় রাধার যে ভাব-রূপ ফুটে ওঠে তা কামকল্পনায় অতি কোমল ও একান্ত ইন্দ্রিয়াবেশপূর্ণ। এই অপূর্ব লাবণ্যযুক্ত নারীই যুগ যুগ ধরে মানুষের কাম-বাসনা মন্থিত 'কোঁঅলী পাতলী বালী'। কিন্তু সে দুর্ভাগ্যবশত 'নপুংসক আইহনের রাণী।' এখানেই চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের সম্ভাবনা বীজাকারে নিহিত। রাধার যৌবন-ক্ষুধা সম্বন্ধে আয়ানের তীক্ষ্ণবোধ ও ভবিষ্যৎ-চিন্তা লক্ষণীয় :

দেখি রাধার রূপ যৌবনে ।/ মাঅক বুয়িল আইহনে ॥/ বড়ায়ি দেহ এহার পাশে ।

রাধার চরিত্র-বিকাশের কতকগুলি স্তরের পরিচয়ে বিবর্তনটিকে সত্য করে তুলেছেন কবি। প্রতিনিয়ত বিপরীত মনন ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করে আঁকবার পদ্ধতি বড়ু চণ্ডীদাসে কেন বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত আমাদের সাহিত্য অপ্রচলিত ছিল। রাধার মানস বিবর্তনে দুটি শীর্ষমুহূর্ত বা পরিবর্তনবিন্দু লক্ষণীয়। একটি চরিত্রের অভ্যন্তরীণ, অপরটি বাইরের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি বৃন্দাবনখণ্ডে, অপরটি বাণখণ্ডে। এর মধ্যে রাধার মনোভাব ও কর্মপদ্ধতির স্তরে স্তরে পরিবর্তন ঘটেছে। তাম্বুল থেকে নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড-ছত্রখণ্ডে, বৃন্দাবন-যমুনা-হারখণ্ডে, বাণখণ্ড থেকে বিরহ খণ্ডে এই বিবর্তন লক্ষ্য করা চলে।

কৃষ্ণ রাধার কাছে প্রেম নিবেদন করে তাম্বুল পাঠাল। প্রেম-নিবেদন না বলে একে দেহ-কামনাও বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বড়ু চণ্ডীদাসের প্রেমবোধের কিছুটা পরিচয় নেওয়া যাক। কেবলমাত্র বড়ু চণ্ডীদাসেই নয়, সেকালে সাধারণভাবেই প্রেম ও দেহ-কামনার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি। বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের দু-একজন কবির মধ্যে ঐ পার্থক্যের সামান্য পরিচয় মেলে। পদাবলীর চণ্ডীদাস অবশ্য স্পষ্টত ইন্দ্রিয়াতীত। সাধারণভাবে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরাও তত্ত্ব ব্যাখ্যায় যাই হোন না কেন রূপ-রচনায় দেহবদ্ধ প্রেম-প্রীতি-মিলন-বিরহের কথাতেই মুখর। বড়ুর কাব্যে কৃষ্ণের দেহকামনাকে প্রেম বলে আখ্যাত করতে আমাদের সঙ্কোচ হয় ঠিকই, কিন্তু রাধার দেহবোধে ক্রমে হৃদয়ের স্পর্শ প্রবলতর হয়েছে। হৃদয়-সম্পর্কহীন দেহমিলনের ইন্দ্রিয়সর্বস্বতা ক্রমে রাধার কাছে হৃদয়ার্তিতে নবতর মূর্তি ধারণ করেছে। অবশ্য পরিণতিতেও দেহ-সম্বন্ধকে কবি একটিবারও বিস্মৃত হননি বা গৌণ করেননি।

কৃষ্ণ-প্রেরিত তাম্বুল এবং দেহমিলনের আবেদন রাধা ফিরিয়ে দিয়েছে। তার বালিকা বয়স, সে : 'না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী। / না জানো স্বরতী কেলী'। তারপরে তার ঘরে স্বামী আছে, পরপুরুষের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? এই দুটি কারণের তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য। রাধার প্রথম বাধা অন্তরের। দেহমিলনের সঙ্গে তার পরিচয় নেই, সবে যৌবন দেখা দিয়েছে দেহে, দেহের এই প্রথম যৌবনে এখনও তার হৃদয়ের উদ্বোধন ঘটেনি। দেহে যা যৌবন হৃদয়ে তাই প্রেম। বয়ঃসন্ধি দেহের, অন্তরের পূর্বরাগ। বয়ঃসন্ধির রাধা প্রেম জানে না। দেহে আর মনে তার মিলন

হয়নি—তাই অন্ধ দেহাবেগে যৌনচেতনার সাড়া জাগেনি। রাধা কৃষ্ণের তাম্বুল ফিরিয়ে দিল। দানখণ্ডে কৃষ্ণের ভয় প্রলোভন অনুরোধ কিছুতেই সে রাজী হল না। দানখণ্ডের দেহমিলন প্রায় একপক্ষের বলপ্রয়োগ। মিলনান্তে রাধার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় একটা সর্বাত্মক ঘৃণার ভাবই প্রকট :

ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ। / নিজ পতি বিহানে আবথা মোর দেখ ॥
একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে। / এত দুখ দিআঁ বিধি নিৰ্ম্মিল আহ্মারে ॥
লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ। / সে কাহ্নাঞিঁ লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ ॥

নৌকাখণ্ডের সংলাপ সঙ্গীতে ঘটনায় প্রায় পুনরাবৃত্তি। কৃষ্ণের কামনা, রাধার প্রত্যাখ্যান। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাধার আত্মসমর্পণ—প্রায় বলপ্রয়োগের সমান। কিন্তু দেহমিলন সম্পর্কে রাধার ভীতি অনেকাংশে অপসারিত। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সেই তীব্র ঘৃণা ও উচ্চকণ্ঠ ক্রোধের স্বর কিছুটা পরিবর্তিত। বড়ায়ির কাছে রাধার দেহমিলনান্তে যে বিবৃতি তাতে আগের মতো ধিক্কারবাণী শোনা যাচ্ছে না আর :

কথোদূর খেআইল নাঅ চক্রপাণী। / ঝাঝর নাঅ ভৈল চারি পাশে পাণী ॥ বড়ায়ি বড ভয় পাইলোঁ যমুনার জলে। / পার কৈল মোকে ভাল কহ্নাঞিঁ গোআলে ॥ ·· / আচম্বিত খরতর বহিলেক বাঅ।/ মাঝ যমুনাতে ডুবিআঁ গেল নাঅ॥ / ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে। / আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ বাখিল পরাণে ॥/ এবার কাহ্নাঞিঁ বড কৈল উপকার। / জরমেঁ শুঝিতেঁ নারেঁা এ গুণ তাহার ॥

রাধা চরিত্র-পবিবর্তনের এই ইঙ্গিত ভারখণ্ডে স্পষ্ট হয়েছে। রাধা এখানে অনেক পরিমাণ সক্রিয়। ভারবহনে এবং ছত্রধারণে কৃষ্ণকে সে নিয়োজিত করেছে, ভবিষ্যতে দেহদানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে—'মজুরিআ' বৃত্তি নিয়ে নানা রহস্য-কৌতুক করেছে এবং শেষপর্যন্ত দেহমিলনের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি।

ভারখণ্ড-ছত্রখণ্ডে রাধার সক্রিয়তা দেহ-নিরপেক্ষ তবে এখানে সে প্রগল্‌ভা ও চতুরা এবং কৌতুকময়ী। বৃন্দাবনখণ্ডে প্রেম ও দেহমিলনে রাধার সক্রিয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার বিরহে কৃষ্ণ কাতর বড়ায়ির মুখে এই বার্তা শুনে সে বৃন্দাবনের পুষ্পানে প্রবেশ করেছে—রাধার এই গমনে সুরের ও মনোভাবের এমন সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন লক্ষণীয় যে একে অভিসার বলে উল্লেখ করা চলে। সখী-পরিবৃত রাধার বৃন্দাবন-প্রবেশের এই চিত্র উল্লাসভরে এঁকেছেন বড়ু চণ্ডীদাস :

আগু করি বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাএ। / চিত্তের হরিষে সব গোপী গীত গাএ ॥
বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে। / আর নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁক পাশে ॥
খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তল ভার। / সঘন ছাড়িল রাধা হাম্বী আপার ॥
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে। / ভাল গীত গাএ বুলী পড়িলে মদনে ॥

বৃন্দাবনখণ্ডে রাধার মনের বাধা কেটে গেছে। এবারে প্রধান হয়ে উঠেছে বাইরের বাধা। কৃষ্ণের সঙ্গে মধ্যবৃন্দাবনে মিলনে আপত্তি নেই তার। কিন্তু :

যত দেখ মোর সখিগণে। / কাহারো ভাল নহে মনে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥
এবং সামী সাসু দুইহো খরতর। / আর খল সকল নগর ॥
সব তোর মোর দোষ চাহে। / তৈঁসি মোর মন থীর নহে ॥

এই বাইরের বাধা-অপসারণে একটু অলৌকিক উপায়ের অবতারণা করেছেন কবি। ঘটনাটি অলৌকিক এবং বাহ্য। যশোদার কাছে রাধা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তার হার ছিনিয়ে নেবার। এই অজুহাতে কৃষ্ণ তার প্রতি সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করেছে। রাধার সব বাধা ঘুচে গেছে। তার হৃদয়কামনা উদ্দাম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে:

এথাঞিঁ রহিআঁ বড়ায়ি সাজাইবোঁ ঘর। / এথাঞিঁ আণায়িবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর ॥/ এথাঞিঁ তা লয়ি মোঁ করিবোঁ শৃঙ্গার। / সফল করিবোঁ নব যৌবন ভার ॥
কত সহিবোঁ এ বড়ায়ি ল। / কুসুম শর বাণ কত সহিব ॥

বংশী খণ্ডে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করেছে, কৌতুক রহস্যে একটা দ্বন্দ্বের আভাস ফুটে উঠেছে। বংশীখণ্ডে প্রকৃত পক্ষে রাধাকৃষ্ণে কোন বিরোধ নেই। যে বিরোধিতার চিত্র তা 'রসকলহ' নামেই আখ্যাত হবার যোগ্য।

বিরহখণ্ডে রাধার প্রেমানুভূতি অন্তরের গভীরতর প্রদেশকে মথিত করেছে। কৌতুক-রহস্য-মিলনের স্থানে বিরহের বেদনা সুগভীর আর্তি ফুটিয়ে তুলেছে। এ-খণ্ডের রাধার সঙ্গীতগুলোর লিরিকধর্ম যে অধিক তা আগেই বলেছি। তবে এখানে রাধার বিরহে যে মনোভাব ব্যক্ত তা দেহমিলনের কামনায় কম্পিত। তবে দেহকে কেন্দ্র করলেও মনের লীলা এখানে নভোচারী।

এই 'নাটগীতি'তে অপ্রধান চরিত্র কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি। এদের দুজনের মধ্যে রাধার ভূমিকা গুরুতর। কৃষ্ণের চরিত্রাঙ্কনে বড়ু চণ্ডীদাসের একটু দ্বিধা আছে। পৌরাণিক কংসারি কৃষ্ণ ভগবান বিষ্ণুর বীররসাত্মক অবতার। তার দেহরূপ বর্ণনায়ও সংস্কৃত কাব্যোচিত শ্রেষ্ঠ উপমাদির সঙ্কলন করেছেন কবি। কিন্তু এই চিন্তা কবির হৃদয়ের এবং চরিত্রবোধের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে আমরা যাকে লাভ করেছি তার মধ্যে উন্নত মনোবৃত্তির অভাব থাকলেও প্রাণচাঞ্চল্যের হানি ঘটেনি।

কৃষ্ণচরিত্রের উপাদান চারটি—কামবৃত্তির প্রবলতা, বালসুলভতা, লঘু কৌতুক এবং গ্রাম্যতা। এই চারটি উপাদানের মিশ্রণ ঘটেছে তার মধ্যে। মিশ্রণের অনুপাতে সর্বত্র সমতা নেই।

কৃষ্ণের চরিত্রে যে কামবাসনার প্রকাশ তার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক কম। রাধা চরিত্রের শেষ পর্যায়ে দেহ ও মনে যে সম্মিলন, কৃষ্ণচরিত্রে তার সন্ধান মেলে না। রাধার রূপবর্ণনা শুনেই সে দেহভোগের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে, রাধার আপত্তি সত্ত্বেও প্রায় বলপ্রয়োগ করতে সে দ্বিধা করেনি। কৃষ্ণের এই কাম-ক্রীড়ার বিস্তৃত বিবরণে যখনই কৌতুকহাস্য এবং বালসুলভতার স্পর্শ লেগেছে কেবল তখনই তা আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

বড়ুর কৃষ্ণের দেহকামনা নাগর মনোবৃত্তির স্পর্শে মার্জিত নয় এবং বক্র তীক্ষ্ণতাও পায়নি। বিদ্যাপতির কৃষ্ণচরিত্রেও লাম্পট্যের চিহ্ন স্পষ্ট। প্রথম যৌবনের দেহ-চেতনাহীন রাধাকে সেও বলপ্রয়োগে আয়ত্ত করতে চেয়েছে। তবে তার ব্যবহার গ্রাম্যতামুক্ত। রাজসভার নাগরবিলাসীর পরিচয় তার বাচনভঙ্গিতে অতি প্রকট। বড়ুর কৃষ্ণে নাগর বৈদগ্ধ্যের অভাব আছে, কিন্তু গ্রাম্য প্রাণোচ্ছলতা সে অভাব পূর্ণ করেছে। গ্রামের দুরন্ত দুষ্ট ছেলে সে। বড়ায়ি রাধার কাছে কৃষ্ণের সাফাই গেয়ে যে কথা বলেছে : 'এবেঁ সুচরিত ভৈল সুন্দর কাহ্নাঞি ॥··· / এবেঁ সব লোকের সে

করে উপকার। / ধরম দেখিআঁ সে তেজিল পরদার' ॥

আসলে তার বিপরীত লক্ষণগুলিই তার চরিত্রে প্রকট। রাধার দেহ কামনায় সে মজুর হয়ে ভার বয়েছে, নৌকো বানিয়ে মাঝি সেজেছে। বিশেষ করে কালীদহ কালীয় নাগের কবল থেকে মুক্ত করে আপনার জলক্রীড়ার উপযুক্ত করবার জন্য বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত হতে সে দ্বিধা করেনি। এ-জাতীয় কর্মের মধ্যে প্রণয়ীসুলভ 'ধীরললিত' গুণাদির অভাব আছে; এবং তার ফলেই তাকে নাগর লাম্পট্যের স্তরে ফেলে রাখা সম্ভব নয়। এসব কর্মে কোথাও দুঃসাহসিকতা কোথাও বা কৌতুক-ভঙ্গি তাকে রুগ্ন মনোবিকার থেকে সুস্থ সবল গ্রাম্যতায় স্থাপিত করেছে।

কৃষ্ণের বালক-স্বভাব এবং বীরদম্ভ হাস্যের কারণ হয়েছে এ কাব্য-নাট্যে এবং এই হাস্য-বিকিরণ চরিত্রটিকে লালসা-লোলুপতার এক বিচিত্র বর্ণোচ্ছলতায় মণ্ডিত করেছে। বংশীখণ্ডে বাঁশী হারিয়ে কৃষ্ণের কাতরতায় তার বালক-স্বভাব সর্বাধিক প্রকট। এত মূল্যবান বাঁশীটি তার হারিয়ে গেল, কি কৈফিয়ৎ দেবে সে ভাই বলরামকে ; এবং : 'মাঞেঁ নিষেধিল পুতা কাহ্নে ল। / না করিহ গোঠে সয়নে। /

সেহো বোল না শুণিল কানে ল।

কাজেই, 'সুনি বাপ মাঞেঁ দিব গালী' ॥

কাব্যের মুখবন্ধে কৃষ্ণজন্মের উদ্দেশ্য হিসেবে কংসনিধনের কথা উল্লেখ করা হলেও কাব্যমধ্যে বীররসের স্থান নেই এবং প্রবেশের সুযোগও নেই। মাঝে মাঝে কৃষ্ণ যে বীরত্বের গর্ব করেছে অনেক সমালোচক প্রেমকাব্যের নায়কের পক্ষে তা অসমীচীন বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণের এই দম্ভে [স্বভাবতই এ দম্ভ বহ্বারম্ভ মাত্র। একবার খেলাচ্ছলে হাতের তীর ছোঁড়ায় (বাণখণ্ডে) সে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে]। তার চরিত্রের গ্রাম্য বালকোচিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং একটা লঘু কৌতুকের হাস্য এ চরিত্রটিকে আমাদের সহানুভূতি থেকে একেবারে বঞ্চিত করেনি। রাধাকে বশ করবার জন্য কৃষ্ণ নানাভাবে বীরত্ব প্রকাশ করেছে, তার আদেশ অমান্য করলে যে অবিলম্বে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে এ ভয় দেখিয়েছে। সে যে দেবরাজ বনমালী এবং কংস ধ্বংসের জন্যই তার জন্ম একথা ঘোষণা করতেও ভোলেনি। কিন্তু 'ঘোড়াচুল কাহ্নাই'-এর এত কথাও কেবল হাসিরই উদ্রেক করেছে। কবি এ-বিষয়ে সচেতন। কৃষ্ণের বীরত্ব-অহঙ্কারের পরেই তিনি বলছেন :

এহা সুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস।

কিন্তু হাস্যরস উদ্দাম হয়ে ওঠে যখন বিরহখণ্ডে কৃষ্ণ ভণ্ডযোগীর বেশ পরে গম্ভীর হয়ে অবৈধ প্রেমের বিরুদ্ধে ধর্ম উপদেশ দিতে থাকে :

তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী / আহ্মে দেব বনমালী / কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী।
মাঅ যশোদা মোর / মামা আইহন ল / তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী ॥

বড়ায়ির ভূমিকা টাইপ জাতীয়। তার রূপবর্ণনায় কবি যেন চরিত্রটির অন্তর-পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন : 'শ্বেত চামর সম কেশে। / কপাল ভাঙ্গিল দুইপাশে ॥ / ভ্রূহি চুন রেখ যেহ্ন দেখি। / কোটর বাটুল দুঈ আখি'।

রসিকতায়, কূটবুদ্ধিতে, ছদ্ম অভিনয়ে, রাধা-কৃষ্ণের কলহ ও বিলাস থেকে বহু দূরে অবস্থান, কিন্তু প্রয়োজনমতো অনুপ্রবেশ করে সন্ধি স্থাপনে সাহায্য করায় তার দূতী-ভূমিকা সার্থক। তবে সে হীরামালিনী শ্রেণীর কুটনী নয়। এ-মিলনে তার স্বার্থ নেই। কৌতুক এবং আনন্দই একমাত্র লভ্য। তাই বড়ায়ির চরিত্র রাধার শুভাশুভের প্রশ্নে হৃদয়াবেগে যুক্ত। কৃষ্ণের মদন-বাণে রাধা যখন মূর্ছিত হয়ে পড়ল বড়ায়ি তখন সাধারণ কুটনীর মতো আচরণ না করে কৃষ্ণকে বন্দী করে রাধার প্রাণ-দানের ব্যবস্থা করে তবে ছাড়ল। বড়ায়ির সঙ্গে রাধার প্রাণের সম্পর্ক—স্বার্থের নয়।

পাঁচ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অশ্লীলতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ তা অস্বীকার করবার মতো নয়। কিন্তু শ্লীলতা ও রুচিবোধ সম্পর্কিত প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ বর্তমানের থেকে ভিন্ন ছিল। তবু এ-কাব্যে দেহকামনার উদগ্রতায় এবং দেহমিলনের বর্ণনার পুনরুক্তিতে শ্লীলতার ভারসাম্য বিচলিত—এ কথা মানা যায় না। দেহমিলনের পুনরুক্তিও রাধার চরিত্র-বিকাশে নব পন্থানুসরণের ইঙ্গিতে সত্য এবং কৃষ্ণ চরিত্রের বালসুলভ লঘু কৌতুকে তার দেহকামনার কামুকতাও স্তিমিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাবিরহ খণ্ডে খণ্ডিত। কাব্য পরিণতিতে কি ছিল আজ আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু আখ্যান ও চরিত্রের গতি দেখে মনে হয় পরিপূর্ণ মিলন-সমাপ্তিই অপ্রাপ্ত অংশের সঙ্গে হারিয়ে গেছে। এবং সে মিলনও ভাবসম্মিলন নয়। পরিপূর্ণ দেহ-মন-প্রাণের মিলন। কারণ এ-মিলনে বাধা কোথায়? রাধার আন্তর-বাধা অপসারিত, সমাজ ও সংসার-চেতনাও বিদূরিত। কিন্তু কৃষ্ণের বৈরাগ্য? কৃষ্ণের বৈরাগ্যকে যে গম্ভীরভাবে গ্রহণ করা যায় না তা আগেই বলেছি। বাল-সুলভ লঘু-চাপল্য ও পরিহাস-রসিকতা সৃষ্টির জন্য কৃষ্ণের এই ভণ্ড যোগীবেশ। এবং বাণখণ্ডের পর থেকে কৃষ্ণের এই আপাত নিরাসক্তি [যদিও বাণখণ্ডেরই শেষ দিকে এবং বিরহখণ্ডে একাধিকবার দেহমিলনের উল্লাসের ছবি আছে] দেখে বলতে ইচ্ছে করে : 'জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা / শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে ওগো অন্যমনা, / নূতন উৎসাহে'।

তাই এ-নাটগীতের বিচ্ছেদান্ত পরিণতির কোন সম্ভাবনাই মনে আসে না।

□

৪. বৈষ্ণব পদসাহিত্য

৪.১. পদাবলী পাঠের ভূমিকা

এক

বাংলা বৈষ্ণব কাব্যের ইতিহাস দীর্ঘ এবং বিচিত্র। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই কাব্যধারা গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। সেকালের হয়ে একালের প্রেমানুভূতির সঙ্গেও সেতুবন্ধ রচনায় অন্তত কয়েকজন বৈষ্ণব কবির রচনাসৌকর্য ও আবেগ-গভীরতা চমৎকার সাফল্যের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান আলোচনায় বৈষ্ণব কবিতার সাহিত্যসৌন্দর্যই আমাদের লক্ষ্য; তবে পটভূমি হিসেবে এই কাব্যধারার কিছু ইতিহাস ও প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

দুই

বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনায় এর ধর্ম ও দর্শনের পটভূমিই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ধর্মবিবিক্ত কাব্যসৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব তত্ত্ব, দর্শন ও রসচিন্তার ধারা অনুসরণ এখনও এই কাব্য-সাহিত্যের পঠন-পাঠনে প্রধান জিজ্ঞাসা বলে বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলন যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। চৈতন্যোত্তর পর্বে এই ধর্মান্দোলনের সহজ বিস্তৃতি এবং সর্বস্বীকৃত প্রাণোন্মাদনা ও ভাবোচ্ছ্বাস বাঙালির চিত্তলোকের মূলতন্ত্রীকে সজাগ ও বহমান করে তুলেছিল, কাব্যসৃষ্টির প্রবাহে কতকগুলি অতি প্রবল তরঙ্গের সৃষ্টিও এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বৈষ্ণব কাব্যের কোন ছাত্রই বৈষ্ণবদর্শন, ধর্মসাধনা এবং রস-তত্ত্বের আলোচনাকে অবহেলা করতে পারেন না। তবুও একথা সত্য যে কাব্য ও দর্শন এক বস্তু নয়, সাধন-তত্ত্ব এবং রস-সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান পৃথক মহলে এবং অধিকার স্বতন্ত্র রাজ্যে। তাই চৈতন্যোত্তর ধর্ম ও দর্শনে বিশ্বাসী কবিদের অজস্র নামের মধ্যে জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসকে পৃথক করে চেনা যায়। তাঁদের এ পরিচয় তাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হিসেবে নয়, কবি হিসেবে। নিষ্ঠাবান ভক্ত তাঁরাও ছিলেন, কিন্তু কেবল ঐ মূলধনেই তাঁদের প্রাধান্য নয়। ঐ দিক দিয়ে বিচার করলে হয়ত আরও মহত্তর ভক্ত-মহান্তের সন্ধান মিলবে। কবিত্ব নামক বাড়তি গুণের অধিকারী হয়েই জ্ঞানদাস প্রমুখেরা আমাদের চিত্তলোকে আসন করে নিয়েছেন। বৈষ্ণব-শাক্ত-ধার্মিক-নাস্তিক নিরপেক্ষভাবে রস-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রের কাছেই তাঁদের আবেদন গিয়ে পৌঁছয়।

তাত্ত্বিক ও সাধক ধর্মসাধনার অঙ্গ-হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলীর পঠন-পাঠন অবশ্যই

করবেন। কিন্তু তা কাব্যপাঠের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে না। দুয়ের লক্ষ্য এবং পথ মূলত পৃথক।

যে-কোন যুগের কাব্য সম্পর্কেই রসিক মানুষের একটি প্রশ্ন—বিশুদ্ধ আনন্দবিধানে তার কতখানি সার্থকতা? কোন রসিকই কাব্যকে স্বরাজ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্যের তল্পিবহনে প্ররোচিত করবেন না, ধর্ম কিংবা দর্শনের পরমার্থিক জিজ্ঞাসাই হোক কিংবা রাজনীতি-সমাজনীতির প্রত্যক্ষ সমস্যা-সাধনই হোক। যে যুক্তিতে কাব্যসাহিত্যকে রাজনীতির অস্ত্রে পরিণত হতে দেওয়া চলে না, ঠিক সেই একই যুক্তিতে ধর্মপ্রচারের বাহনেও নয়। ধর্মপ্রচার এবং ধর্মীয় উপলব্ধি ভিন্ন জিনিস বলে তর্ক করা চলে। কিন্তু ধর্মীয় উপলব্ধি যে পর্যন্ত গোষ্ঠীক সে পর্যন্ত তার প্রকাশ প্রচারই। তা যখন ব্যক্তিক উপলব্ধির নিবিড়তায় চেতনার স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তখনই তার প্রকাশ রূপময় কাব্যকর্ম হয়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক উপলব্ধির বেলাতেও ঐ একই কথা। কাব্যের ছাত্র এর সাহিত্যরসের ও রূপসৌন্দর্যের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত, কিন্তু ধর্মসাধক এর বক্তব্যেই তৃপ্ত।

তিন

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিলে এর বিকাশের ধারাটি অনুসরণ করা যাবে, এবং এর মাধ্যমে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্কটি কতটা অচ্ছেদ্য তাও অনুধাবন করা যাবে।

পদাবলীর জন্মরহস্যটি এদিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রয়াত ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই সমস্যাটির একটি নিঃসংশয়িত সমাধান উপস্থিত করেছেন। সুবিস্তৃত তথ্য সংগ্রহে এবং গভীর পর্য-বেক্ষণের মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার করেছেন :

প্রথমত, পুরাণাদিতে বর্ণিত ব্রজলীলার উৎসে বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার জন্ম নয়।

দ্বিতীয়ত, অতি প্রাচীনকাল থেকে সারা ভারতে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় খণ্ড খণ্ড লৌকিক প্রেমকবিতা প্রচলিত ছিল। এগুলি ধর্ম অসম্পৃক্ত এবং সম্পূর্ণ মানবিক। কিন্তু এদের বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য এবং স্থানে স্থানে গভীরতা অবশ্য লক্ষণীয়।

তৃতীয়ত, অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ করে রচিত কিছু কিছু কবিতা উপরোক্ত শ্লোকভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। এরা লৌকিক, ধর্মের প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র নেই। সম্ভবত রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রচলিত অতি প্রাচীন মানবিক প্রেমবিষয়ক লোকসঙ্গীতগুলির উৎস থেকে এরা সঙ্কলিত।

চতুর্থত, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এই কবিতাগুলি ভাব ভাষা রচনারীতি বা প্রেমানুভূতির বিচিত্রতা কোন দিক দিয়েই মানবিক অন্যান্য খণ্ড কবিতাগুলি থেকে পৃথক নয়।

এই সাধারণ উৎস থেকেই রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমকবিতা বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।

এর প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে একদিকে 'গীত-গোবিন্দ' অন্যদিকে 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'কবীন্দ্র বচনসমুচ্চয়'-এর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এবং অন্যান্য প্রেমকবিতাগুলি। ড. দাশগুপ্ত অজস্র উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে উপরোক্ত শ্লোক সঙ্কলন দুটির রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখবিহীন কবিতাগুলির সঙ্গে চৈতন্যোত্তর কবিতার রূপ পরিকল্পনার কত ঘনিষ্ঠ ঐক্য।

ড. দাশগুপ্তের এই আলোচনা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত শক্তি ও সমর্থন সঞ্চয় করে। মানবিক প্রেমলীলার সূত্রেই বৈষ্ণব-পদাবলীর জন্ম এবং চৈতন্যোত্তর ধর্মদর্শন ও রসতত্ত্বে প্রভাবান্বিত কবিরাও একান্ত মানব-কবিতার রূপ, রস, ভঙ্গি ও জিজ্ঞাসাকেই আশ্রয় করেছেন। কাজেই মানবিক প্রেম-কবিতার অনুভূতির গভীরতা ও প্রসাধন কলার নিপুণতার দিক থেকে এর বিচার করলে সাহিত্যিক আস্বাদনের দিক থেকে সত্য লঙ্ঘিত হয় না।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে চারটি পর্ব স্পষ্টত লক্ষণীয়। [১] চৈতন্য-পূর্ব [২] চৈতন্য সমসাময়িক [৩] চৈতন্যোত্তর-প্রভাবযুগ। [৪] চৈতন্য-প্রভাবোত্তর যুগ। স্বভাবতই এই পর্ববিভাগের কেন্দ্রে চৈতন্যদেবের উপস্থিতি। বাংলা বৈষ্ণব কবিতা চৈতন্যদেব দ্বারা অতি গভীরভাবে প্রভাবিত। তাঁর আবির্ভাব ও তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা ধর্মসম্প্রদায়, দর্শন, সাধনতত্ত্বই বাংলা বৈষ্ণব কবিতার অতি বিস্তৃতিকে সম্ভাবিত করেছে।

চৈতন্য-পূর্ব পদাবলী সাহিত্যের কবি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদকর্তা চণ্ডী-দাসকেই গ্রহণ করা চলে। অবাঙালী কবি বিদ্যাপতিও এ পর্বের কবি। এঁরা কেউই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। কাজেই পরবর্তী পদাবলীর ধারায় ফেলে এঁদের বিচার অনৈতিহাসিক। এঁদের প্রেরণাও পৃথক। কেউ বা পঞ্চোপাসক হিন্দু, কেউ বাশুলীপূজক, কেউ সহজিয়া। রাধাকৃষ্ণের কবিতার প্রতি এঁদের আকর্ষণ মূলত সাহিত্যিক—ধর্মীয় নয়।

চৈতন্য সমসাময়িক মুরারিগুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ কবিরা ভক্ত বৈষ্ণব হলেও রাধাকৃষ্ণ লীলার যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বৃন্দাবন-গোস্বামীদের চর্চায় পরিপূর্ণ রূপ পায় তার ছত্রচ্ছায়াতলে বসে কবিতা লেখেননি।

চৈতন্য-পরবর্তী কবিরা সম্পূর্ণত বৃন্দাবনের দার্শনিক ও তত্ত্ববেত্তাদের দ্বারা গভীর-ভাবে প্রভাবিত। কাজেই এই পর্বের কবিদের আলোচনায় দর্শন ও তত্ত্বরাজ্যের পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এ পরিচয়ে আলোচনার সূত্রপাত মাত্র, সমাপ্তি নয়। পটভূমি হিসেবে এর বিচার-বিশ্লেষণ ও স্বরূপ উপলব্ধির পরেই পাঠক এই পর্বের কবিদের ব্যক্তিগত প্রেমজিজ্ঞাসা এবং রূপচেতনা সম্বন্ধে ধারণালাভ করতে সক্ষম হবেন। এই প্রসঙ্গে কবির ধর্মচেতনা, প্রথানুগত্য এবং স্রষ্টাসত্তার সম্পর্ক নির্ণয় করা যেতে পারে। এ পর্বের কবিরা গভীরভাবেই ধর্ম ও সাধনায় বিশ্বাসী। কিন্তু সাহিত্য-পাঠকের দ্রষ্টব্য হল এই যে, কবির ব্যক্তিত্ব এই ধর্মজিজ্ঞাসার সাগরে জলবিন্দুর মতো

মিলিয়ে গেছে না আপন ব্যক্তিগত অনুভূতিতে তাকে নিজের মনের রঙে রাঙিয়েছে, অথবা গভীর উপলব্ধির মুহূর্তে ধর্মবোধের সমস্ত আবরণ ছিন্ন করে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। রসতত্ত্বের ক্ষেত্রেও সচেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন—বৃন্দাবনের রসপর্যায় অনুসরণে প্রথায় বিশ্বাসী হলেও কবির কবিপ্রাণ সমস্ত স্তরগুলিতে সমভাবে আলোড়িত কিনা। এই বিশ্লেষণই তাঁর ব্যক্তিত্বের অনেকখানি পরিচয় আমাদের কাছে উপস্থিত করবে।

চৈতন্যপ্রভাব কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে নিঃশেষিত হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের অজস্র বৈষ্ণব পদে সাধারণত প্রতিভাহীন অনুকরণ লক্ষণীয়।

চার

প্রাচীন বাংলা কাব্যের দুই ধারা—আখ্যানকাব্য এবং পদাবলী। ক্বচিৎ এদের মিশ্রণজাত একটা রূপাকৃতির নিদর্শনও মেলে, যেমন কৃষ্ণকীর্তনে এবং নানা বৈষ্ণব পালাগানে। পদাবলীই বাংলার প্রাচীন গীতিকবিতা।

স্বভাবতই একালে গীতিকবিতা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা প্রাচীনকালের কবিতায় তার যথাযথ প্রতিফলন অনুসন্ধান অকর্তব্য। একালে গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ই মুখ্য। বাইরের জগৎ এখানে কবির অন্তরজগতে রূপান্তরিত হয়। তারই ভাষারূপ হল গীতিকবিতা। গীতিকবিতায় কবির উপলব্ধি স্বরূপত উচ্ছ্বসিত এবং আবেগ-কম্পিত, ভাষাভঙ্গিও সেরূপ। কাহিনী বা চরিত্র-চিত্রণে গীতি-কবির দৃষ্টি আবদ্ধ নয়, কেবল অনুভূতির রাজ্যেই তার পরিক্রমা। বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে রেনেসাঁস-পরবর্তী য়ুরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম আধুনিক গীতিকবিতার আবির্ভাবকে সূচিত করে। বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ তথা আধুনিক গীতিকবিতা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সামগ্রী। স্বভাবতই প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যে গীতিকবিতার এ আদর্শ খুঁজলে ব্যর্থই হতে হবে।

প্রাচীন বাংলা পদসাহিত্যের ইতিহাসে দুটি ধারার অস্তিত্ব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। [ ] সাধনসঙ্গীত [২] মানবিক অনুভূতিমূলক গান। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের গানগুলি থেকে শুরু করে বৈষ্ণবসহজিয়াদের কবিতা, বাউল ও সুফীগান এবং রামপ্রসাদ প্রমুখ শাক্তকবিদের শ্যামাসঙ্গীত উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব কাব্যের 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর গীতিকবিতা হিসেবে নাম করতে হয় বৈষ্ণব প্রেম-কবিতাগুলির, বাল্যলীলামূলক কবিতার এবং শাক্ত ধারার আগমনী ও বিজয়া গানের। এই দুই শ্রেণীর গীতিকবিতার রূপ ও স্বরূপের পার্থক্যটি অনুধাবনযোগ্য।

[১] সাধনসঙ্গীতে কবির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কবি সেখানে আপন অন্তরের উপলব্ধি ও কামনাকে ব্যক্ত করেন। কিন্তু মানবিক অনুভূতিমূলক কবিতাগুলি কবির নিজের কথা নয়; রাধা, কৃষ্ণ, যশোদা, মেনকা,

উমার অন্তরগুঞ্জনে পরিপূর্ণ। গীতিকবিতা হিসেবে এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় সাধনসঙ্গীতের কবি আপনার ব্যক্তি-অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করে গীতিকবিতার আধুনিক আদর্শের অধিকতর সামীপ্য লাভ করেছেন। কিন্তু একটি কথা ভুললে চলবে না যে সাধকেরা সাধ্যবস্তুর যে স্বরূপ বর্ণনার চেষ্টা করেছেন, সাধন-পথের যে ইঙ্গিত করেছেন তা তাঁদের ব্যক্তিক উপলব্ধিজাত নয়, ধর্মসাধক-গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি। যদি কবির ব্যক্তিক উপলব্ধি কখনো গোষ্ঠীক চেতনাকে ছাপিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, কিম্বা ভাষারূপের সৃষ্টিতে গোষ্ঠীবোধকে ব্যক্তিত্বের রঙে জারিয়ে আপনার করে নিতে পারে তবেই তা খাঁটি গীতিকবিতা হয়ে ওঠে। সাধনসঙ্গীতের ধারায় সে জাতীয় দু চারটি কবিতার সন্ধান মেলে না এমন নয়, কিন্তু সাধারণভাবে সাধনসঙ্গীত ধর্মসম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও সাধ্য-সাধনের কথাই বলে।

[২] দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলির মানবিক অনুভূতিজাত রসাবেদন সাধারণভাবে এদের কাব্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে। তত্ত্বদর্শনের আলোচনা কমই কবিতা হয়ে ওঠে—আর কবিত্বের স্বর্গে উন্নীত হবার জন্য তাকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। মানব জীবনলীলা ও রূপজগৎ-বিবিক্ত আধ্যাত্মিকতাকে রূপ ও জীবনলীলার আয়ত্ত করতে হয়। অপরপক্ষে মানুষের প্রেম-স্নেহের অনুভূতি-উপলব্ধির বিচিত্র তরঙ্গোদ্বেলতা সার্থকভাবে ভাষাধৃত হলেই কাব্যত্ব পায়।

[৩] দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি ক্ষীণভাবে হলেও কাহিনীর একটি পটভূমিকে যেন পরিবেশ রচনার কাজে ব্যবহার করে। চরিত্রের কিছুটা আভাস এদের মধ্য থেকে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়। প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলি সেদিক থেকে নিরঙ্কুশ, তাদের খণ্ডত্ব সম্পূর্ণ, পারস্পরিক সম্পর্কশূন্য এবং আধুনিক গীতিকবিতার রূপধর্মের কিছুটা নিকটবর্তী।

বৈষ্ণব পদাবলী কাব্যের গীতিধর্ম উপরে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতটি স্মরণ রেখে বিচার্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমোপলব্ধি এ কবিতাগুলিতে আবেগ ও উচ্ছ্বাসে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। কবির ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রকাশ না হলেও, রাধা বা কৃষ্ণের মানসিক নানা ভাব ও অনুভূতিকে এই কবিতাগুলি ধরে রেখেছে। বস্তুজগৎ এই কবিতায় স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, রাধা বা কৃষ্ণের মানস উল্লাস বা বেদনার বর্ণসম্পাতে রঞ্জিত হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্বজগৎ সেখানে রাধা বা কৃষ্ণের মনোজগতে রূপান্তরিত, ভাষা এই রূপান্তরকে ধরে রেখেছে।

কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের মন-জগতের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তো কোনই বস্তু-ভিত্তি নেই, অন্তত কবিতায় প্রত্যক্ষত নেই। আসলে মানস প্রতিক্রিয়ার ঐ বিশেষ ধারাটি কবির অন্তর থেকেই রাধা বা কৃষ্ণের উপরে আরোপিত। বস্তুর রূপান্তর এখানে কবিচিত্তের বর্ণসম্পাতেরই ফল। এদের গীতিধর্ম তাই পরোক্ষ, কিন্তু আধুনিক অর্থের বিচারেও অনুপস্থিত নয়।

পাঠ৷ কবিতার রূপরীতিতে দুটি পদ্ধতি সর্বত্র লক্ষণীয়—চিত্রধর্ম ও সঙ্গীতধর্ম। এদের

মিলিত রূপ বা একক রূপ কবির সাধনার উপায়রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। গীতি-কবি বিশেষ করে সঙ্গীতধর্মকে উপায়রূপে গ্রহণ করবেন এমন মনে করার কারণ নেই—উভয় পন্থাই তাঁর কবিতায় অনুসৃত হতে পারে। অবশ্য গীতিকবির মনো-জগতের প্রবলতা ও প্রাধান্যের জন্য চিত্রগুলিও সীমারেখা বিস্মৃত হয়ে কিছু সঙ্গীতের অসীম-দ্যোতনাকে আয়ত্ত করতে চায়। তাই চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের সঙ্গীতরীতি ও চিত্রকল্পের অস্পষ্ট রহস্যপ্রবণতা তাঁদের কবিচিত্তের অধিক গীতিধর্মেরই ফল। কিন্তু তাই বলে বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের চিত্রধর্মের প্রাধান্য হেতু তাঁদের রচনাকে গীতি-কবিতার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা চলে না। রবীন্দ্রকাব্যের পরিমাণগত প্রাচুর্য ও গুণগত গভীরতার দ্বারা বর্তমান যুগের বাঙালি পাঠকসমাজ এতই আচ্ছন্ন যে রোমান্টিক সুদূরতা, অসীম অরূপের রহস্য ও তৃষ্ণা ব্যতীত সার্থক গীতিকবিতা রচিত হতে পারে বলেই মনে করা হয় না। বস্তু-অনুগ চিত্রকল্প, ক্লাসিকধর্মী প্রত্যক্ষ স্পষ্টতা গীতিকবিতার বিরুদ্ধ প্রান্তীয় সামগ্রী বলে ধারণা জন্মে। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের কবিতার মধ্যে কবির ব্যক্তিক অনুভূতি ও উচ্ছ্বসিত আবেগ স্তম্ভিত হয়ে থাকতে পারে, তার তরঙ্গকম্পন ঐ ক্লাসিক চিত্রধর্মেও আস্বাদ করা যায়। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের ক্লাসিকধর্মী কবিতাকে তাই এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে।

ভাববৃত্তি ও বোধবৃত্তির প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে উঠবে। কবি যদি emotional হন তবেই যেন স্বাভাবিকভাবে তিনি lyricalও হয়ে ওঠেন। Intellectual কবিদের যেন সে পরিমাণ lyrical হয়ে উঠবার দাবি নেই। কিন্তু গীতিকবিতার মূল ধর্মগুলি মনে রাখলে তার বিচিত্র প্রকাশ হিসেবে এই বিভিন্নতাকে গ্রহণ করতে আপত্তি জাগবে না। বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও আন্দোলন যখন একটা স্বাদে পরিণত হয় তখন তাকে গীতিকবিতার উপলব্ধি হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই কবিমন প্রকাশ করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে রসাপ্লুতির দ্রবীভবন না হয়ে একটা বুদ্ধির দীপ্ত সমারোহে পাঠকচিত্ত ভরে যায়।[১]

তাই emotional, romantic এবং lyric এরা নিজের চারপাশে একটা দুর্ভেদ্য সীমারেখা টেনে নিয়ে সে রাজ্যে অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে এমন মনে করার কারণ নেই।

বৈষ্ণব কবিতায় চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসে এবং কিছু পরিমাণে বিদ্যাপতিতেও আধুনিক অর্থে গীতিধর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাস প্রায় সম্পূর্ণত রাধার সঙ্গে আপন কবিসত্তার সুগভীর বেদনাকে একাকার করে ফেলেছেন। রাধার আর্তি যেন চণ্ডীদাসের ; রাধার উপলব্ধির গভীর মৌনে যেন স্বয়ং চণ্ডীদাসকে দেখতে পাই। জ্ঞানদাস সম্পর্কেও একথা সীমাবদ্ধ অর্থে সত্য। বিদ্যাপতির ব্যক্তি-দৃষ্টি কিন্তু অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর দৃষ্টি মাঝে মাঝে কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে।

১ দ্রষ্টব্য : ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 'কাব্যালোক' প্রথম অধ্যায়।

পাঁচ

বাংলা বৈষ্ণব কাব্যে কয়েক শ্রেণীর কবিতা দেখা যায়। [এক] রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত; এদের মধ্যে কিছু বাল্যলীলা ও বাৎসল্যের পদ থাকলেও এরা প্রধানত প্রেমলীলাকেই অবলম্বন করেছে। [দুই] গৌরাঙ্গবিষয়ক। [তিন] প্রার্থনা বিষয়ক। [চার] চৈতন্যের জীবনীকাব্য। [পাঁচ] বিচিত্র বৈষ্ণব কড়চা-নিবন্ধ। [ছয়] বৈষ্ণব সহজিয়াদের গান।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গীতগুলি সাধনসঙ্গীত জাতীয়। বাউল-সুফীদের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীতের সঙ্গেই এর সহমর্মিতা। এখানে কবিদের সহজিয়া আরোপ সাধনের নানা ব্যাখ্যান এবং পরম প্রেমার উপলব্ধি বিচিত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের আলোচিত বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়। তবে অনেকের মতে বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাস সহজিয়া সাধক ছিলেন। তাঁর সহজিয়া উপলব্ধির বহু পদ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত একেবারে তর্কাতীত নয়।

চৈতন্যের জীবনকে অবলম্বন করে লেখা কাব্যগুলি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের নব দ্বার উন্মোচনে এদের ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। আমাদের বর্তমান আলোচনা এদের সম্পর্কে নয়। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য নিয়েই আমরা বর্তমানে আলোচনা করতে চাই। বিচিত্র কড়চা-নিবন্ধগুলির সাহিত্যিক-মূল্য অকিঞ্চিৎকর। এবং প্রার্থনা-বিষয়ক কবিতাগুলিকে সর্বদা বৈষ্ণব বলে চিহ্নিত করা শক্ত। বিদ্যাপতির 'মাধব' কৃষ্ণের নামান্তর হলেও নরোত্তমের কৃষ্ণের মতো অবশ্যই নন যাঁকে কবি নূপুর পরাতে চেয়েছেন। পঞ্চোপাসক হিন্দু বিদ্যাপতিতে মোক্ষ-কামনার স্পর্শ আছে, কিন্তু নরোত্তম সখীর আনুগত্যময়ী সেবাতেই তৃপ্ত।

বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রেমকবিতায়। প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্র চিত্রণ ও ব্যক্তিত্ব অঙ্কনে নয়, তাদের হৃদয়ের বিচিত্র ভাবতরঙ্গগুলিকে ভাষায় ধরে রাখায় তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন। তবে আমরা সর্বদাই মেনে নেব যে কবিতা রচনা কবি-প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। আর সত্যকার কবিপ্রতিভার অধিকারীদের কাছে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রেমকবিতা রচনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রেমকে বৈষ্ণবরা পরম পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছেন। যদিও সে প্রেম মর্ত্যলোকের নয়, তথাপি তার বহিরঙ্গে মানব-প্রেমলীলার সাদৃশ্য তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি। বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির ছবি আঁকতে গিয়েও কবিরা লৌকিক জগতের নরনারীর প্রেম-চিত্রকেই অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রেম উপলব্ধির মধ্যে যত বৈচিত্র্য অন্য কোন মানবিক হৃদয়-জিজ্ঞাসায়ই তা লক্ষ্য করা যায় না। প্রেমকবিতার গভীরতাও অন্য সব কবিতায় তুলনায় অধিক। আবার একান্ত তরল লীলা-রস-আস্বাদের চপল বর্ণবিকিরণকেও সে অস্বীকার করে না। রোমান্টিক দূরাভিসার ও অন্তর্গূঢ় রহস্যময়তা থেকে দেহের সীমায় বদ্ধ উদ্দাম

মিথুনানন্দ পর্যন্ত সর্বত্রই তার বিহার। বৈষ্ণব কবিরা নানাভাবে নরনারীর প্রেম-সম্বন্ধকে দেখেছেন এবং আস্বাদ করেছেন। অবশ্য চৈতন্য-পরবর্তী এ দর্শন এবং আস্বাদন দুটি ঘটনার উপরে নির্ভরশীল: প্রথমত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণব রসতত্ত্বের নির্দেশ। দ্বিতীয়ত, কবির ব্যক্তিগত প্রেমজিজ্ঞাসা। এদিক দিয়ে প্রাক্‌-চৈতন্য কবিরা স্বাধীনভাবে আপনাপন ব্যক্তি-জিজ্ঞাসার অনুসরণ করতে পেরেছেন।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী বা পরবর্তী প্রায় সব প্রেমকবিতার লেখকই প্রধানত নিম্নোক্ত পর্যায়ের কবিতা লিখেছেন—পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, সম্ভোগ, মাথুর প্রভৃতি। ভাব-সম্মেলন বলে অপর একটা পর্যায়ের কল্পনাও করা হয়েছে। নর-নারীর প্রেমানুভূতির এই বিশেষ অবস্থা বা Moodগুলি এদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই সুবিদিত। বৈষ্ণবগণ সেখান থেকেই এদের গ্রহণ করে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে এদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আমাদের লক্ষ্য নয়, সাহিত্য-সৌন্দর্যই বিচার্য।

স্বভাবতই এই বিভিন্ন পর্যায়ের প্রেমানুভূতির মধ্যে বিশিষ্টতা আছে। পূর্বরাগের নায়িকার প্রেমচেতনার মধ্যে ব্রীড়াসঙ্কুচিত ভাবটি লক্ষিত হবে। একটা অজ্ঞাতপূর্ব এবং অর্ধচেতন হৃদয়-মন্দিরের দ্বারোন্মোচনের রহস্য, ভীতি ও তৃষ্ণা, জানা-অজানার আন্দোলন এই পর্যায়ের কবিতায় প্রত্যাশিত। তেমনি অভিসারের নায়িকার মধ্যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন করে দয়িত-মিলনের তীব্র কামনা, দুঃসাহসিকতা, আত্মঘোষণার তীক্ষ্ণ মানসিকতা প্রকাশিত। মান পর্যায়ের কবিতায় যেমন বহিরাঙ্গিক লীলা-চাঞ্চল্য প্রকাশেরই অধিক সম্ভাবনা, সেরূপ মাথুরের কবিতায় দীর্ঘ বিরহজনিত গভীর আর্তিই অধিক প্রকাশিত।

তবে প্রধান কবিদের মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণ রূপের কল্পনায় বিভিন্নতা আছে। উপরোক্ত বিচিত্র ভাবগুলির প্রকাশে তাঁরা নানা বিচিত্র পন্থা গ্রহণ করেছেন। কয়েকজন বৈষ্ণব কবির কবিপ্রতিভা আলোচনায় এদিকেই আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

৪.২. বৈষ্ণব পদে নিমাই

এক

গৌরাঙ্গ বিষয়ক কবিতা শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের সাহিত্যিক প্রতিফলন। কেবল ধর্মপ্রধান হিসেবে শ্রদ্ধাই তিনি আকর্ষণ করেননি, কবির গভীর অন্তর পর্যন্ত তাঁর প্রভাবের প্রতিক্রিয়া জেগেছে। এ কবিতাগুলিও লিরিক পর্যায়ের। জীবনীকাব্য-গুলির মতো চৈতন্যের জীবন-ঘটনা বা ধর্মপরিচয় আদৌ এসব কবিতার অভিপ্রেত নয়। কবির ব্যক্তি-অনুভূতি ও ব্যক্তি-বেদনার রাজ্যেই এদের জন্ম। চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব কবিদের চিত্তে যে ভাবানুভবের সৃষ্টি করেছে সেই খণ্ড খণ্ড উপলব্ধির ভাষারূপই এখানে কবিতার আকারে ধরা পড়েছে। এ জাতীয় কবিতার আদর্শ সম্বন্ধে বলা যেতে

পারে যে চৈতন্যের জীবনের তথ্য বা চৈতন্য প্রচারিত ধর্মসাধনার বিবৃতিবর্ণনা নয়, কবির চিত্ত-প্রবণতা চৈতন্যের যে মানসমূর্তি গড়ে তুলেছে, তারই প্রকাশ এখানে কাম্য। কিন্তু এ বিষয়ে কয়েকটি বাধা সেকালের কবিতা-বিচারে অনুভূত হবে :

[১] চৈতন্য-সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিরা চৈতন্যকে স্বয়ং পূর্ণ ভগবানরূপে অনুভব করেছেন। তাই কবির ব্যক্তিক উপলব্ধি স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেনি।

[২] চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবেরা চৈতন্য আবির্ভাবের কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন। তাই সেই বিশ্বাসের ভাষারূপ দেওয়াই কর্তব্য মনে করতেন, অন্যরূপ চিন্তাপদ্ধতিতেও তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না।

[৩] চৈতন্যবিষয়ক কবিতা রচনা অত্যল্পকালমধ্যে বৈষ্ণব কবিতার একটা অবশ্য অনুসরণীয় প্রথায় পরিণত হল। তাই আপন চিত্তের প্রবণতা অনুযায়ী নির্বাচনের কথাই আর উঠল না।

ফলে এ পর্যায়ের কবিতায় কবিদের স্বাধীন উপলব্ধির বিস্তার চৈতন্যের ভগবত্তা ও বিশিষ্ট দার্শনিক মূর্তির সীমানায়ই আবদ্ধ ছিল। ব্যক্তি-চেতনার প্রকাশ তাতে কতটুকু? আপন আবিষ্কারী দৃষ্টির তীক্ষ্ণ আলোকপাতে তথ্যস্তূপ থেকে একটি বিশিষ্ট বিরাট ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উপলব্ধির স্বাতন্ত্র্যময়ী সুযোগ কোথায়? তবুও এ বিষয়ে কিছু ভালো কবিতা সৃষ্টি হয়েছে; তার কারণ সময়মতো আলোচনা করা হবে।

গৌরবিষয়ক কবিতার দুই শ্রেণী। চৈতন্য-সমসাময়িক এবং চৈতন্য-পরবর্তী।

দুই

চৈতন্য-সমসাময়িক কবিরা চৈতন্যের ভগবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই বিরাট ব্যক্তিত্বের যে মানুষী মূর্তির সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন সম্ভবত তারই ফলে চৈতন্য ভগবানের পূর্ণ অবতার বলে বিবেচিত হলেও একটা তত্ত্বমাত্রে পরিণত হননি, বহু দূরবর্তী একটা আদর্শের অস্পষ্ট অস্তিত্বে রূপান্তরিত হননি, মানবপ্রাণের সমগ্র উত্তাপ বঞ্চিত হননি। তবে লক্ষণীয় যে এ জাতীয় কবিতায় চৈতন্যের ব্যক্তিমূর্তি কচিৎ প্রকাশ পেয়েছে, তাঁকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই বেশি।

বাসুদেব ঘোষ, বল্লভদাস, মাধব, গোবিন্দ ঘোষও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন অথচ নিমাই সন্ন্যাসের কবিতায় তাঁদের আকুল ক্রন্দনে বৈষ্ণবত্ব ও ভক্তি অপেক্ষা মানবিক বেদনার রোলই উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে! স্বয়ং অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যের এই সন্ন্যাস গ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সবাইকে প্রবোধ দিচ্ছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির বেদনার্তি সমস্ত ধর্মবোধ ছাপিয়ে উঠেছে :

হেদে গো নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।/ বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও॥

বৈষ্ণবভক্ত গোবিন্দ তাঁর ধর্মবুদ্ধিতে সংস্থিত থাকলে কি এ ভাষায় গোরাচাঁদকে সন্ন্যাস থেকে নিবৃত্ত করবার কামনা জানাতে পারতেন? এখানে চৈতন্যের প্রতি

সহজ মানবিক ভালোবাসা ধর্মবোধকে ছাপিয়ে মহাপ্রভুর মাতার ও পত্নীর হৃদয়বেদনার স্বাভাবিক সহমর্মিতা লাভ করেছে। বাসুদেব ঘোষ একটি পদে বলেছেন :

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে / অরুণ-বসন পরে / কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।

আবার বল্লভদাস একটি কবিতায় শচীমাতার হৃদয়ার্তি ব্যক্ত করেছেন :

'সে চাঁচর-কেশহীন কেমনে দেখিব'।

নিঃসন্দেহে সন্ন্যাসকামী সন্তানের মুণ্ডিত মস্তক শতসহস্র স্মৃতির আলোড়নে মাতৃ-হৃদয়ে যে বেদনার সৃষ্টি করে প্রথম কবিতায় বাসুদেবের ব্যক্তিগত বেদনার ভাষা তার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। তাই মনে হয় সমসাময়িক কবিদের [বিশেষ করে বাসু ঘোষের] কবিচিত্ত জননী শচীদেবীর মাতৃপ্রাণের সামীপ্য লাভ করেছে। স্নেহ-প্রীতির আধিক্য কর্তব্যাকর্তব্য ভুলিয়ে সাধনপথে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু মানবহৃদয় বড় অবুঝ। সে আপন উচ্ছ্বাসের প্রবল প্রবাহে অন্য সব চিন্তা ও উদ্দেশ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রীতির এই আধিক্যকে আয়ত্ত করে বাসুদেব-বল্লভদাসের মতো কবিরা ধর্মবুদ্ধিকে ছাপিয়ে উঠেছেন, আর সেই মুহূর্তগুলির অতি স্বতন্ত্র এবং অতি তীব্র আর্তি কবিতারূপে সার্থক হয়ে উঠেছে। বাসুদেব ঘোষ বলছেন—

সকল মোহান্ত-ঘরে / বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে / তবু স্থির নাহি হয় কেহ। / জলন্ত অনল হেন / রমণী ছাড়িল কেন / কি লাগি তেজিল তার লেহ ॥

চৈতন্যের মতো ব্যক্তির পক্ষে জলন্ত অনলের মতো স্ত্রী কেন পরিত্যাজ্য তা নিশ্চয়ই ভক্তকবি বাসুদেব ঘোষের অজানা নয়। কিন্তু নিমাই সন্ন্যাসের আকস্মিক বেদনায় তিনি আত্মহারা, ধর্মাধর্মজ্ঞানরহিত—তাই তাঁর হৃদয়ের প্রকাশে বাধা নেই কোথাও।

তবে কবিরা যখন শচীমাতার ক্রন্দনের মধ্যেই নিজের বেদনার প্রতিফলন দেখেছেন তখন ভাগবতের প্রতি দোষারোপেও ক্ষান্ত হননি। বল্লভদাসের কবিতায় :

দুই হাত তুলি বুকে / চুম্ব দিয়া চাঁদ মুখে / কান্দে শচী গলায় ধরিয়া ॥ / ইহার লাগিয়া যত / পড়াইল ভাগবত / এ কথা কহিব আমি কায় / অনাথিনী করি মোরে / যাবে বাছা দেশান্তরে / বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইবে উপায় ॥

হৃদয় যখন বিশ্বাসকে ছাড়িয়ে যায় মনোভাবের সেই বিশিষ্ট স্বাধীন মুহূর্তগুলিই এই কবিতায় প্রকাশিত।

বাসুদেব ঘোষের 'আজিকার স্বপনের কথা' এ জাতীয় রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। বাস্তবে যে নিমাই নীলাচলবাসী সন্ন্যাসী, মাতার স্বপ্নের রাজ্যে সে স্নেহভিখারী। মায়ের স্নেহের চেয়েও তাঁর সন্ন্যাস যে বড় নয়, অন্তরে অন্তরে সে যে নীলাচলের শুষ্ক ধ্যানজীবন ত্যাগ করে মাতার স্নেহক্রোড়ে ফিরে আসতে চায় এই প্রত্যয়ই সত্য বলে শচীমাতার অন্তরের গভীর বিশ্বাস। কিন্তু এ তো সত্য হবার নয়। এ কেবলই কামনা। বস্তুজগৎ ত্যাগ করে এই অচরিতার্থ কামনাগুলি স্বপ্নজগতে গিয়ে রূপ নেয়। আপন বাসনারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় নিমাইয়ের মুখে :

ঘরেতে শুতিয়াছিলাম/অচেতনে বাহির হৈলাম / নিমাইয়ের গলার সাড়া পাঞা ।/

আমার চরণের ধূলি / নিল নিমাই শিরে তুলি / পুন কাঁদে গলায় ধরিয়া ॥ /
তোমার প্রেমের বশে / ফিরি আমি দেশে দেশে / রহিতে নারিলাম নীলা চলে। /
তোমারে দেখিবার তরে / আইলাম নদীয়াপুরে / কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে ॥

কিন্তু অতি প্রিয় হলেও এ স্বপ্ন—বাস্তবে সত্য হবার নয়। তাই :

আইস মোর বাছা বলি / হিয়ার মাঝারে তুলি / হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।

জাগরণে বাস্তব চিরস্থায়ী ক্রন্দন।

বাসুদেব-বল্লভদাসের ভাষার সরল প্রত্যক্ষতা লক্ষ্য করার মতো। তাঁরা অলঙ্কৃত বাণীবিন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করেননি, কিন্তু হৃদয়ব্যাকুলতা সার্থকভাবেই প্রকাশ করেছেন।

নিমাইয়ের নবদ্বীপ জীবনের যে কাহিনী সমসাময়িক কবিদের কাছে সর্বাধিক বেদনার উৎসারণে সার্থক হয়েছিল গীতিকবিতা রচনায় সেই নিমাই সন্ন্যাসের চারপাশেই তাঁদের ভাব-ভাবনা আবর্তিত হয়েছে। কাজীদলন ঘটনা হিসেবে প্রবলতর হলেও লিরিক বেদনার স্পর্শ-রহিত বলেই সম্ভবত তার নাটকীয় উল্লাস কবিদের আদৌ আকর্ষণ করেনি। ফলে এ জাতীয় কবিতায় বিচিত্রতার অভাব অল্প পাঠের পরেই চিত্তকে পীড়িত করতে থাকে। নীলাচল লীলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে এঁরা হয়ত তা বাদ দিয়েছেন, কিন্তু নবদ্বীপ লীলান্তর্গত অপরাপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও তজ্জাত আনন্দ ও বেদনারসের দিকে কবিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি।

তিন

চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে সমসাময়িকদের মূল পার্থক্য অনেকগুলি বিষয়ে—

[১] সমসাময়িকেরা চৈতন্যদেবকে ভগবান বলে বিশ্বাস করতেন। অপরপক্ষে বৃন্দাবন গোস্বামীদের তত্ত্বচিন্তার প্রভাবে ভগবান চৈতন্যের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক বোধই পরবর্তী কবিদের চেতনায় সত্য হয়ে ধরা পড়েছিল। চৈতন্যকে তাঁরা মনে করেছেন রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু-কৃষ্ণ। এঁদের মতে ভগবান কৃষ্ণের দ্বাপরে মর্ত্যাবতরণ ঘটেছিল পূর্ণস্বরূপে, কোন অংশাবতাররূপে নয়—যুগাবতাররূপে নয়। যুগাবতার যুগধর্ম প্রবর্তন করেন, পাপের বিনাশ পুণ্যের সংস্থাপন করেন। কিন্তু পূর্ণ ভগবান লীলাময়। রসাস্বাদই তাঁর মুখ্য কার্য। ব্রজলীলায় রস-আস্বাদন করতে এসে তিনি অংশাবতারের যুগ-দায়িত্বও কিছুটা পালন করেছিলেন গৌণত।

কৃষ্ণলীলায় ভগবানের রসাস্বাদের তিনটি বাসনা অপূর্ণ থাকে। [১] রাধা-প্রেমের স্বরূপ আস্বাদ। রাধাপ্রেমের অনুভূতি একমাত্র রাধাতেই বর্তমান, কৃষ্ণ তার বিষয় [object] মাত্র। কাজেই সে আস্বাদ স্বভাবত তিনি পান না। এই আস্বাদের বাসনা তাঁর থেকে যায়। [২] রাধার প্রেম-দৃষ্টিতে কৃষ্ণ কিভাবে প্রতিবিম্বিত হন,—সেই বোধ। [৩] এই প্রেম রাধাকে কিরূপ আনন্দ দেয়,—সেই অনুভূতি। এই তিনটি অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে রাধা তাঁর ভাব এবং কান্তি কৃষ্ণকে

দিলেন। রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করে কলিকালে নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে।

এই রাধাভাব ভাবিত এবং অঙ্গদ্যুতি সমন্বিত কৃষ্ণই চৈতন্যদেব—এই প্রত্যয়ে পরবর্তী কবিরা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী রচনা করেছেন। তাঁর আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য হল তাই স্বরূপ আস্বাদন আর আনুষঙ্গিকভাবে প্রেম বিতরণ করা, জগৎকে প্রেমময় করে তোলা। যেমন রাধামোহনের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় রাধার পূর্বরাগের ভাবটি শ্রীচৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা হয়েছে :

> আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ। / করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥ / পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ। / খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥ / ছল ছল নয়ন-কমল-সুবিলাস। / নব নব ভাব করত পরকাশ॥ / পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ। / রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥

তবে চৈতন্যের বাস্তব প্রেমোদ্বেলতার সঙ্গে রাধাভাবটির একটি সহজ সঙ্গতি এখানে স্থাপিত হয়েছে।

জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের কবিকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় এই তাত্ত্বিক উপলব্ধি তাঁদের রচনায় কতটা প্রকাশিত আলোচনা করা হবে।

[২] পরবর্তী কবিদের কাছে চৈতন্যের এই তত্ত্বরূপ-প্রাধান্যের অন্যতম কারণ মহাপ্রভুর মানবতা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব। তাই নবদ্বীপ-লীলায় তাঁকে কেন্দ্র করে মানবীয় উল্লাস-বেদনার যে সুযোগ আছে সে রাজ্যে তাঁদের প্রবেশ নেই। তাঁদের চিত্ত গৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করে এক মানস বৃন্দাবনে পরিক্রমা করেছে। এই মানস বৃন্দাবন সম্ভবত ভৌগোলিক নীলাচল। তবে তার বাস্তব পটভূমি এঁদের কবিতার বিষয়ভূত হয়নি। পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় নবদ্বীপের জীবনের ও হৃদয়ের যে মানবিক পরিবেশটি আছে পরবর্তী কবিতায় অনুরূপ কোন মানবিক-ভৌগোলিক পরিবেশ অনুপস্থিত। তাঁরা তত্ত্বের যে মানস-রাজ্যের সৃষ্টি করেছেন, প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের তীরে তীরে সে রাজ্যের অবস্থিতি।

[৩] ভাষা-ভাবের একটা সচেতন মার্জনা এই পর্বের শ্রেষ্ঠ গৌরবিষয়ক পদাবলীর সম্পদ। পূর্ববর্তী কবিদের ভাষা সহজ ও সরল, অনলঙ্কৃত কিন্তু প্রাণহীন নয়। বাসুদেব-বল্লভের সহজ ভাষায়ও হৃদয়বিদারী আবেদন আছে। তবে পরবর্তী কবিতার নিপুণ কলাচাতুর্য সেখানে দুর্লভ।

গোবিন্দদাস দ্বিতীয় পর্বের গৌরপদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা, তাঁর কবিতায় বহুক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক উপলব্ধি শিল্পরূপে বিধৃত হয়েছে। আপন চেতনলোক মন্থন করে শব্দসজ্জার বিচিত্র ধ্বনি ও অর্থসৌন্দর্য সমন্বয়ে তিনি চৈতন্যের যে ভাবমূর্তি রচনা করেছেন তার পরিচয় গোবিন্দদাসের কবিব্যক্তিত্ব ও শিল্পকৃতিত্বের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রহণ করা যাবে।

৪. ৩. বৈষ্ণব কবিতায় শিশু-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণের বাল্যলীলা নিয়ে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিদের কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা পাওয়া যায় না। এবং কেন পাওয়া যায় না তাও সহজেই অনুমান করা চলে। বালকের বিচিত্র কৌতূহল, সরস নবীনতা, খেয়ালী কল্পনা, তরল ভাবালু রূপকথার রাজ্যে মানস-পরিক্রমা অথচ স্নেহবুভুক্ষু পরনির্ভরতা উৎকৃষ্ট কাব্যসাহিত্যের বিষয় হতে পারে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'চৈতন্যভাগবত' ব্যতীত অন্যত্র বাল্যলীলারস উপভোগের চেষ্টা বড় চোখে পড়ে না। বালক চৈতন্য মুরারি গুপ্তকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে, নোংরা হাঁড়িকুড়ির জঞ্জালের মধ্যে বসে থেকে পাঠশালায় পড়বার অনুমতি আদায় করে, গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীদের উপরে নানা উপদ্রবের মধ্য দিয়ে আপন ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্ম্যের যে বিচিত্র পরিচয় রেখে গেছেন কবির দৃষ্টির কোমল স্নেহাতুর রঙে তা অপূর্বশ্রী ধারণ করেছে। মুকুন্দরামের কালকেতু বাল্যকালে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিলেও পূর্ণাঙ্গ শিশুচরিত্রাঙ্কনের প্রয়াস সেখানে নেই।

আসলে প্রাচীন বাংলা কাব্যসাহিত্য শিশুচিত্তের দিকে তাকাবার যথেষ্ট অবকাশ পায়নি। মুকুন্দরামের শ্রীমন্তকে হাততালি দিয়ে নাচিয়ে গৃহের প্রাচীনা দাসী দুর্বলার যে আনন্দ অথবা তার খোঁজে মাতা খুল্লনার যে ব্যাকুলতা তা সংক্ষিপ্ত পরিসরেই সমাপ্ত। সেকালের সমাজজীবনে রূপকথা সম্ভবত এখনকার চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত ছিল। শিশু মনোরঞ্জনে এই উপকরণটির বহুল ব্যবহার থাকবার কথা। ও বস্তুটা লঘু, উদ্দেশ্যহীন ও ধর্ম অসম্পৃক্ত। বয়স্কদের serious সাহিত্যে শিশু অনুভূতি ও শিশু-ক্রীড়াসঞ্জাত রস গৌণ ভূমিকামাত্র পেয়েছে—তাও একান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে। পাঠশালার দরিদ্র বালকদের মুখে বাসি পান্তাভাতের কথা শুনে চাঁদের মতো নৃপতিকল্প বণিকের ছয় পুত্রের বাসি পান্তা খাবার যে শখ হয়েছিল [মনসামঙ্গল—বিজয় গুপ্ত] তাকে শিশুচিত্তের অজানার প্রতি একান্ত কৌতূহলের সরল চিত্র বলে গ্রহণ করা যেত, যদি না মনসার সাপেরা এই বাসি ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবার জন্য বহু আগে থেকেই প্রস্তুত থাকত। সরল ও সরস শিশুসুলভ ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণের তুলনায় উদ্দেশ্যমূলকতার দিকে ঝোঁকের ফলেই এই চিত্র পরিকল্পিত হয়েছিল।

বিশেষ করে গীতিকবিতায় বাল্যলীলার প্রায় কোন স্থানই দৃষ্ট হয় না। শিশু মনস্তত্ত্বের বিচিত্র বিস্তৃত আলোচনার এই প্রাধান্যের যুগেও কবিদের সহানুভূতিতে প্রেমকল্পনা যতটা আলোড়নের সৃষ্টি করে বাল্যলীলারস তার সঙ্গে আদৌ তুলনা করার নয়। তাই কবিরা প্রেমকবিতা রচনার ক্ষেত্রে যতটা উৎসাহ অনুভব করেছেন বাল্যলীলামূলক কবিতা রচনায় তার অল্প অংশও নয়। বিশেষ করে প্রেমবোধের যে সর্বজনীনতা আছে বাল্যলীলারসাস্বাদে তা নেই। এ রসাস্বাদ পাত্রের বয়স ও জীবন-অভিজ্ঞতার উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব কবিরা প্রেমানুভূতির সমুদ্রতটে দাঁড়িয়েও এই শান্ত ক্ষুদ্র জলাশয়কে বিস্মৃত হননি প্রধানত একটি কারণে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাকে

অবলম্বন করে বৈষ্ণব দার্শনিক ও রসবেত্তারা সখ্য ও বাৎসল্য রস সৃষ্টির কথা বলেছেন। বৈষ্ণবীয় সাধনধারায় এই দুটি মার্গ যে গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রদ্ধার্হ গোস্বামীদের এই সিদ্ধান্ত এ শ্রেণীর কবিতা রচনায় অনেক কবিকেই প্রেরণা যুগিয়েছে। বহুক্ষেত্রে এ প্রেরণা একান্তই ধর্ম-প্রেরণা, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যে স্বাভাবিক কাব্যরসবোধ এ কবিতার জন্ম দেয়নি এমন মনে করার কারণ নেই।

দেখা যাচ্ছে রসসৃষ্টির দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণের বাল্যলীলাকে বৈষ্ণব কবিরা দেখেছেন—সখ্য ও বাৎসল্য। সখাদের সম্পর্কের মধুর সৌহার্দ্য কাহিনীবিবিক্ত গীতিরস সঞ্চারে যথেষ্ট সার্থক হতে পারে বলে মনে হয় না। এখানেও হয়নি। সখ্যানুভূতিতে সঙ্গীত-আর্তি স্বভাবতই স্খলিতচরণ। বিশেষ করে গোষ্ঠে গমন ও বংশীধ্বনি কিংবা রাখাল রাজা এমনি বৈচিত্র্যহীন দু-চারটি মাত্র ঘটনার পটভূমি এ কবিতাগুলিকে এমন কিছু স্বাদু করে তোলে না।

বাল্যলীলা পর্যায়ের ভালো কবিতা বাৎসল্য রসাত্মক। শিশুর নৃত্যে মাতার যে আনন্দ তার উল্লাসটুকুই তালভঙ্গের সব ত্রুটি, কলাকৌশলহীনতার সব সামান্যতা ঢেকে দিয়ে তাকে এক মাহাত্ম্য ও গৌরব দান করে:

> দেখসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া। / কোথা গেল নন্দ রায় / আনন্দ বহিয়া যায় / নয়ান ভরিয়া দেখসিয়া॥ / চিত্রবিচিত্র নাট / চরণে চাঁদের হাট / চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী। / সাধ করিয়া মায় / নূপুর দেছে রাঙা পায় / নাচিয়া নাচিয়া আইস দেখি॥ [যাদবেন্দ্র]

কিন্তু এর প্রতিটি চরণপাতে মায়ের হৃদয়ের স্নেহবারিধি উন্মথিত হলেও তাতে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশের চিহ্ন পড়বার কথা নয়।

> প্রতি পদচিহ্ন তায় / পৃথক পড়িয়া যায় / ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে। [যাদবেন্দ্র]

আনন্দ এবং স্নেহের আতিশয্যে মাতা আপন সন্তানকে ভগবানের সঙ্গে একাকার করে ফেলে। কিন্তু সে একাত্মবোধ ধ্রুব বিশ্বাস নয়। ধ্রুব বিশ্বাস হলে এ জাতীয় কবিতার অনেকখানি মাধুর্যই নষ্ট হয়ে যেত। যে শিশুর পদচিহ্নে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ প্রভৃতির চিহ্ন পড়ে তার প্রতি বাৎসল্য বাধাহীন হয়ে উঠতে পারে না। শিশুর প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার অক্ষম নির্ভরশীলতার ধারণা। কাজেই যেখানেই কৃষ্ণের ভগবৎমহাত্ম্যের প্রকাশ সেইখানেই বাৎসল্যরস সঙ্কুচিত।

শিশু কৃষ্ণের নৃত্য, ননীভক্ষণ, মাতা কর্তৃক ভর্ৎসনা ও বন্ধন, মান-অভিমান প্রভৃতি বাৎসল্য রসানুভূতির চিরন্তন আনন্দের ধারা কবিতাগুলিতে স্তম্ভিত হয়ে আছে। একালের শিশুর জীবনলীলায় ঘটনাগত বাস্তবতার কিছু রকমফের হলেও এ থেকে নির্যাসিত বাৎসল্যরসজাত আনন্দধারার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। তাই এর আনন্দ চেতনা এ যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। দু-একটি পদে শিশু চোরের চৌর্য-কৌশল সরস কৌতুকের সঞ্চার করেছে। যেমন:

> হেদে গো রামের মা ননীচোরা গেল এই পথে? / শূন্য ঘরখানি পায়্যা / সকল

নবনী খায়া / দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি। / অঙ্গুলির চিনাগুলি / বেকত হইবে বলি / ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানি ॥ / ক্ষীর ননী ছেনা চাঁছি / উভ করি শিকা গাছি / যতনে তুলিয়া রাখি তাতে। / আনিয়া মথন-দণ্ড / ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড / নামতে থাকিয়া মুখ পাতে ॥ [যদুনাথ দাস]

বর্তমান কালে অবশ্য গৃহস্থঘরে ছানা সর ননীর প্রাচুর্য নেই। কিন্তু ঘরে ঘরে এই শিশু চোরের উপদ্রব কিছুমাত্র কমেনি। অবশ্য একথা স্মরণযোগ্য যে বাৎসল্য রসবোধের এই বিশিষ্ট ধারাটির সঙ্গে বাংলার জল-মাটি, গ্রাম্য সমাজ ও পরিবার জীবনের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে নতুন জীবনাদর্শের মধ্যে একে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়ানো না গেলেও এর রসাস্বাদের দ্বার রুদ্ধ হয়নি।

এ-জাতীয় কবিতায় বিচিত্রতা ও গভীরতার অভাব সহজেই চোখে পড়ে। জটিল মানসিকতার কোন প্রতিফলনই এদের মধ্যে হবার নয়। রূপ রচনাগত কোন মার্জিত নৈপুণ্যও এদের বিশিষ্ট করে তোলেনি। তবে সাহিত্যের রাজ্যে কোন্ অধিকারে এদের স্থায়িত্বের দাবি ? একি কেবল বস্তুর হুবহু বর্ণনা ? একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এর বস্তু উপকরণে স্বাদের যে সম্ভাবনা, কবিরা যেখানে তাকে প্রকাশ করেছেন, আবৃত করেননি, সেখানে তা কাব্যসার্থকতা পেয়েছে। সর্বোপরি ঘনরামদাস, যাদবেন্দ্র বা বলরামদাসের কবিতায় এমন একটা বর্ণের প্রলেপ আছে বর্ণশাস্ত্রে যার পরিচয় নেই। কবিরা যশোদার বাৎসল্যকে আপনার হৃদয়ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে সেখান থেকেই এই রঙটি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের কবিতার সর্ব দেহে। এই রঙকে সবুজ বলে উল্লেখ করা চলে না কারণ উষার পূর্বদিগন্তের রক্তিমাভাও দাবিদার হতে পারে। এ-হল কোমলতার রঙ। শরতের রোদে যে কাঁচা সোনা, শিশু শুকের পালকের যে বিচ্ছুরণ, বর্ষার অবসানে ধানের শিসে যে পীতাভ সবুজ তার মধ্যে এর সন্ধান মিলবে।

বাৎসল্য রসের দ্বিতীয় ধারা গোষ্ঠমূলক। কৃষ্ণের গোষ্ঠ গমনকে উপলক্ষ করে জননী যশোদার অকারণ আশঙ্কা ও অবুঝ স্বার্থপরতার মধ্যেই এর রসাবেদন। যুক্তির পথ আর প্রীতির পথ বিভিন্ন। বিশেষ করে মায়ের স্নেহ অবুঝ বলেই যেন কূলহীন। বলরামদাসের কবিতায় যশোদা বলছে :

সখাগণ আগেপাছে / গোপাল করিয়া মাঝে / ধীরে ধীরে করিহ গমন। / নব তৃণাঙ্কুর আগে / রাঙা পায় যদি লাগে / প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥

এর মধ্যে কিছু অসামাজিক সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা আছে। কিন্তু সামাজিকতার মাপকাঠি ও হৃদয় পরিমাপের মান আদৌ এক নয়।

গোষ্ঠ বর্ণনামূলক কবিতাগুলিতে মায়ের যে চিন্তা যে ক্রন্দন প্রকাশিত হয়েছে তাকে বাড়াবাড়ি বলে অনেকেই মনে করেছেন। গোধন চরানো এমন দুষ্কর তপস্যা নয়, চিরন্তন নির্বাসনও নয় যার জন্য মায়ের এতখানি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু নিরাসক্ত বোদ্ধার দৃষ্টি ও বিচার এ কবিতায় প্রত্যাশিত নয়, এখানে যে মা সে বাঙালি জাতির অতি সামান্যা রমণী। মধ্যযুগের জীবন পরিবেশে সন্তানের প্রতি স্নেহই তার মানসরাজ্যের একমাত্র বন্ধনমুক্তির বাতায়ন। কিন্তু আপন অনুভূতি ও বোধের সঙ্কীর্ণতায় এই বাতায়নের ফ্রেমে অনন্ত নীলাকাশও যেন একটি খণ্ডে পরিণত হয়। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় তার চিত্ত সর্বদা সন্ত্রস্ত। তার চরিত্রে বিপুলের মাহাত্ম্য নেই। মহাভারতের বিদুলার মতো প্রবলের মুখোমুখি হয়ে ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে ধিক্কার দিতে সন্তানকে উৎসাহিত করার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। তার চিত্তে নেই সে আতিথ্য যাতে নিখিল শিশুজগৎকে আপন আন্তরগৃহে নিমন্ত্রণ জানাতে পারে। যশোদার এই বিশিষ্ট চরিত্রটি গোষ্ঠলীলা কবিতার একটি স্থায়ী অবদান।

প্রসঙ্গত শাক্তপদাবলীর আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের গানগুলির সঙ্গে এদের তুলনা এসে পড়ে। আগমনী-বিজয়া গানে মাতা মেনকার যে বেদনা ও অশ্রুবর্ষণ বাংলার সামাজিক জীবনের বাস্তব সমস্যা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বালিকা কন্যার বিবাহই যখন সামাজিক রীতিরূপে প্রচলিত ছিল তখন বিবাহিত কন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠাতে ও দীর্ঘকাল তাকে ছেড়ে থাকতে মায়ের বিপুল বেদনায় নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। করুণ আর বাৎসল্য এই দুই তারের যুগপৎ ধ্বনি-সঙ্গীতের পট-ভূমিকায় সমাজবাস্তবতার তীব্র তীক্ষ্ণ উপস্থিতি আগমনী-বিজয়া গানের বিশেষ আস্বাদ। কেউ কেউ মাতৃহৃদয়ের এই তীব্র দুঃখের উদাহরণ দেখিয়ে গোষ্ঠলীলায় বর্ণিত যশোদার বেদনাকে বেদনা-বিলাস বলে ধিক্কার দিয়েছেন। এ-অভিযোগ স্বীকার্য নয়। কৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে যশোদার যে ক্রন্দন তা আশঙ্কাজাত, বেদনার প্রকাশ নয়। যশোদার বাৎসল্য তাই করুণরসকে আশ্রয় করেনি। এ নিজেই একটা স্বতন্ত্র স্বাদ। জীবনের বাস্তবতার উৎসে যে বেদনা তারই সাহিত্যিক সৌন্দর্য আছে, মায়ের মনের অবুঝ আকুতির তা নেই এমন মত যুক্তিসহ নয়।

৪. ৪. বিদ্যাপতি : অভিজাত বৈদগ্ধ ও শিল্পনৈপুণ্য

এক

বাঙালি কবিসমাজে বিদ্যাপতির প্রবেশের প্রধান দ্বারোন্মোচনের কৃতিত্ব বৈষ্ণব সাধককবি ও কীর্তনীয়াদের। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার রূপ ও ভাবের সঙ্গে তাঁর মৌল পার্থক্য; তাঁর ভাষার সঙ্গে বাংলার বিস্তৃত দূরত্ব সত্ত্বেও অনুসরণে আস্বাদনে ও রসসঙ্কীর্তনে তিনি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালি কবিরা তাঁর নামটি পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাষার অনুসরণ ব্রজবুলির রূপকল্পনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সাধককবি বা মহাজন বলে তিনি উত্তরসূরির শ্রদ্ধা পেয়েছেন। সহজ সাধনার প্রেমিক পুরুষ বলে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ তাঁর নামে কিংবদন্তি রচনা করেছেন। বাংলা কাব্যের আলোচনায় তাঁর স্থান তাই অবশ্যস্বীকার্য।

জয়দেবের সঙ্গে এ ব্যাপারে বিদ্যাপতির তুলনা চলে না। জয়দেব বাঙালি কবি।

বাংলার ভাবরসের এমন একটা স্পষ্ট চিহ্ন তাঁর সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাব্যের সারা দেহে মুদ্রিত যে ইতিহাসের ধারায় তাঁর স্থানটি অবিচলিত হয়ে পড়েছে। সমসাময়িক বাংলা ভাষা যথেষ্ট পুষ্ট ও সভাশোভন হলে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হয়ত বাংলাতেই লেখা হত। এবং সংস্কৃতে লেখা হলেও বাংলা ভাষার সঙ্গে তা কচিৎ আত্মীয়তা করেছে। বিদ্যাপতি কিন্তু বাঙালি কবি নন, বাংলা ভাষায়ও কাব্য-কবিতা তিনি লেখেননি। কাজেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান সম্পর্কে সংশয় কিছুতেই ঘুচতে চায় না। বাংলা সাহিত্যের একজন সেকালীন ঐতিহাসিক এবং অনেক একালীন রস-ব্যাখ্যাতার মন্তব্যের সাহায্যে এই সংস্কার গ্রন্থিভেদের চেষ্টা করা যেতে পারে। রামগতি ন্যায়রত্ন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাপতির সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলছেন, : 'বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আমরা বাঙলার প্রাচীন কবিশ্রেণীভুক্ত বলিয়া দাবী করিতে ছাড়িব না ; যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশে এখনকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে অনেক মৈথিল ছাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতেন এবং এতদ্দেশীয় অনেক ছাত্র মিথিলায় যাইয়া পাঠ সমাপন করিয়া আসিতেন।...অনেকের মতে বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্ন রাজ্য ছিল, এবং সম্ভবতঃ উভয় দেশের ভাষাও অনেকাংশে একবিধ ছিল ;...' ।—[বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব]। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে উভয় দেশের ভাষা একরূপ ছিল না। বাংলা ও মৈথিলি উভয় ভাষারই যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে। তবে সাধারণ ভাষারূপে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের ব্যবহার বিলুপ্ত হয়নি। 'কীর্তিলতা', 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'-র রচনা তার প্রমাণ।[১] তবে উভয় দেশের ভাষা যে এক ছিল না একথা নিশ্চিত। উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার জন্য মাত্র বিদ্যাপতিকে বাংলা কাব্যসভার অন্যতম বলে দাবি করা যায় না। এই যুক্তিতে প্রায়-সমসাময়িক উমাপতি ওঝার 'পারিজাতহরণে'র গানগুলিও বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে ; জ্যোতিরীশ্বরও বাদ যান না। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি এবং বিদ্যাপতিই বা কি ঐতিহাসিক কারণে বাংলার একজন হয়ে উঠলেন বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ায়ই সেকথা বলছি।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "মনে রাখিতে হইবে যে তদানীন্তন মিথিলা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙলার সারস্বততীর্থ ছিল এবং স্বভাবতঃই তাহার উপর মৈথিলভাষার একটা আকর্ষণ ছিল। মিথিলাতেই ব্রজবুলির ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হইয়াছিল—বিদ্যাপতি-উমাপতি স্বয়ং একাজ করিয়াছিলেন। শেষ মিথিলায় বৈষ্ণব ভাবধারা বর্ষিত হইয়াছিল বাঙলারই 'মেঘৈর্মেদুরম্বরম্' হইতে। সেই ধারা-পানে যে কয়টি চাতক আনন্দে গাহিয়া উঠিয়াছিল, উমাপতি-বিদ্যাপতি তাহাদের মধ্যে

---

[১] 'নবম শতক হইতে প্রায় পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভ অবধি পশ্চিমে গুজরাট হইতে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র আর্যাবর্তে অপভ্রংশ ও তাহার অর্বাচীনরূপ অবহট্‌ট বা 'অপভ্রষ্ট' প্রচলিত ছিল সাহিত্যের বাহনরূপে, সংস্কৃতের হীন দোসরভাবে।' সুকুমার সেন : 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস।'

প্রাচীনতম। সাধারণ মিথিলাবাসী যে সে-গানে মুগ্ধ হইবে না এবং বাঙালীই তাহা কান পাতিয়া শুনিবে, একথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই পদাবলী-রচনায় তাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছিলেন সরলতর ভাষা।...বিদ্যাপতির 'হরগৌরী' পদাবলীর কঠিন ও দুর্বোধ্য মৈথিল দেখিয়া মনে হয় এ পদ-রচনায় মিথিলার বাহিরে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, যেমন ছিল বৈষ্ণবপদ-রচনায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিদ্যাপতির প্রতি মিথিলাবাসীর উপেক্ষা লক্ষণীয়" ।—[বৈষ্ণব পদাবলীয় [ক. বি প্রকাশিত] ভূমিকা]। লেখক এখানে যে কারণের ইঙ্গিত করেছেন তা গূঢ়তর বলে মনে হয়।[১]

বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা ও ভাব বাঙালি চিত্তের নিকটবর্তী। এ ভাষা লোকের মুখে মুখে পরিবর্তিত মৈথিলি মাত্র নয়, তা হলে কবিতাগুলির রূপমাজনা এভাবে রক্ষিত হত না। বিদ্যাপতিই এই মিশ্রভাষায় লিখেছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিদ্যাপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। মিথিলার রুচিবান বিদগ্ধ শ্রেণীর মতো পার্শ্ববর্তী গৌড়-বাংলার রসিক, শিক্ষিত ও মার্জিত-বুদ্ধি সমাজও তাঁর লক্ষ্য ছিল। বাঙালি রসিকসমাজ তাঁকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন—বলা যায়, আত্মসাৎ করেছিলেন। অপরপক্ষে জ্যোতিরীশ্বরের সঙ্গে বাঙলাদেশের প্রায় কোন সম্পর্কই স্থাপিত হয়নি। অনুরূপ ভাষায় কবিতা লিখলেও এদেশে বিদ্যাপতির সমকক্ষ স্থান উমাপতির হয়নি; কারণ—তাঁর কৃষ্ণ ঐশ্বর্যপ্রধান, তাঁর কবিতার বিষয় দ্বারকালীলা, সে প্রেম স্বকীয়ারসের, তাই বিচিত্রতাহীন। বিশেষত তাঁর পদগুলি একটি সংস্কৃত কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতাগুলির উপরে তাই বাঙালি পাঠকের দাবি ন্যায্য বলেই মেনে নিতে হয়।

দুই

বাংলাদেশের বৈষ্ণবদের কাছে মহাজনরূপেই তাঁর স্বীকৃতি। কীর্তনে তাঁর পদ শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়। কিন্তু বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি স্মার্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। "তিনি মিথিলা, বাঙলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন, অর্থাৎ স্মৃতির বিধান মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন।'—[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : কীর্তিলতার ভূমিকা।]

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে এই তথ্যটুকু গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যাপতির কাব্যপ্রেরণার উৎসে যে বৈষ্ণব ভাবনা আদৌ সক্রিয় ছিল না তা-ই আমাদের প্রতিপাদ্য। বিদ্যাপতির রচনাবলীর বিচিত্রতার দিকে তাকালে এ প্রত্যয়টি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিচিত্র বিষয়ের দিকে তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে এবং নানা বিষয়ে গ্রন্থরচনায় তিনি, সেকালের পক্ষে তো বটেই এ যুগের দৃষ্টিতেও,

---

১ বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা এবং বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলি বিষয়ে পণ্ডিত সমাজের নানা মতবাদ এবং বিতর্ক প্রচলিত আছে।

বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী'র মতো স্মৃতিগ্রন্থ, 'বর্ষক্রিয়া' 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র মতো পূজা ও সাধন-পদ্ধতির সংকলন, 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা'র মতো ইতিহাসগ্রন্থ, 'ভূপরিক্রম' নামে ভৌগোলিক তীর্থপরিচয়, 'লিখনাবলী' নামে অলঙ্কারশাস্ত্র, 'পুরুষপরীক্ষা'র মতো গদ্যগ্রন্থ এবং হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক 'পদাবলী' রচনা করেন।

এই তালিকাটি থেকে দুটি জিনিষ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। [১] বৈষ্ণব বিষয় বিদ্যাপতির সমগ্র সৃষ্টির একটি অংশ মাত্র। [২] বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য ছিল বহু-বিস্তৃত। স্মৃতি থেকে পূজাপদ্ধতি, অলঙ্কারশাস্ত্র থেকে ইতিহাস কিংবা ভূপরিচয় তাঁর জ্ঞানরাজ্যের সীমাভুক্তই কেবল ছিল না তাকে ভাষারূপ দেবার মতো বিস্ময়করক্ষমতারও তিনি অধিকারী ছিলেন। একদিকে পদাবলীর মতো সৌন্দর্য-মূল রচনা অন্যদিকে এই সব বিচিত্রবিষয়ক জ্ঞানকাণ্ডের অনুবৃত্তি একই ব্যক্তিদ্বারা পাশাপাশি চলেছে।

বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্যের অন্যতর প্রমাণ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর আশ্চর্য দক্ষতায়। তিনি স্মৃতি ও ধর্মপদ্ধতির গ্রন্থগুলি লিখেছেন সংস্কৃতে, 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা' অবহট্‌ঠে, পদাবলীর কিছু অংশ মৈথিলীতে এবং অধিকাংশ 'পদ' বাংলা-মৈথিল-অবহট্‌ঠ-মিশ্রিত এক নূতন 'সাহিত্যিক' ভাষায়; পরবর্তীকালে ব্রজবুলি নামে এই ভাষারই প্রচলন হয়।

বিদ্যাপতির অবৈষ্ণব মানস এবং পাণ্ডিত্যপুষ্ট জ্ঞানানুসন্ধিৎসু চিত্ত তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য-স্বরূপের বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক যে অজস্র পদ রচনা করেছিলেন তার পিছনে কবির মনোরাজ্যের কোন্ প্রেরণা সক্রিয়? দেখা গিয়েছে যে বৈষ্ণবতা এর কারণ নয়, পাণ্ডিত্যও যে নয় তা নিশ্চিত। পাণ্ডিত্য বিদ্যাপতির অন্তরের সাহিত্যচেতনাকে বিনষ্ট করতে পারেনি, বিশিষ্ট করে তুলেছিল। অতি সচেতন শিল্পপ্রবুদ্ধ চিত্তের অধিকারী ছিলেন বিদ্যাপতি। তাই খাঁটি রসকাব্য রচনার বেলায় তিনি হরগৌরী অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্পর্ককেই অবলম্বন করেছেন। হরগৌরীর দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যে প্রেমলীলার বিশেষ স্ফূর্তি তিনি লক্ষ্য করেননি, রাধাকৃষ্ণের মুক্ত প্রেমের লীলাবিচিত্র মাধুর্যকেই তিনি উপকরণ হিসেবে সবচেয়ে যোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন। উমাপতির 'পারিজাতহরণ'-এর স্বকীয়া প্রেমের আদর্শকে গ্রহণ না করে বহু পূর্ববর্তী জয়দেবের বিষয়ানুগত্য কবির সচেতন শিল্পজিজ্ঞাসারই অন্যতম প্রমাণ।

তিন

বিদ্যাপতি পণ্ডিত ছিলেন। বিচিত্র জ্ঞান এবং রসশাস্ত্র তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। রস-শাস্ত্রের প্রভাবেই কি তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য পদাবলীর সৌন্দর্যাবেদনকে স্থূল বস্তুভারে গতিহীন করতে পারেনি? তাঁর পাণ্ডিত্য ভারে পরিণত না হয়ে ধারে পরিণত হল

কি করে? রসশাস্ত্রের প্রভাব এ বিষয়ে হয়ত নগণ্য নয়, কিন্তু প্রধানতম প্রভাব রাজসভার পরিবেশের। দীর্ঘজীবী কবি জীবনের এক সুদীর্ঘকাল রাজসভার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বদ্ধ ছিলেন। কেবল তাই-ই নয়, কয়েক পুরুষ ধরে তাঁদের বংশ মিথিলার রাজপরিবারের সঙ্গে অমাত্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। কাজেই বাইরের পরিবেশের প্রভাবজাত নয়, রাজসভাসুলভ বিশেষ মানস তাঁর অন্তরেরই সামগ্রী। প্রচলিত জ্ঞান কর্মের চর্চা, রসের আলোচনা, রাজসভার পরিবেশ—সব মিলে সেকালের নাগর বৈদগ্ধ তথা সভ্যতার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন বিদ্যাপতি। এবং তাঁর কাব্য-শিল্পের অনেক প্রশংসার ভিত্তি এখানেই মিলবে।[১]

এই নাগর সভ্যতার বাস্তব স্বরূপটি কি দেখা যাক। প্রমথ চৌধুরী 'বই পড়া' নামক প্রবন্ধে এর যে বর্ণনা দিয়েছেন একটু দীর্ঘ হলেও তা কৌতূহলোদ্দীপক এবং আমার ধারণা বিদ্যাপতিকে বুঝবার পক্ষে অপরিহার্য। "আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—'বাহিরের বাসগৃহেও অতি শুভ্র চাদর পাতা শয্যা একটি থাকিবে, এবং তাহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাহার শিরোভাগে কূর্চস্থান ও বেদিকা স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর রাত্রিশেষে অনুলেপন, মাল্য, সিক্থকরণ্ডক, সৌগন্ধিকপুটিকা, মাতুলুঙ্গত্বক্, তাম্বুল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতৎগ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগদন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক। বর্তিকা-সমুদ্গকঃ। এবং যে কোনো পুস্তকও—উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।....প্রতিশয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্যঙ্ক...শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কূর্চ; আত্মবান নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়ন গ্রহণ করতেন না; সুতরাং কূর্চ হচ্ছে একপ্রকার ব্রাকেট। সেকালের এই বিলাসী সম্প্রদায়, আমরা যাকে বলি নীতি, তার ধার এক কড়াও ধারতেন না; কিন্তু দেবতার ধার যোলো আনা ধারতেন।...বেদিকাতে যত প্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল; এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ-অনুমান ভুল নয়, তিনি বলেন, বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কুত্তকুট্টিম অর্থাৎ inlaid। অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য অবশ্য ফুলের মালা...। সিক্থকরণ্ডক হচ্ছে মোমের কৌটা; সেকালের নাগরিকেরা ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিশ করে নিয়ে তারপর তাতে আলতা মাখতেন। সৌগন্ধিকপুটিকা হচ্ছে ইংরেজীতে যাকে বলে পাউডার-বক্স; বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেঝের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ অর্থাৎ পিকদানি। তার পর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তিসংলগ্ন হস্তিদন্তে

১ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের কথা' দ্রষ্টব্য।

বিলম্বিত বীণা, টীকাকার বলেন, সে বীণা আবার 'নিচোলঅবগুণ্ঠিতা',...তার পর পাই চিত্রফলক; সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্তিকাসমুদ্গকের অর্থ তুলি ও রং রাখবার বাক্স। তার পর বই"। পরে টীকায় বলা হচ্ছে যে বই বলতে কোন সমসাময়িক কাব্যকেই বোঝানো হচ্ছে।

প্রাচীন হিন্দু আমলের নাগর বিলাসীদের এই জীবন-চর্চায় বিদ্যাপতির যুগে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীন হিন্দু রাজার রাজ্যে এই জীবনধারার মোটামুটি অনুসরণ আলোচ্য শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। বাস্তব জীবনে বিদ্যাপতি কি ছিলেন, তাঁর দেহরূপে ও প্রসাধনে এই বিলাসকলার অনুবর্তন ছিল কিনা নিশ্চয় করে বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই, তবে পদাবলীর পাঠকের কাছে বিদ্যাপতির যে অন্তর-রূপ ধরা পড়ে তার সঙ্গে এই শ্রেণীর সামীপ্য কল্পনা করে নেওয়া চলে। আর চারপাশে যাদের উপস্থিতি, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, রুচি ও রসবোধ তাঁর মানসলোকের উপাদান তাদের অনেকখানি মূর্তি যে ওর মধ্যে ধরা পড়ে এমন মনে করা যেতে পারে। কাজেই তৎকালীন মৈথিল নাগরিকদের বাহিরের গৃহের সজ্জার উপকরণ হিসেবে বিদ্যাপতির পদাবলী কাব্যগ্রন্থের যে স্থান হতে পারত এমন কল্পনা অনৈতিহাসিক নয়, অবাস্তবও নয়। এরাই দেশের সভ্যসমাজ—cultured শ্রেণী। কবি মনে-প্রাণে এই শ্রেণীভুক্ত, এদের উদ্দেশ্যেই তাঁর কাব্যের অর্ঘ্য। বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য ও বিস্তৃত অধ্যয়ন তাঁকে শুষ্ক তথ্যসঞ্চয়নকারীতে, উদাসীন গ্রন্থকীটে পরিণত করেনি। তা হলে পদাবলীর অজস্র কবিতায় তাঁর রসোজ্জ্বল চিত্তবৃত্তির পরিচয় এভাবে মুদ্রিত হতে পারত না। স্মার্ত পৌরাণিক বিষয় নিয়ে এবং পূজাপদ্ধতি সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ রচনা করলেও তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এমন মনে হয় না। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রে অনেক পার্থক্য। কূর্চস্থানে রক্ষিত ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণামে অতি বিলাসী লোকেরও বাধা ছিল না, কারণ এর সঙ্গে নীতিবোধ ছিল সম্পূর্ণ সম্পর্ক-রহিত।

প্রার্থনা বিষয়ে বিদ্যাপতির কয়েকটি কবিতা আছে। তার সাহায্যে কবির অন্তর্মনের পূর্বোক্ত ধারণাটিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। এই কবিতাগুলিতে তিনি মাধবকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা জানিয়েছেন। এই ব্যাপার কবির ধর্মজিজ্ঞাসার উপরে কতখানি আলোকসম্পাত করে তা বর্তমানে বিবেচ্য নয়। কবির অন্তর্গূঢ় কবি-ব্যক্তিত্বের কিছু পরিচয় এর মাধ্যমে পাওয়া যায় বলে আমার বিশ্বাস। এই কবিতাগুলি কবির বৃদ্ধবয়সের রচনা—কয়েকজন সমালোচকের এরূপ ধারণা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। বিদ্যাপতি সম্পর্কে যাঁরা বিস্তৃত গবেষণা করেছেন তাঁরা অনেকেই এ বিষয়ে একমত। আর আলোচ্য কবিতাগুলির আভ্যন্তরীণ প্রমাণও ঐ সিদ্ধান্তেরই পক্ষে। বার্ধক্যে স্মৃতির আত্মগ্লানি, যৌবনের ভোগপঙ্কিল জীবন সম্পর্কে মৃত্যুপথযাত্রীর বেশ তীব্র বিশ্লেষণ এই কবিতাগুলিতে প্রকাশিত।

১. তাতল সৈকতে / বারিবিন্দু সম / সুত-মিত-রমণী-সমাজে। / তোহে বিসরি মন / তাহে সমর্পল / অব মঝু হব কোন কাজে॥

২. নিধুবনে রমণী- / রসরঙ্গে মাতল / তোহে ভজব কোন বেলা॥

৩. যাবত জনম হম / তুয়া পদ ন সেবলুঁ / যুবতী মতি মঞে মেলি। / অমৃত তেজি কিয়ে / হলাহল পিয়লুঁ / সম্পদ বিপদহি ভেলি॥

আলোচ্য কবিতাগুলিতে বিদ্যাপতির যে ভক্তসত্তা প্রকাশিত তার স্বরূপ নির্ণয় আমার উদ্দেশ্য নয়। এর মধ্যে যৌবনের দিনগুলির যে স্মৃতির দাহন আছে তাই-ই লক্ষণীয় বলে মনে করি। এখানে সাধারণভাবে সংসারজীবনের নিন্দামাত্র নেই। বিশেষ করে যৌবন-জীবনের একটি বিশেষ দিকের প্রতি কবি বার বার আত্ম গ্লানির দৃষ্টিতে ফিরে তাকাচ্ছেন এবং শিহরিত হচ্ছেন, এটি আকস্মিক নয়, কবির অতীত জীবন ও মননের সত্যকার পরিচয়বাহী।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন নাগর সংস্কৃতির প্রতিভূ হলেও বিদ্যাপতি কবি ছিলেন, স্রষ্টা ছিলেন। কবি-শিল্পীর চিত্তের গভীরে একটা নিস্পৃহতার সুর থাকেই। বস্তুজীবন থেকে কিছু [খুব কম হলেও] দূরত্ব না ঘটলে সৃষ্টি সম্ভব নয়। বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে এই দূরত্বের বীজটুকু ধীর ক্রমবিকাশের পথে বিরাট বিপুল হয়ে কবির পরিণত বয়সের প্রেম-চেতনা ও কাব্য-নির্মাণে গভীর পরিবর্তন এনেছে এরূপ আমি মনে করি না। তবে জীবনের হিসাব চোকানোর পালা যখন এল তখন সেই বীজাকার দূরত্ব মৃত্যুলোকের ছায়াপাতে বড় বেশি প্রশস্ত হয়ে দেখা দিল। তারই প্রতিফলন ঘটেছে প্রার্থনা বিষয়ক কবিতাগুলিতে।

বিদ্যাপতির কবি-ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করা হল তারই প্রকাশ কবির কাব্যে—তাঁর মননশীলতায়, বক্রকটাক্ষে, মার্জিত বাচনভঙ্গিতে, আলঙ্কারিতায় ও অতি সচেতন রূপনির্মিতিতে ; তাঁর সৌন্দর্যচেতনায়, ইন্দ্রিয়প্রধান দেহভাবনায় এবং উপলব্ধির ব্যাপক ঐশ্বর্যে। অপরদিকে কোথাও কোথাও সাংসারিক লাভ-ক্ষতির টানাটানিকে প্রেমরাজ্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করার পিছনে কবির বস্তুজগতে যানসভ্রমণের প্রবণতা সক্রিয়।

প্রথমেই রাধার বয়ঃসন্ধি। কৈশোর ও যৌবনের এই সম্মিলনকে কবিতার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করায় বিদ্যাপতির মৌল উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় আছে। বয়ঃসন্ধির কবিতায় দেহ ও মন—এই উভয় রাজ্যকেই স্পর্শ করেছেন কবি।

১. পহিলে বদরি কুচ, পুন নবরঙ্গ। / দিনে দিনে বাড়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ॥

২. শৈশব যৌবন দরশন ভেল / দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥···/ চরণ-চপল-গতি লোচন পাব। / লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥

৩. খনে খন নয়ন কোন অনুসরই। / খনে খন বসন-ধূলি তনু ভরই॥ / খনে খন দশনক ছটাছট হাস। / খনে খন অধর আগে করু বাস॥···/ হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর। / খনে আঁচর দেই খনে হয় ভোর॥

প্রথম কবিতায় যৌবনের প্রকট দেহলক্ষণ বিবৃত। কয়েকটি তুলনাত্মক অলঙ্কারে কবি তাকে আবৃত করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় উদাহরণে কিন্তু দেহভঙ্গির পরিবর্তন বর্ণনায় বুদ্ধিমার্জিত বিস্ময় রসের সঞ্চারে সার্থক হয়েছেন কবি। তৃতীয় উদাহরণে দেহপরিবর্তনে মনে যে নব যৌবন-চেতনার উন্মেষ হয়েছে তাকেই কবি রূপায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এর রসসৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করা চলে,—'যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহস্যপরিপূর্ণ। সদ্যবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।'—[বিদ্যাপতির রাধিকা : আধুনিক সাহিত্য] শেষের পদটিতে কবি নবীন যৌবনার মনস্তত্ত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র চিত্রে তাকে ধরে রেখেছেন। বয়ঃসন্ধির এই অভিনব রূপে কবিদৃষ্টিতে বিস্ময় এবং কৌতুক যুগপৎ প্রকাশিত হয়ে স্বাদবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

বিদ্যাপতির পূর্বরাগ বিষয়ক কবিতাগুলিও বিশিষ্ট এবং আলোচনার যোগ্য। কবি বয়ঃসন্ধিতে যেন পূর্বরাগের পূর্বাভাস রচনা করেছেন। দেহধর্মে যা বয়ঃসন্ধি, প্রেমে তাই পূর্বরাগ। পূবরাগে প্রেমের সূত্রপাত। আর কৈশোর-যৌবনের সীমারেখা হৃদয়ানুভূতির দিক থেকে প্রেমোপলব্ধিতে। প্রেমই মানুষকে কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়ে যৌবনের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেয়। পূর্বরাগে বিদ্যাপতির রাধায় লীলাচাতুর্যের সঞ্চার হয়েছে, বয়সের নবীনতা ঘোচেনি। প্রথম তারুণ্যের লাবণ্যদীপ্তি 'কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক-অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর' হওয়ার মধ্যে আপনাকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছে। স্নান করে ফিরবার পথে কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধার গলার হার ছিঁড়ে ফেলা এবং সহগামিনীরা যখন হারের মুক্তাগুলি সঞ্চয়ে ব্যস্ত তখন কৃষ্ণকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ :

> তঁহি পুন মোতি হার তোড়ি ফেকল। কহত হার টুটি গেল। / সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু / শ্যাম-দরশ ধনি লেল॥

এ জাতীয় ভাবানুভূতির প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা। এর চাতুর্যটুকু মধুর এবং অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু :

> অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ / বারল লোচন-চোর। / পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল / জনি সে চাঁদ চকোর॥ ততহুঁ সঞো হঠে হটি মোঞে আনল / ধএল চরণ রাখি। / মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ / তইঅও পসারএ আঁখি॥

রাধার মানস বিবর্তনের এবং নবতর বৈদগ্ধ্যের স্তরে সংস্থিতির পরিচয় বহন করে। এই বক্র বাচনভঙ্গি ও চাতুর্য পূর্ববর্তী কবিতা থেকে স্বরূপত ভিন্ন।

আসলে বিদ্যাপতির রাধার দুই রূপ। বয়ঃসন্ধির তারুণ্য পূর্বরাগের কোন কোন কবিতায় সমান প্রকট, যেমন প্রথমটিতে। পূর্বরাগের পরেই যে সংক্ষিপ্ত মিলনের বর্ণনা

করেছেন কবি সেখানেও রাধিকার মন কিছু ভীতিবিহ্বল, কিছু ব্রীড়া-কুণ্ঠিত। কৃষ্ণের আহ্বানে দেহধর্ম সম্পর্কে অর্ধচেতন বালিকার আর্তনাদ এ কবিতাগুলিতে শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল।' এ রাধা,

বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান। / ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান ॥

কিন্তু রাধার এই রূপ পরবর্তী কবিতায় আর দেখা যায় না। নবীনতা এবং মাধুর্য সর্বত্র লক্ষণীয়, কিন্তু এই বালিকাস্বভাব, এই সারল্যের এখানেই সীমা।

বিদ্যাপতির রাধার দ্বিতীয় রূপটি বিদগ্ধা রসবতী নারীর, যার বচনে চাতুরি, আঁখিতে কটাক্ষ, ভূষণে বিদ্যুৎ-ছটা, শিঞ্জিনীতে আহ্বান। কি করে রাধা চরিত্রে এই পরিবর্তন এল তা বিদ্যাপতি দেখাননি। দেখাবার দায়িত্বও তাঁর নেই। কারণ কাহিনী-কাব্যের চরিত্র বিবর্তন তাঁর লক্ষ্য নয়।

কিশোরী রাধিকায় বিদ্যাপতির রহস্যসন্ধানী রূপসম্ভোগ-বৃত্তির রূপনির্মিতি চলেছে। তার দেহে এবং মনে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সত্য অনেকখানি প্রতিফলিত। বিশেষ সমাজের বিশেষ পরিবেশ ও শিক্ষা নয়, স্বাভাবিক দৈহিক পরিবর্তন এবং তার মানস প্রতিক্রিয়াই এখানে চিত্রিত। যুবতী রাধিকা স্বভাবের নয়, সমাজের ফল—বিশেষ শ্রেণীসভ্যতার নারী-প্রতিভূ। সেই নাগর-বিলাসের, মার্জিত রুচিবৈদগ্ধের এবং প্রগলভ বাক্‌চাতুর্যমূলক জীবনচর্চার কিছু পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে। রাধার প্রেমলীলায় তার প্রতিফলন কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কতটা সার্থক এবারে তার বিচার করা যাক।

পূর্বেই 'অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ' কবিতার উল্লেখ করেছি। কৃষ্ণ প্রেমে রাধার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাকুলতা এই কবিতার বিষয়। অনুরূপ বিষয় নিয়ে চণ্ডীদাসের কবিতা আছে—'যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।' কিন্তু প্রকাশের বুদ্ধিদৃপ্ত তির্যক ভঙ্গি বিদ্যাপতির রাধার চিত্তের যে প্রগল্‌ভ নাগরী রূপ প্রকট করে, চণ্ডীদাসের তরল সরল ভাষার আন্তরিকতা তা থেকে বহু দূরে, উপলব্ধির অন্যকোটিতে আমাদের নিয়ে যায়।

অপর একটি পদে প্রণয়াসক্তা রাধা কামদেবকে ছদ্ম অনুরোধ জানাচ্ছে কুসুম শায়কে তার চিত্তকে বিদ্ধ না করতে :

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি। / হাম নহ শঙ্কর হুঁ বরনারী ॥ / নাহি জটা ইহ বেণী-বিভঙ্গ। / মালতী-মাল শিরে নহ গঙ্গ ॥ / মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু। / ভালে নয়ন নহ সিন্দুর-বিন্দু ॥ / কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ-সার ॥ / নহ ফণি-রাজ উরে মণিহার ॥ / নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল। / কেলি-কমল ইহ না হয় কপাল ॥ / বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ। / অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক ॥

মাত্র বাক্‌চাতুর্যে একটা বিপরীতের তুলনাত্মক বৈসাদৃশ্য এখানে আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। প্রগল্‌ভ বাচন কৌশলটুকু এবং ভাবনা-ভঙ্গির বক্রতা বাদ দিলে এর মধ্যে হৃদয়ানুভূতির

আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ বিরহের পরে মিলনের আনন্দে রাধার উক্তির উল্লেখ করব :

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে। / মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥ / বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে। / ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥ / আলিপনা দেওব মোতিম হার। / মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥ / কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব। / আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণি সুঝম্প॥

এই কবিতায় অনেকে 'The human body is the highest temple of God'—এই উক্তির সার্থকতা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আমার মতে নাগরিকা বিলাসিনী নারীর নির্লজ্জ ও উল্লসিত দেহকামনাই অলঙ্কার আশ্রিত মার্জিত রূপ-নির্মিতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এখানে। এর মধ্যেও চাতুর্য আছে, কিন্তু এর মিলনোল্লাস দেহসীমার সঙ্কীর্ণতাকে বড় অতিক্রম করতে পারেনি। 'এ সখি রঙ্গিনী কি কহব তোয়', 'আজুক লাজ কি কহব মাই,' 'শাশ ঘুমাওত কোরে আগোর', 'এ সখি এ সখি কি কহব হাম', 'সে সব কহিতে লাজ' প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতায় 'লাজ' শব্দটির বারংবার উল্লেখ থাকলেও আসলে এগুলিতে নির্লজ্জতার সুর প্রবল। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন কৌশলে কৃষ্ণ কিভাবে রাধার সঙ্গে দৈহিক মিলনের আনন্দ উপভোগ করেছে পরম কৌতুকভরে তারই স্মৃতিমাল্য রচনা করেছে রাধিকা। কৌশলের বাহাদুরিই এখানে যেন উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

মানের অবসানে কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই উক্তিটিও বিশেষ লক্ষণীয় :

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ। / মদন সাখী করি খত লেখি দেহ॥ / ছোড়বি কেলি-কদম্ব বিলাস। / দূরে করবি নিজ গুরুজন-আশ॥ / মো বিনে স্বপনে না হেরবি আন। /হামার বচনে করবি জল পান॥ / রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর। / আন যুবতী কোই না করবি কোর॥

চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের রাধায় এ জাতীয় উক্তির কথা কল্পনা করা যায় না। এমনকি 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'-এর সঙ্গেও এর সুরের ঐক্য নেই। এ নায়িকা স্বাধীনা, ব্যক্তিত্বময়ী; ব্যঙ্গে রসনা তার বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ, কৌতুকে রসোজ্জ্বল।

চার

বিদ্যাপতির কৃষ্ণ এবং রাধা [পরিণত রূপের] একই রাজ্যের অধিবাসী—একই জীবনচর্যার, রুচি ও কলাবিলাসের একই—ভাব-রাজ্যের। একই প্রেম তথা জীবন-জিজ্ঞাসার অতি অভিজাত রক্তিম সুরা স্বভাবের ভিন্ন পাত্রে পরিবেশিত। কৃষ্ণের রূপজিজ্ঞাসা রাধায় নেই। দেহ-ভাবনার সঙ্গে অতি তীক্ষ্ণ তীব্র রূপচেতনা কৃষ্ণের দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস এ দৃষ্টি স্বয়ং কবি বিদ্যাপতির।

কয়েকটি চিত্রাঙ্কনের উদাহরণে এই রূপচেতনা ও রূপ-সম্ভোগের পরিচয় নেওয়া যাক :

১. কুচ-যুগ চারু চকেবা।
২. চিকুরে গলয়ে জলধারা। / মেহ বরিখে জনু মোতিম-হারা॥
৩. যব গোধূলি সময় বেলি। / ধনি মন্দির-বাহির ভেলি / নব জলধরে / বিজুরী-রেহা / দ্বন্দ্ব পসারিয় গেলি॥
৪. চরণে যাবক / হৃদয়-পাবক / দহই সব সঙ্গ মোর॥
৫. মেঘ মালা সঞে / তড়িত-লতা জনু / হৃদয়ে শেল দেই গেল॥

এই চিত্রকয়টির সাহায্যেই কৃষ্ণের রূপতৃষ্ণা তথা কবির রূপাঙ্কন ক্ষমতার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। বিশ্বের সুন্দরতম বস্তুগুলির প্রতি কবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। প্রাচীন অলঙ্করণ পদ্ধতির বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করলেও স্বরূপে সুন্দর নয় এমন বস্তুকে কবি বড গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয়ত, চিত্রগুলির সঙ্গে আপন কামনার রঙটিকেও কবি চেষ্টাহীন সাবলীলতায়ই যেন যুক্ত করেছেন। প্রথম উদাহরণে যুগ্ম চক্রবাক পক্ষীর সঙ্গে কুচযুগল উপমিত হয়েছে। এই তুলনা বস্তু সঞ্চয়ে কিছু অসাধারণ, কিন্তু অপূর্ব সুন্দর। এ সৌন্দর্য বস্তুর অভিনবত্বে কেবল নয়, তার নিজের স্বরূপসৌন্দর্যে। বিশেষ করে চক্রবাকের অতি পেলব কোমলতার ভাবটিও যেন কবির ইন্দ্রিয়ালু চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েই একটি মাধুর্যের সঞ্চার করেছে এই চিত্রে। স্নানোত্থিতা রাধার কালো চুল থেকে গড়িয়ে জলের ফোঁটা পড়ছে। মেঘ থেকে মুক্তার মতো বৃষ্টিপতনের কথা মনে পড়েছে কবির। কেশের সঙ্গে মেঘের, মুক্তার সঙ্গে জলবিন্দুর তুলনাটি পুরানো। কবি পুরানো উপকরণকেই একটি নতুন সম্বন্ধে বদ্ধ করেছেন। চতুর্থ উদাহরণে কামনার রক্তরাগ এবং দহনের জ্বালা যুগপৎ ব্যঞ্জিত হয়েছে। তৃতীয় ও পঞ্চম উদাহরণে তুলনাত্মক বস্তুর ঐক্য সত্ত্বেও চিত্র-সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এসেছে কেবল উপস্থাপনের গুণে। প্রথমটিতে গোধূলির অস্পষ্ট অন্ধকারের পটভূমিতে উজ্জ্বল রাধারূপ ফুটে উঠেছে। কবি স্পষ্ট না বললেও বোঝা যায় যে নবজলধরে বিদ্যুতের যে রেখাটি তিনি আঁকতে চেয়েছেন তার গতি নয়, পটভূমির সঙ্গে বর্ণের পার্থক্যই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু পরেরটিতে গতিই মুখ্য। শিথিল-কবরী কৃষ্ণকেশের পটভূমিতে রাধার উজ্জ্বল তনুলতার দ্রুতাপসরণের ছবিকে কবি ধরে রেখেছেন, দ্রুতগতি জনিত রূপতৃষ্ণার অতৃপ্তিও এই চিত্রদেহে বর্ণের মতো বিজড়িত হয়ে আছে।

রূপসৃষ্টিতে সচেতন, রুচিবোধে মার্জিত বৈদগ্ধ এবং কিছু মননশীলতা কবির অন্তরলোকের সত্য পরিচয় বহন করে।

রাধার রূপচিত্রণে বিদ্যাপতি তথা কৃষ্ণের তীব্র সম্ভোগকামনা আছে; প্রায় প্রতি রূপবর্ণনামূলক কবিতায় স্তনসৌন্দর্যের বর্ণনায় কবি সর্বাধিক প্রবণতা দেখিয়েছেন। প্রাচীন কাব্যে নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনার সঙ্গে মিলেমিশে থাকায় কোন বিশেষ প্রত্যঙ্গের দিকে কবিপ্রাণের অধিক ঝোঁক ধরা পড়ে না। কিন্তু বিদ্যাপতির ঝোঁকটি সহজেই চোখে পড়ে।

এমনকি রাধার মানভঞ্জনের চেষ্টায় কৃষ্ণের রসিকতাও কাম-কৌতুককথায় পর্যবসিত :

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত। / তুয়া কুচ হেম-ঘট / হার ভুজঙ্গিনী / তাক উপরে ধরি হাত॥ / তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশব কোয়। / তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥ / হামার বচনে যদি নহে পরতীত। / বুঝিয়া করহ্ শাতি যে হয় উচিত॥ / ভুজ-পাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি। / পযোধর পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥ / উরু-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি। / বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥

এই নাগর বচনচাতুর্যের পশ্চাতে কামভাবনার স্পর্শ দৃষ্টি এড়ায় না। অথচ মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বিশেষত্বহীন। বাক্‌ভঙ্গির তির্যক আস্বাদ বা রূপরচনার মার্জিত সিদ্ধি কোনটিই তার মধ্যে নেই। এই তথ্যটি বিদ্যাপতির কবিসত্তার একটি বড় সংবাদ বহন করে। বিদ্যাপতি ভাব। কামবাসনার লৌকিক অভিব্যক্তি নয়—কামবাসনাজাত বিশিষ্ট রসরূপই তিনি উপভোগ করতে চেয়েছেন, ভাষাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। ভাষার প্রগল্‌ভতায়, চিত্রের বর্ণাঢ্যতায় সেই সাধনাই বিদ্যাপতির। সত্যকার দেহমিলন থেকে কবি-চেতনার এই অলৌকিক মায়ারাজ্য তাই কিছু দূরে অবস্থিত।

পাঁচ

বিরহে বিদ্যাপতির রাধা অনুভূতির কোন এক অতীন্দ্রিয় চেতনরাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। কেউ কেউ বিদ্যাপতির কাব্যে তো পরিষ্কার দুটি ভিন্ন লোকই আবিষ্কার করেছেন। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' গ্রন্থে বলেছেন, 'প্রথম স্তরে কবি যে-সুরে কাব্য রচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয় স্তরে তাহা হইতে পৃথক তাঁহার কবিভঙ্গি। অথবা এমনও বলা যায়, প্রথম স্তরে কবি-কৃতির একটি মনোভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, দ্বিতীয় স্তরে প্রাণভঙ্গি।' অনেকেই বিদ্যাপতির কবিজীবনের আলোচনায় তাঁর প্রেমদৃষ্টির এই মূল পরিবর্তনকে একটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ এই কবিতাগুলির ভাবগভীরতাকে ভক্তিপ্রাণতা বলে মনে করেছেন এবং কবির বয়োবৃদ্ধি ও সুখদুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়কে কবি-দৃষ্টির পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১]

বিদ্যাপতির মাথুরে বিরহের কতকগুলি পদে তুলনামূলক গভীরতা আছে। কিন্তু তাকে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি বা ভক্তিপ্রাণতা কোন নামেই চিহ্নিত করা যায় না। এ কবিতাগুলিতেও কবির মনোভঙ্গির প্রকাশ সহজেই চোখে পড়ে। কাজেই কবির কাব্যের দুটি পৃথক স্তর, কবির প্রেম ও জীবন-দৃষ্টির মৌল পরিবর্তন সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয় তার যথেষ্ট বস্তুভিত্তি আছে বলে মনে করি না।

বিরহের কতকগুলি কবিতায় কবির সচেতন অলঙ্কার নির্মাণ এবং বুদ্ধি-বৈদগ্ধ অতি প্রকট। প্রাণভঙ্গির গভীর আর্তি বাচনচতুরতায় এখানে আবৃত।

১. প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল / না ভেল যুগল পলাশা।

১ এই প্রসঙ্গে খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতি পদাবলীর ভূমিকা [বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত] দ্রষ্টব্য।

২ অঙ্কুর তপন- / তাপে যদি জারব / কি করব বারিদ মেহে।

৩. জো জন মন মাহ সে নহ দূর। / কমলিনী-বন্ধু হোয় জইসে সুর॥

আবার অনেক কবিতায় তীব্র মিলনকামনা, বিরহজনিত গভীর বেদনার সঙ্গে মননশীল বাক্যযোজনাও আছে; যেমন :

চীএ চন্দন উরে হার ন দেলা। / সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥

রাধার বিরহবেদনা বিশ্বব্যাপ্ত উচ্চকণ্ঠ হাহাকারে মন্দ্রিত হয়ে কতকগুলি কবিতায় রসাস্বাদের যে ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করেছে তার অপূর্ব সৌন্দর্য অনস্বীকার্য হলেও তাতে ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যবোধের স্পর্শ নেই। বিদ্যাপতির রাধার গভীর বেদনা কিন্তু অন্তরের অতলে তলিয়ে যাবার নয়, হৃদয়ের পাত্র উপচে চারপাশের জগৎ সংসার প্রকৃতিকে প্লাবিত করার মতো বিপুল। বেদনারও একটা ঐশ্বর্যের দিক আছে, সেখানে সে একা নয় বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট পটভূমির সঙ্গে তার সংযোগ :

১ শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী। / শূন ভেল দশ দিশা শূন ভেল সগরী॥

২. এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। / এ ভরা বাদর / মাহ ভাদর / শূন্য মন্দির মোর। / ঝম্পি ঘন গর- / জন্তি সন্ততি॥ / ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া। / কান্ত পাহুন। / কাম দারুণ / সঘনে খর শর হন্তিয়া॥ / কুলিশ শত শত / পাত-মোদিত / ময়ুর নাচত মাতিয়া। / মত্ত দাদুরী / ডাকে ডাহুকা / ফাটি যাওত ছাতিয়া।

প্রকৃতির শব্দচিত্রের সঙ্গে রাধার বিরহের আর্তিকে বুনে বুনে এগিয়েছেন কবি অসূচিভেদ্য নিপুণতায়। ময়ূরের নৃত্য এবং ব্যাঙের ডাককে তিনি সমান সম্মানে আহ্বান জানিয়েছেন। রাধার অন্তর বেদনার এই প্রকাশে অকৃত্রিমতা আছে, আছে প্রবলতা। তবুও এর ঐশ্বর্যচেতনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভস্মীভূত কামদেবের সামনে বর্ণিত রতিবিলাপকে :

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী / বিললাপ বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা।

বিদ্যাপতির এই ঐশ্বর্যচেতনা কেবল বিরহের কবিতায় নয়, তাঁর রচিত মিলনের আনন্দোল্লাসেও অভিব্যক্ত। এবং সুখে কিংবা দুঃখে—মিলনের আনন্দোল্লাসে কিংবা বিরহের আর্ত ক্রন্দনে, কোন তত্ত্বচিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি বিদ্যাপতি। এ-আনন্দ প্রত্যক্ষ, সরল এবং অকৃত্রিম। এর মধ্যে চাতুর্যের প্রাধান্য নেই ঠিকই, কিন্তু কেবল মাধুর্যও নেই। আছে অতিরিক্ত একটি ঐশ্বর্যবোধ। ফলে রাধার আনন্দে বিশ্বপ্রকৃতির সাহচর্যের নিমন্ত্রণ কোথাও অসঙ্গত মনে হয়নি :

আজু মঝু গেহ / গেহ করি মানলুঁ / আজু মঝু দেহ ভেল দেহা। / আজু বিহি মোহে / অনুকূল হোয়ল—টুটল সবহু সন্দেহা॥ / সোই কোকিল অব / লাখ লাখ ডাকউ / লাখ উদয় করু চন্দা। / পাঁচ বাণ অব / লাখ-বাণ হোউ / মলয়-পবন বহু মন্দা॥

মননের দীপ্তি, বাক্‌চাতুর্য, নাগরীসুলভ ইন্দ্রিয়ভাবনার সঙ্গে উপলব্ধির বিশ্ববিস্তৃত এই ঐশ্বর্যের কোন মূলগত অনৈক্য আছে বলে আমি মনে করি না।

ছয়

কিন্তু অন্তত গুটি দুয়েক কবিতায় বিদ্যাপতির প্রেমবোধ যেন স্বরাজ্য থেকে নতুন-তর লোকের সন্ধানে হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এর একটি কবিতা নিঃসংশয়ে বিদ্যাপতির। অপরটির রচয়িতা সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ আছে।

প্রথম কবিতাটির মধ্যে গঠন নৈপুণ্যের চরম সাফল্য প্রকটিত। রাধা প্রিয়তম কৃষ্ণকে প্রথমে আপনার প্রসাধনের সঙ্গে উপমিত করেছে :

হাথক দরপণ মাথক ফুল। / নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥ / হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।

কিন্তু তাতেও তৃপ্ত না হয়ে বলছে—'পাখীক পাখ'। পাখীর পাখায়ই তো নীলাকাশের মুক্তি। কৃষ্ণ সেই প্রেমমুক্তির পক্ষ। কিন্তু 'মীনক পাণি'—জীবন-বিচ্যুত মুক্তির বিলাস নয়, মাছের কাছে জলের মতো জীবনের অপরিহার্য আধার তার কৃষ্ণ। এর মধ্যে ভাবগভীরতা আছে, রূপদক্ষতা এবং মননদীপ্তিরও অভাব নেই। কিন্তু তবুও অতৃপ্তি, তবুও জিজ্ঞাসা থেকে যায়—'তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।' এই জিজ্ঞাসা ও অতৃপ্তির সুরেই বাঁধা দ্বিতীয় কবিতাটি 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।'

তবে এই কবিতা দুটির সাহায্যে এমন মন্তব্য করা অতি সাহসের কাজ যে বিদ্যাপতির প্রেমচেতনায় মৌল পরিবর্তন এসেছে। বিদ্যাপতির কবিজীবনের কোন বিশেষ পরিণতিও এরা সূচিত করে না। ক্লাসিক সৌন্দর্যসাধনার মাঝখানে কোন বিশিষ্ট মুহূর্তে কবিচিত্তে এই রোমান্টিক-জিজ্ঞাসা জেগেছে। এর ভাব ও রূপমূল্য যথেষ্ট হলেও এ ক্ষণিকেরই জন্য। কবি আবার আপন নিজস্ব ভাববৃত্তে আবর্তিত হয়েছেন।

৪.৫. চণ্ডীদাস

এক

চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করে যে ঐতিহাসিক সমস্যা বর্তমানে তা একটা ব্যাসকূটের আকার ধারণ করেছে এমন কথা বলা চলে। বর্তমানে সে সমস্যার আলোচনা আমাদের আদৌ লক্ষ্য নয়। তবুও চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অন্তত তাঁর রচিত কবিতাগুলির একটা মোটামুটি হদিশ পাওয়া প্রয়োজন। অথচ প্রাচীন বা অর্বাচীন কোন সঙ্কলনগ্রন্থ থেকে চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত কবিতাগুলির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোই সম্ভব নয়। অর্থাৎ সাহিত্য সৌন্দর্যের সন্ধানী চণ্ডীদাসের পদের কোন সঙ্কলনের উপরই নির্ভর করতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের কোন কোন কবিতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকলেও

তাঁদের সম্পর্কে এ জাতীয় সমস্যা দেখা যায় না। গবেষকদের সেই অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধি যে কত বিলম্বিত হবে আজ তা নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই। নবতর বস্তু-প্রমাণ না মিললে এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যাবে না। কিন্তু প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকবি চণ্ডীদাসের কাব্যজিজ্ঞাসার স্বরূপ সেই গবেষণার চরম ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে না এবং থাকেও নি।

এ বিষয়ে আমাদের অভিমত সূত্রাকারে বলা যায় :

[১] বড়ু চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন।

[২] পদকর্তা চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী কি পরবর্তী সে বিষয়ে রায় না দিয়েও বলা যায় চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের সঙ্গে তিনি আদৌ সম্পর্কিত ছিলেন না।

[৩] সম্ভবত চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন। অবশ্য তাঁর লেখা নয় এমন ক্ষুদ্রপ্রাণ বহু সহজিয়া কবির কবিতা তাঁর নামে চলে গেছে।

[৪] চণ্ডীদাস খ্যাতনামা কবি ছিলেন। পরবর্তী ক্ষুদ্র ও মাঝারি কবিদের তাই এই নামটি গ্রহণ করে তাঁর পূর্বখ্যাতি আত্মসাতের কামনা ও চেষ্টা থাকা অসম্ভব নয়।

ফলে চণ্ডীদাস লেখেননি বা কল্পনা করেননি এমন বহু কবিতায় তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ। কিন্তু এ সমস্ত কবিতা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে তাঁর প্রতিভার ও জীবন-জিজ্ঞাসার কোন সত্যস্বরূপই প্রকাশিত হয় না। চণ্ডীদাসের নামে সঙ্কলিত নিম্নোক্ত পর্যায়গুলিতে যে তাঁর লেখা সামান্যতও নেই একথা জোর করে বলা যায় : দানলীলা, নৌকাবিলাস, বন-বিহার, ধেনুহরণ, মা যশোদা, রাইরাজা, যুগল মিলন, নবনারীকুঞ্জর, গো-চারণ, অক্রূর সংবাদ, মথুরা যাত্রা, ব্রজবিলাপ, সুবল সংবাদ, ব্রজনারীর খেদ, কুব্জামিলন, কংসবধ প্রভৃতি। ভাগবতের ঘটনা ও বৈষ্ণব পালাগানের অনুসরণে এ জাতীয় কবিতাগুলির সৃষ্টি। চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভা মূলত গীতিধর্মী বলে এ জাতীয় রসহীন, গভীরতাহীন, বলা যায় প্রাণের আকুলতার স্পর্শহীন কবিতা রচনা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

সহজিয়া হিসেবে চণ্ডীদাসের খ্যাতি এতই ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত যে এর ভিত্তিতে কিছু সত্যতা আছে বলেই মনে হয়। অবশ্য পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়াগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ থেকে শুরু করে জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ অনেককেই সহজিয়া সাধক বলে দাবি জানিয়েছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস সম্পর্কে তাঁদের দাবিতে জনসাধারণের বিশ্বাস ও সমর্থন ছিল। চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করে নানা কিংবদন্তির জন্মও হয়েছিল এই একই কারণে। সুতরাং নিঃসংশয় প্রমাণের অভাবে চণ্ডীদাসের সহজিয়াত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বিষয়ে চণ্ডীদাসের পাঠককে সচেতন থাকতে হবে যে সহজিয়া ধরনের যত কবিতা চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত আছে তার অধিকাংশই তাঁর লেখা নয়। পরবর্তী বহু সাধারণ-স্তরের রচনা চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে—একটু সতর্ক পাঠকের তা দৃষ্টি এড়াবে না।

পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ে চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভার যে পরিচয় মিলবে তা তাঁর

কবিআত্মার যে পরিচয় বহন করে তার ক্ষীণ চিহ্নমাত্র এই পদগুলিতে নেই। এগুলি শুষ্ক তত্ত্ব-বিবৃতি। সে তত্ত্বের মধ্যে বৈষ্ণব সহজিয়া মতানুসারে প্রেমরহস্য বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কাব্যোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেনি। অধিকাংশ পদের ভাষাই এমন হেঁয়ালীপূর্ণ যে সাধকসম্প্রদায়ের বাইরে তার প্রায় কোন আবেদনই নেই। উদাহরণ হিসাবে দুটি মাত্র কবিতার উল্লেখ করব।

১. মরম কহিতে / ধরম না রয় / নাহি বেদবিধি রস। / সতী যে হইবে / আগুনি খাইবে / না হবে অন্যের বশ॥ / যে জন যুবতী / কুলবতী সতী / সুশীল সুমতি যার। / হৃদয় মাঝারে / নায়ক লুকায়ে, / ভবনদী হয় পার॥ / কুলটা হইবে। কুল না ছাড়িবে / কলঙ্কে ভাসিবে নিতি। / পাইয়া কাম রতি / হবে অন্য পতি / তাহাতে বলাব সতী॥ / স্নান না করিব / জল না ছুঁইব / আলাইয়া মাথার কেশ। / সমুদ্রে পশিব / নীরে না তিতিব / নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ॥

২. যাইবি দক্ষিণে / থাকিবি পশ্চিমে / বলিবি পূরব মুখে। / গোপন পিরীতি / গোপনে রাখিবি / থাকিবি মনের সুখে॥ / গোপন পিরীতি / গোপনে রাখিবি / সাধিবি মনের কাজ। / সাপের মুখেতে / ভেকেরে নাচাবি / তবে ত রসিক রাজ॥ / যে জন চতুর / সুমেরু-শিখর / সুতায় গাঁথিতে পারে। / মাকসার জালে / মাতঙ্গ বাঁধিলে / এ রস মিলায়ে তারে॥

কামের মধ্য দিয়ে তাত্ত্বিক সহজ প্রেমের উপলব্ধির বিশুদ্ধতায় যে পৌঁছতে পারে তার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে প্রথম কবিতায়। দ্বিতীয় কবিতায় গুহ্য সাধনপদ্ধতির কথা হেঁয়ালী ভাষায় বর্ণিত। সহজ সাধকের কাছে সাধ্যবস্তুর অনুভব এবং সাধনরীতির ব্যাখ্যান হিসেবে কবিতা দুটি মূল্যবান। কিন্তু সাহিত্যরসিক পাঠকের কাছে এদের ভাব ও ভাষা কিছু কৌতুক জাগাতে পারে, কাব্যাস্বাদ নয়।

এ-স্তরের কবিতা চণ্ডীদাসের রচনা বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

দুই

চণ্ডীদাসের কবিতা রসপর্যায়ে ভাগ করতে গিয়ে পরবর্তী কীর্তনিয়া ও সঙ্কলকগণ বিপদে পড়েছেন। বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এতে বৈলক্ষণ্য ধরা পড়বে সহজেই। পূর্বরাগের নায়িকায় পূর্বরাগের ভাব বড় নেই, মাথুরে বিরহ-বেদনার আর্তির অভাব, অভিসারের কবিতায়ও পাই প্রাণ-ফাটা হাহাকার। পাঠকের অভ্যস্ত ধারণাকে এ কবিতা বিপর্যস্ত করে দেয়। কারণ প্রেম-জিজ্ঞাসার এমন একটা গভীর স্তরে চণ্ডীদাস অবতরণ করেছিলেন যেখানে বাইরের অবস্থাগত পর্যায়ভেদ তুচ্ছ হয়ে যায়।

পূর্বরাগের নায়িকার মধ্যে লজ্জা ও সঙ্কোচমিশ্রিত যে তৃষ্ণা, নব-পরিচয়ের আকস্মিক চিত্তোদ্বেগজাত যে চাঞ্চল্য প্রত্যাশিত চণ্ডীদাসের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় তা চমৎকার ধরা পড়েছে ঠিকই :

ঘরের বাহিরে / দণ্ডে শতবার/তিলে তিলে আইসে যায় ॥ / মন উচাটন / নিশ্বাস সঘন / কদম্ব-কাননে চায় ॥ / রাই এমন কেন বা হৈল। / গুরু দুরজন / ভয় নাহি মন / কোথা বা কি দেব পাইল ॥ / সদাই চঞ্চল / বসন-অঞ্চল। সম্বরণ নাহি করে / বসি থাকি থাকি / উঠয়ে চমকি ভূষণ খসাঞা পরে ॥

তবুও কিশোরীর এই চাঞ্চল্যের মধ্যে এক আত্মহারা ভাব কবি সঞ্চারিত করেছেন। বসন-অঞ্চল আর ভূষণ খসে পড়ার মধ্যে বিদ্যাপতিতে বয়ঃসন্ধির কবিতায় যে চাতুর্য আছে এখানে তা মিলবে না। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে চণ্ডীদাসের রাধা কিশোরী বালিকা নয় - পূর্বরাগ পর্যায়েও নয়। সে পরিপূর্ণা যুবতী। কয়েকটি কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার চরিত্র ও প্রেমজিজ্ঞাসার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই কবির অতিখ্যাত 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' কবিতাটির উল্লেখ করব। শ্যামের নাম মাত্র শুনে রাধা অতি গভীর প্রেমানুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করেছে। ব্যাখ্যাতা বলছেন, 'সামান্য নায়ক-নায়িকার নাম শুনিয়া প্রেম উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়ত নামের মাধুর্য—ইহাও ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ। তৃতীয়ত নাম-জপ [মন্ত্রস্য স্থূলঘুচ্চারো জপঃ]—ইহাও ভগবৎ-প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না।' [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'র পাদটীকা] বৈষ্ণব কবিতাকে মানবিক অনুভূতির কাব্যরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা না করে, ভক্তিতত্ত্বের অনুসন্ধানে কিরূপ বিপর্যয় হয় তার নিদর্শন। এই কবিকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী বলে স্বীকার করেও সমালোচক চৈতন্য-প্রবর্তিত নামগানের পূর্বচিহ্ন এর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন। অথচ কবিতাটির সৌন্দর্যাস্বাদে এইসব ব্যাখ্যা ও আবিষ্কার বাধারই সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের নায়িকা প্রিয়তম জগৎসিংহের নাম জপ করেছে—তাতে তার প্রেম ভাগবত রাজ্যে নির্বাসিত হয়নি। আর নাম শুনে প্রেম উৎপন্ন হবার কথা এ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ নয়। কারণ কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার পূর্বে সাক্ষাৎ হয়নি এমন কথা কবিতায় নেই। কবি বলেছেন :

নাম পরতাপে যার / ঐছন করল গো / অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

রাধা বলেনি, যার নামের এত প্রতাপ, তাকে চোখে দেখলে না জানি কি হবে? কাজেই কবিতাটির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে এমন কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না যাতে এর আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হয়।

আসলে চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম বস্তুবোধের রাজ্যে ভ্রমণ করে না। বস্তুরূপ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত এক গভীর রহস্যলোকে রাধা-চিত্তের নিত্য পরিক্রমা। এজন্য অনেকেই চণ্ডীদাসের প্রেমের মানবিক রূপ গ্রাহ্য করতে চান না। যেন যেখানেই প্রেমের স্থূল দেহধর্ম প্রকাশিত সেখানেই তা মানবের, আর যেখানে তার সূক্ষ্ম চিত্তধর্ম দেহবোধকে অতিক্রম করে যায় সেখানে তা দৈবী সামগ্রী—এইরূপ একটি ধারণা সমালোচকদের মধ্যে প্রচলিত থাকার ফলেই এসব কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যানের

দিকে অতিপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

আবার বিখ্যাত 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' কবিতার ব্যাখ্যাতার মতে : 'এই পদে চণ্ডীদাস রাধার পূর্বরাগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন মহাপ্রভুর জীবনে অনেকটা সেইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল'।—এই মত চৈতন্যজীবনীকারগণ কর্তৃক সমর্থিত। কিন্তু এ থেকে নিম্নোক্ত আধ্যাত্মিক এবং অলৌকিক সিদ্ধান্তে পৌছানো অসম্ভব এবং কবিতা-বিচারে অপ্রয়োজনীয়—'এই সকল পদে চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর আগমনী গান করিয়াছেন'।

এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করার কিছুটা প্রয়োজন ছিল। চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করে ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যান যেভাবে প্রবাহিত তাতে তাঁর কবিতার সৌন্দর্যস্বরূপ প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অথচ পদকর্তা চণ্ডীদাসকে আমরা অনেকেই চৈতন্য-পূর্ববর্তী বা চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে অসম্পৃক্ত কবি বলে মনে করি। বৈষ্ণবীয় রস-পর্যায়ের সঙ্গে যে তাঁর আদৌ পরিচয় ছিল না, তাঁর কবিতাগুলি তা সহজেই প্রমাণ করে। চণ্ডীদাসের কবিতাগুলি রসপর্যায়ে বিন্যস্ত করতে গিয়ে যে ভাববিপর্যয়ে পড়তে হয় তা লক্ষণীয়। আর চণ্ডীদাস যদি সহজিয়া মতাবলম্বীও হন তবুও তাঁর অবদান প্রেমানুভূতির অতি নিগূঢ় অন্তর্মুখিতার দিকে—অন্যত্র নয়। সহজিয়ারা সহজ পথের পথিক। তাঁদের প্রেম অন্তরের অতি গভীর লোকে বাস করে। কিন্তু তার সরল সহজ প্রাণময় মূর্তি কেবল অনুভববেদ্য, বুদ্ধিগম্য নয়। বাইরের বস্তুরূপে নয়, অন্তরের একাকীত্বে এ প্রেম বহমান। চণ্ডীদাস মূলত কবিপ্রাণের অধিকারী ছিলেন বলেই সহজিয়া তত্ত্ববিবৃতিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। সেই সাধনতত্ত্বের মধ্য থেকে আপন কবিপ্রাণ একটি সুগভীর প্রেমদৃষ্টি আয়ত্ত করার প্রেরণা লাভ করেছে।

চণ্ডীদাসের কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিচারে প্রথমেই দুটি কথা স্মর্তব্য। কবি তাঁর সৃষ্ট রাধাকে আপন আত্মার প্রতিফলন হিসেবে গড়েছেন। রাধার ভাবানুভূতিকে দূরে দাঁড়িয়ে নিরাসক্ত দর্শকের [বা আর্টিস্টের] দৃষ্টিতে দেখা ও রূপবিদ্ধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি আপন কবিসত্তাকে রাধার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন। রাধার ক্রন্দনে চণ্ডীদাসের ব্যক্তি-অনুভূতি ও প্রেম-জিজ্ঞাসার আর্তি ঝঙ্কার তোলে। এই অর্থেই চণ্ডীদাসের কবিতার লিরিক ধর্ম সার্থক।

দ্বিতীয়ত চণ্ডীদাস অতিমাত্রায় ভাবাবেগ-বিহ্বল। অনুভূতির রসাপ্লুতি তাঁর কবিতার প্রাণ। বুদ্ধির দীপ্তির অপেক্ষা তিনি রাখেন না, যুক্তির ক্রম তাঁর কবিতায় মেলে না। প্রেম-উপলব্ধির পর্যায় তাঁর চেতনায় ভাবের প্লাবনে বিপর্যস্ত। এই ভাবপ্রবণতা আবার অতিমাত্রায় কোমল এবং স্পর্শকাতর, একান্ত করুণ এবং বাংলার জলভরা শ্যামল মেঘের সঙ্গেই তুলনীয়।

আবার পূর্বরাগ পর্যায়ের কবিতার কথায় আসা যাক। চণ্ডীদাসের রাধাকে আমরা প্রগাঢ় যৌবনা বলেছি। তার যৌবনধর্মকে আমি চণ্ডীদাসের এ পর্যায়ের কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ বলে মনে করি। সে যোগিনী হয়ে যেতে চায় একথা ঠিক।

কিন্তু এ যোগিনীর পরিধানে ত্যাগ-ধূসর গৈরিক নয়, প্রেমরক্তিম রাঙ্গাবাস। কাজেই যে :

বিরতি আহারে / রাঙ্গাবাস পরে / যেমত যোগিনী পারা।

সে যে প্রেমযোগিনী তাতে সন্দেহ কি? চণ্ডীদাসের রাধা আপনার :

এলাইয়া বেণী / ফুলের গাঁথনি / দেখয়ে খসায়ে চুলি।

অবেণীবদ্ধ আকুল কৃষ্ণকেশের পটভূমিতে স্থাপিতা এই নারীর যৌবনধর্মে সন্দেহ নেই। এই বর্ণনা চণ্ডীদাসের রাধাকে সন্ন্যাসের ধূসর পটভূমি থেকে যৌবনের বর্ণাঢ্য রাজ্যে নিয়ে আসে।

কিন্তু রাধার যৌবনধর্ম দেহধর্ম ইন্দ্রিয়বোধে পর্যবসিত নয়। রাধার ইন্দ্রিয়বোধ গভীরতম প্রেম প্রত্যয়ের মধ্যে আত্মহারা :

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে। / যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥ / এ ছার রসনা মুই যত করু বন্ধ। / তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ॥ / সে না কথা শুনিব করি অনুমান। / পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥ / ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব। / সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

ইন্দ্রিয় দ্বারের স্বাভাবিক অনুভব-বৃত্তি আজ রুদ্ধ, কেবল একটিমাত্র কেন্দ্রীয় উপলব্ধির দিকে তার দ্রুত যাত্রা। একে কবি বলেছেন, 'আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।' রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্পর্শের এই বস্তুজগৎ,—এর বিচিত্র সৌন্দর্য তাই চণ্ডীদাসের কবিকল্পনাকে আদৌ আকর্ষণ করেনি। কারণ এদের প্রবেশপথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। চেতন-কেন্দ্রের যে স্তরে বর্ণের অনুভূতি, রেখার বোধ, রসের আস্বাদ, স্পর্শের রোমাঞ্চ সে স্তরগুলি স্বধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, লক্ষ্য না হয়ে উপলক্ষে পরিণত হয়েছিল। ইন্দ্রিয়জগতে এরাই ছিল এতকাল পথের শেষে, এবার এরাই পথ হয়ে দাঁড়াল, আর সব পথের একটাই শেষ—সে একটা বিচিত্র অনুভূতি, তার নাম কৃষ্ণ।

এ কৃষ্ণ কি রূপধারী? কৃষ্ণের রূপবর্ণনার যে মুষ্টিমেয় দুএকটি কবিতা চণ্ডীদাসের আছে তার মামুলি প্রাণহীনতার কারণই হল, কৃষ্ণ সম্পর্কে চণ্ডীদাসের ধারণা অন্য রকম কৃষ্ণ তো রক্ত মাংসের মানুষ নয়, অপ্রাকৃত 'রসস্বরূপ'ও নয়। এ রোমান্টিক কবিকল্পনার একটা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আর অনন্ত প্রেমের কুহেলি-আচ্ছন্ন রেখাহীন চেতনা। রাধা কিংবা চণ্ডীদাসের কামনা বাসনা আর্তি আদর্শের তিল তিল কল্পনার সমন্বয়ে এই কৃষ্ণের নির্মিতি। তাই সে রূপ নয়, কেবল নাম। সে যে মানস পুরুষ। রূপ তাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, স্পষ্ট করে তোলে, কল্পনার অবকাশটুকুকেও রুদ্ধ করে। কিন্তু একটি নামের সংকেত—সে তো বাধাহীন, কল্পনার কত বিচিত্র রাজ্যের সে পথ-নির্দেশ করে। কত গভীর তৃষ্ণাকে সে আকুল করে তোলে। তাই রাধা নাম শুনেই জপ করে, জপ করতে করতে আপনাকে হারিয়ে ফেলে, আপন কল্পনার মাধুর্যে কয়েকটি শব্দসমষ্টিকে মধুর করে তোলে :

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম। / কানের ভিতর দিয়া / মরমে পশিল গো / আকুল করিল মোর প্রাণ॥ / না জানি কতেক মধু / শ্যাম-নামে আছে গো / বদন ছাড়িতে নাহি পারে। / জপিতে জপিতে নাম / অবশ করিল গো / কেমনে পাইব সই তারে॥

লক্ষণায় এই নাম 'শ্যাম' কৃষ্ণ নয়। শব্দ নির্বাচনের এই একটি উদাহরণই যেন চণ্ডী-দাসের সাবলীল আপাত অচেতন কিন্তু গভীর নিপুণ রচনাক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। শ্যাম শব্দটি যে কোমল সরস প্রাণময় বর্ণসম্পাতে চিত্তকে মাধুর্যরসে সিঞ্চিত করে কৃষ্ণ শব্দটি তা পারে না।

আবার যার নামের প্রতাপ এতই শক্তিশালী তার অঙ্গের স্পর্শের জন্য কি আকৃতি? অঙ্গহীনের অঙ্গস্পর্শের জন্যই যেন এই গভীর আকৃতি। কামনার এই অতি-প্রবলতাই যেন বলে দেয় এই কামনা চরিতার্থ হবার নয়।

চণ্ডীদাসের রাধার প্রণয় অনুভূতিতে এতই হৃদয়প্রাধান্য যে বস্তুর ইঙ্গিতই তার পক্ষে যথেষ্ট, বস্তুর ইন্দ্রিয়গম্য রূপের প্রতি তার আকর্ষণ নেই। তাই সে কৃষ্ণের সন্ধানে আপনার কালো কেশের গভীর অন্ধকারে কখনও ডুবে যায়, কখনও :

হসিত বয়ানে / চাহে মেঘ-পানে / কি কহে দুহাত তুলি। / এক দিঠ করি / ময়ূর-ময়ূরী / কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।

মেঘের সজল শ্যামল ধূসর বর্ণ, ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠের উজ্জ্বল চাকচিক্য অথবা কালো চুলের অরণ্য—এদের বস্তুগত বিভিন্নতা স্পষ্ট। বর্ণেও কত অমিল। কিন্তু একটা ভাবের স্পর্শে এদের মধ্যে গভীর সামীপ্য জন্মাতে পেরেছেন কবি এতে রূপদক্ষতারই পরিচয়। কৃষ্ণের সঙ্গে এদের বর্ণগত নৈকট্য বড় কথা নয়, বড় হয়ে উঠেছে এলোচুলে যৌবনের গভীর ব্যাকুলতা, মেঘে মেঘে সুদূর অসীমাকৃতি, শিখীকণ্ঠের স্নিগ্ধ মধুর ঔজ্জ্বল্যে কামনার 'শ্যাম বহ্নি শিখা'। এই ব্যাকুল অসীমদ্যোতনা ও কামনার বর্ণ বিচ্ছুরণেই তার কৃষ্ণকল্পনা অন্তরে রূপ নেয়। পদকর্তা চণ্ডীদাস রূপান্ধ ছিলেন না, বস্তুরূপের অন্তরে সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবানুভূতির ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে তিনি সার্থক।

বস্তুরূপের অতীত ইন্দ্রিয়োর্ধ কৃষ্ণমূর্তি তা প্রকাশ পেয়েছে কবির আরও একাধিক কবিতায়। যেমন :

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে। / নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে। / কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি। / কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি।

কালো তো সব রঙের অভাব নয়। সমস্ত বর্ণবোধের উর্ধ্বে। এই কালো রঙের অসীম ব্যাপ্তি ও অতলান্ত গভীরতায় বাইরের বস্তুবোধের তুচ্ছ পার্থক্য ও সামান্য সীমারেখা এখানে একটা বিরাট মহৎ ও সমুন্নত উপলব্ধির মধ্যে একাকার হয়ে যায়।

এই যার কৃষ্ণচেতনা তার পূর্বরাগের অনুভাবে চিরবিরহিণী নারীর শাশ্বত ক্রন্দন শোনা যাবে এটাই স্বাভাবিক। সে আত্ম-অনুভূতির এমন রাজ্যের অধিবাসী যেখানে 'সুখ-দুঃখ দুটি ভাই'। তাই পূর্বরাগেই মাথুরের ক্রন্দন, আর মথুরা প্রবাসের সম্ভাবনায়

রাধার বিপরীতধর্মী বিস্ময়কর উক্তি :

তোমরা যে বল শ্যাম / মধুপুর যাইবেন / সে কথা ত কভু শুনি নাই ॥ / হিয়ার মাঝারে মোর / এ ঘর মন্দির গো / রতন-পালঙ্ক বিছা আছে ॥ / অনুরাগের তুলিকায় / বিছানা হয়্যাছে গো / শ্যামচাঁদ ঘুমায়্যা রয়েছে ॥ / তোমরা যে বল শ্যাম / মধুপুরে যাইবেন / কোন পথে বঁধু পলাইবে ॥ / এ বুক চিরিয়া যবে / বাহির করিব গো / তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥

আসলে রাধার অন্তরেই তো শ্যামের বাস। কল্পনার-কামনার রঙে রসে তার নির্মাণ। তাই তো তার কোন বস্তুসত্তা নেই। তাকে কেবল চাওয়া যায়, বিশ্বের ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে তাকে অনুসন্ধান করা যায়, তাকে একটি মানবরূপে ধরা যায় না। সে সবচেয়ে বেশি আয়ত্তের অতীত। তাই গভীর আলিঙ্গনে :

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

নিখিলের রূপ থেকে অরূপের দিকে চিরন্তন সৌন্দর্য ও প্রেমকামনার ও বিরহের এই সুতীব্র সুগভীর আর্তি চণ্ডীদাসের কবিতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই রাধা বলে :

আইস আইস বন্ধু আইস / আধ আঁচরে বৈস / নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি। / অনেক দিবসে / মনের মানসে / সফল করিয়ে আঁখি। /

কিন্তু কেবল নাম শুনে আর তাকে ঘিরে অজস্র কল্পনার ইন্দ্রধনু রচনা করে দিন গেল, নিজের কালো চুলের অরণ্যে পথ হারাল রাধা, এই নয়ন ভরে দেখা আর হল না। সাধই রয়ে গেল, চণ্ডীদাসের তাই রূপরচনা আর হল না। রাধা বলছে :

বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব। / হিয়ার মাঝারে / যেখানে পরাণ / সেইখানে লঞা থোব। / কাল কেশের মাঝে / তোমা বন্ধ রাখিব / পুরাব মনের সাধ। / যদি গুরুজন / জিজ্ঞাসে বলিব / পর্য্যাছি কালা পাটের জাদ। /

সে কোন্ সৃষ্টির আদি প্রভাতে অথবা স্মৃতির অতীত রোমান্সের রাজ্যে—যখন কল্পনা-বাস্তব মিশে ছিল একাকার, যখন চাওয়া-পাওয়ায় কোন ভেদ ছিল না, সেই কামনার কল্পিত কামস্বর্গ থেকে আজ আমরা চিরকালের জন্য নির্বাসিত। তাই রাধা স্বপ্নে মাঝে মাঝে মনে মনে ভাবে—হিয়ার মধ্যে শ্যামচাঁদ ঘুমিয়ে আছে।

চণ্ডীদাসের রাধায় তাই গভীর ব্যাকুলতা।

তিন

চণ্ডীদাসের অপর কতকগুলি কবিতায় রোমান্টিক সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও তজ্জাত ব্যর্থতার আকুল আর্তি নয়, বাঙালি গার্হস্থ নারীহৃদয়ের অতি করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে। সমাজ সংসারের নিন্দা ও ধিক্কারকে অবহেলা করে কেবল প্রাণের, প্রেমের আকর্ষণে যে রাধা ঘর ছেড়েছিল, প্রিয়তম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার বেদনা তার পক্ষে নিদারুণ। অবশ্য এই প্রত্যাখ্যানজনিত বেদনায় রোমান্টিক সৌন্দর্য-বিরহের অতি গভীর সুর অনেকখানি মিশে গেছে। বিশেষ করে এদের প্রকাশভঙ্গির সরল অথচ হৃদয়বিদারক

ভঙ্গি এ কবিতাগুলিকেও সামান্যতার অনেক ঊর্ধ্বস্তরে স্থাপন করেছেন। রাধা বলছে :

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান ॥ / অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥ / ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর ॥ / পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥ / রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি। / বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ / কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি। / এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥ / বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও। / মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥ /

এ বেদনা নারীর—বিশেষ করে বাংলা দেশের ভাবপ্রবণ পল্লীবালার আপন অনুভূতি। কৃষ্ণ একে বুঝবে কি করে ? তাই রাধার হৃদয়-মন্থনজাত অভিশাপ :

মরিয়া হইব / শ্রীনন্দের নন্দন / তোমারে করিব রাধা।

তবেই কৃষ্ণ বুঝতে পারবে 'পিরীতি কেমন জ্বালা'।

এই কবিতাগুলির রসাস্বাদ কিন্তু দেশ-কাল নিরপেক্ষ নয়। বাংলা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ প্রণয়ের তীব্র প্রবণতা বাঙালি নারীর ভাবপ্রবণ কোমল চিত্তবৃত্তির সঙ্গে জড়িত হয়ে এর ভাবলোক নির্মাণ করেছে। অপরের প্রেমে যে গৃহ-সংসার তুচ্ছ করেছে অথচ এ যুগের ব্যক্তিবুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হয়নি, ভাবাকুলতায় দ্রবীভূত হয়ে আছে, প্রিয়তমের ব্যবহারে যখন তার মনে আক্ষেপ জাগে, সংশয় আসে তখন আপন মৃত্যুকামনা ছাড়া তার মুখে ভাষা থাকে না। আর যখন সে সত্যই প্রত্যাখ্যাত হয়, যখন কৃষ্ণ মথুরায় চলে যায় তখনও তার গুমরানো ক্রন্দন বাইরে প্রকাশ করা যায় না। দীর্ঘকাল পরে দেখা হলে শুধু বলে :

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। / মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥

এখানে ব্যঙ্গ-ভৎর্সনার জ্বালা নেই, আর নেই বলেই এই কয়টি কথার চারপাশে না-বলা অসংখ্য বেদনার্দ্র কথা, বুকের রক্ত নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

চার

চণ্ডীদাসের নিবেদন পর্যায়ের কবিতাগুলি বিশিষ্ট ভাবকল্পনার বাহন। রাধার আত্মনিবেদনমূলক এই কবিতাগুলির মধ্যে সমস্ত দেহ-মন-প্রাণকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেবার আন্তরিক সুরটি চমৎকার বেজেছে। উদাহরণ হিসেবে দুটি কবিতার উল্লেখ করব :

১ বঁধু কি আর বলিব আমি। / জীবনে মরণে, জনমে জনমে / প্রাণনাথ হৈও তুমি। / তোমার চরণে, আমার পরাণে / বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া / নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ /

২ বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ। / দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি / কুল শীল জাতি মান ॥ /

আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রাণের যে সুগভীর আকুলতা

প্রকাশিত হয়েছে তা চণ্ডীদাসের কবিক্ষমতারই উপযুক্ত। ভাষা এত সহজ বলেই এত মর্মস্পর্শী। অলঙ্করণের চেষ্টা মাত্র নেই বলেই এর আবেদন যেন অভ্রান্ত এবং অনুভূতির মর্মমূলকে বেদনার তীব্রতার মধ্যে জাগরিত করে।

কিন্তু আত্মনিবেদনের এই সুতীব্র কামনা কেন? কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই—ফাঁকির তো কথাই ওঠে না। তিল তুলসী দিয়ে সব কিছু নিঃশেষে অর্পণ করা কেন? কামনা অত অতৃপ্ত বলেই আত্মনিবেদন এত নিশ্ছিদ্র। যাকে কোনকালে পাওয়া যাবে না তার কাছেই সম্পূর্ণ করে আপনাকে সঁপে দেওয়া। এ ছাড়া চণ্ডীদাসের রাধার আর কোন্ পরিণতি সম্ভব? অধরার পিছনে নিরুদ্দেশ যাত্রায় কণ্টকক্ষত পদ যখন একান্ত ক্লান্ত তখন তাকে ধরার আশা ছেড়ে দিয়ে তার কাছে আপনি ধরা দেওয়াই শ্রেয়। রাধা সেই পন্থাই গ্রহণ করেছে।

হৃদয়-রক্তরঞ্জিত রাঙা বাস পরিহিত প্রেম-যোগিনী রাধার যাত্রা সমাপ্ত হল আত্মনিবেদনের উপলব্ধিতে।

৪. ৬. জ্ঞানদাস

এক

চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের মধ্যে জ্ঞানদাস বিশিষ্ট। বাঙালি পদকর্তাদের মধ্যে উৎকর্ষের দিক থেকে চণ্ডীদাস এবং গোবিন্দদাসের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে।

জ্ঞানদাস কেবল কবি নন, ভক্ত বৈষ্ণব সাধক এবং চৈতন্যপরবর্তী ব্যক্তি। তাই বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক দিক উদ্ঘাটিত করেছিলেন জ্ঞানদাসের তাতে সম্যক অধিকার ছিল। বৈষ্ণব ধর্মসাধনা এবং ভক্তি-মার্গে অবিচল নিষ্ঠা নিয়েই তিনি পদ রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা রচনা সচেতন রূপসৃষ্টি নয়, ভক্তিমার্গেরই একটা বিশিষ্ট প্রকাশ, বলা যেতে পারে 'লীলাশুক' বৃত্তি। সাধক নরোত্তমের ভাষায় জ্ঞানদাসের অবস্থাটা অনেকটা নিম্নরূপ :

ছাড়িয়া পুরুষদেহ / কবে বা প্রকৃতি হব। / দোহারে নূপুর পরাইব ॥

কবি যেন এক গোপকিশোরী মূর্তি ধারণ করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দর্শন করছেন এবং আনুগত্যময়ী সেবা করছেন। সেই প্রেমলীলার রসমাধুর্য তিনি ভাষায় রূপবদ্ধ করে পাঠকের কানের মধ্য দিয়ে মর্মস্থল পূর্ণ করেছেন। এই কাব্যকৃতি একজন ভক্ত বৈষ্ণব কবির সাধনা। কবির ভণিতাগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই তাঁর এই সখিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন মিলন-সৌন্দর্য বর্ণনান্তে কবি বলছেন :

শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী। / জ্ঞানদাস মাগে রাঙা চরণ মাধুরী ॥

খণ্ডিতা নায়িকাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে কবি যখন বলেন :

জ্ঞানদাস কহে / শুন গো সুন্দরী / মিলবি বধুর সনে।

অথবা, জ্ঞানদাস কহে / শুন বিনোদিনী / তুয়া লাগি মুগধ শ্যাম চিন্তামণি।

তখন কবির সখিসুলভ ভূমিকায় সন্দেহ জাগে না।

দুই

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা বৃন্দাবনের ধর্মদর্শন ও ভক্তিমার্গে দীক্ষিত হলেও সত্যকার প্রতিভাসম্পন্ন কবিদের সৃষ্টিতে এই ভক্তি-বিশ্বাস বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ,—প্রথমত, এঁদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ মধুর রূপের পূর্ণবিগ্রহ, ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত নয়। দ্বিতীয়ত, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নয় প্রেমই এঁদের কাছে পরম পুরুষার্থ। তৃতীয়ত, জীবনকে এঁরা শাশ্বত বলে মনে না করলেও মায়া বলে নস্যাৎ করেন না। জীবন এঁদের মতে ভগবানের চিৎকণ-অংশ—শূন্য স্বভাব নয়। তাই এই পৃথিবীর এবং মানুষের সংসার জীবনের সঙ্গে গোড়ায়ই এঁরা একটা লড়াই বাধিয়ে বসেননি। ফলে রূপজগৎ থেকে অজস্র গ্রহণে এঁদের বাধা ছিল না কোথাও। রূপপ্রাণ কবিরা ভক্তিমার্গে পুরোপুরি স্থিত হয়েও শব্দ ও সঙ্গীতে রূপেরই ধ্যান করতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভগবান অপ্রাকৃত, কিন্তু নিরাকার নন।

প্রেমকে যাঁরা ধর্ম বলে গ্রহণ করেন তাঁরা যে মানবজীবন-লীলার অতি নিকট প্রদেশের অধিবাসী তাতে সন্দেহ নেই। মানব প্রেমলীলার সঙ্গে ঐশ্বরিক প্রেমের 'লোহ আর হেমে যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ' থাকলেও 'কামক্রীড়া সাম্যে সে ধরে; কাম নাম'। অর্থাৎ মানবজীবনের কামনা-বাসনার, হৃদয়বৃত্তি মূলক লীলা বিলাসের বহিরঙ্গের সঙ্গে এর মিল আছে। বৈষ্ণব সাধকেরা দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর সর্ববিধ মানব প্রেমকেই সাধনজগতের সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। কাজেই বৈষ্ণবদের ধর্মসাধনা ও বিশ্বাস কোন দিক দিয়েই সাধকের কাব্য-সৃষ্টিতে বাধা হয়নি। অপরপক্ষে চর্যার কবিদের সামনে ছিল এই বাধা, কারণ তাঁদের ধর্মদর্শন রূপের জগৎটাকেই মিথ্যা বলে, ভ্রান্তি বলে অস্বীকার করে বসেছিল।

জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-শেখর প্রমুখ কবিরা চৈতন্যোত্তর ধ্যানধারণা ও ধর্মবিশ্বাসে অবিচল থেকেও কবিতা রচনা করতে পেরেছিলেন যাতে ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে পরবর্তীকালের সাহিত্যরুচির কাছে আপনাদের রচনার আবেদন পৌছায়। এঁদের মধ্যে ছিল সত্যকার কবিপ্রতিভা, তাই প্রেমরসাত্মক গীতিকবিতায় কচিৎ এঁরা ধর্মের প্রচারে নেমেছেন। মানবিক প্রেমের মাধুর্যসিক্ত পরিমণ্ডলে অকস্মাৎ কৃষ্ণের ভগবত্তার আরোপ করে রসাভাস সৃষ্টি করেননি।

তিন

জ্ঞানদাস বৈষ্ণবভক্ত হলেও এবং সাধকের চেতনা নিয়ে কবিতা লিখলেও খাঁটি কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাই ভক্তি ও তত্ত্বের রাজ্যে পরিভ্রমণ করলেও তাঁর রচনায় কবিচিত্তের অকৃত্রিম স্পর্শ প্রায়ই থেকে গেছে। অবশ্য একথা বলা চলে না যে ভক্তিমার্গের যে-কোন প্রেরণা তাঁর সমগ্র কবিচিত্তকে উদ্বোধিত করেছিল। উদাহরণ হিসেবে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলীর কথাই ধরা যেতে পারে। এই কবিতা-গুলিতে কবি রূপসৃষ্টিতে যথেষ্ট উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারেননি। বৃন্দাবন

-গোস্বামীদের কথিত গৌরতত্ত্বটি তিনি ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভাষায় প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি ও প্রকাশই কাব্য নয়। চৈতন্য সমসাময়িক গৌরপদরচয়িতাদের মানবীয় তীব্র আকৃতিপূর্ণ সরল সৌন্দর্য জ্ঞানদাসে মেলে না আবার গোবিন্দদাসের সুকোমল কিন্তু ব্যক্তিমহিমা-সমুন্নীত চৈতন্যের মনোমুগ্ধকর রূপ :

উন্নত গীম / সীম নাহি আনুভব / জগ-মন-মোহন ভাঙ্গনি রে।

জ্ঞানদাসের কবিতায় ধরা পড়েনি। গোবিন্দদাসও ছিলেন জ্ঞানদাসেরই মত চৈতন্য-পরবর্তী এবং বৃন্দাবনী গৌরতত্ত্বে দীক্ষিত। কিন্তু গোবিন্দদাসের সমগ্র কবিসত্তা এখানে জেগে উঠেছিল, তাই ভক্তিকে ছাপিয়ে রূপসার্থকতা ঘটেছিল। জ্ঞানদাসের গৌর পদাবলীতে এই রূপচেতনার চিহ্ন পাওয়া যায় না। দুই একটি কবিতার আলোচনায় এ মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। গৌরাঙ্গকে ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব বলে ঘোষণা করে কবি বলেছেন :

বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী। / শিব শুক নারদ জনা দুই চারি ॥ / সেতুবন্ধ কৈলে তুমি রাম অবতারে। / এবে যে অল্প তোমার আশ এ সংসারে ॥ / কলিযুগে করিলে কীর্তন সে বন্ধ। / সুখে পার হউক যত পঙ্গু কুড় অন্ধ ॥

বৈষ্ণব ধর্মবোধে পরিপূর্ণ বিশ্বাস এ কবিতার ভাষায় প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি লাভ করেছে, কিন্তু রূপসৃষ্টির চরম ব্যর্থতা একে বিবৃতির ঊর্ধ্বে কাব্যসৃষ্টির মহিমায় উন্নীত করতে পারেনি। আবার রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের কৃষ্ণবিরহখিন্ন অবস্থাটি একাধিক কবিতার বিষয়রূপে অবলম্বিত। যেমন :

কি লাগি গৌর মোর। / নিজ রসে ভেল ভোর ॥ / অবনত করি মুখ। / ভাবয়ে পূরব দুখ ॥ / বিহি নিকরুণ ভেল। / আধ নিশি বহি গেল ॥

কিংবা—

সোনার গৌরচাঁদে। / উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি, / হা নাথ বলিয়া কান্দে ॥

কবি তত্ত্ব অনুসরণে দ্বিধাহীন। কিন্তু বিরহিণী রাধিকার সেই আকুল আর্তি কোথায়? গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদের সেই বিপুল পুলক ও বেদনা-আন্দোলিত দেহ-মন-প্রাণের চিত্র কোথায়? চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার বর্ণনায় স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌরাঙ্গের যে ভাবোন্মাদের আর্তিকে ভাষারূপ দিয়েছেন তাতে তাত্ত্বিক দর্শনবেত্তা পণ্ডিত কবি-মর্যাদার দাবিদার হয়েছেন। কিন্তু জ্ঞানদাস কবি হয়েও তত্ত্ব-বিবৃতির মামুলি সামান্যতা অতিক্রম করতে পারেননি।

কিন্তু কেন? জ্ঞানদাস তো রূপ-অন্ধ কবি ছিলেন না। ভাব-রূপের চমৎকার অভিব্যক্তিতে তাঁর বিশেষ সার্থকতার পরিচয় আমরা কিছু পরেই লাভ করব। তবে কবিতা হিসেবে গৌরপদাবলীর এ ব্যর্থতা কেন? তাই মনে হয় কবির সাধক সত্তার প্রেরণায়ই শুধু এই কবিতাগুলির সৃষ্টি, কবি-চিত্তের প্রেরণায় নয়।

চার

বৈষ্ণব পদাবলীর কবির ব্যক্তিত্বের পরিচয়-নির্ণয়ের যে পদ্ধতির কথা আগে বলা হয়েছে জ্ঞানদাসের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োগ প্রয়োজন। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের সামনে প্রথা ছিল দুটি— ১) ধর্ম ও দর্শনে বিশ্বাস, ২) একটি বিশিষ্ট রসপর্যায়ের কাঠামোর অনুসরণ। ভক্ত বৈষ্ণব কবিরা মনেপ্রাণে তত্ত্ব ও দর্শনে বিশ্বাস করতেন এবং তাকে ভাষায় প্রকাশ করাকে সাধনারই অঙ্গ বলে মনে করতেন। কিন্তু কবি-আত্মার উদ্বোধনই এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে একালে এবং সেকালেও খাঁটি কবি-সাহিত্যিকের স্রষ্টা-সত্তা এবং বাস্তব জীবন ও মতামত, বিশ্বাস ও ধর্মাচরণ, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কর্মপদ্ধতি একে অপরের আয়না মাত্র নয়। প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে, মিলনে-দ্বন্দ্বে, নানা বর্ণসম্পাতে, সচেতনবোধে এবং মগ্ন-চৈতন্যে এদের মধ্যেকার সম্পর্ক বিচিত্র ও জটিল।

দ্বিতীয়ত, রসতত্ত্বের দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বৈষ্ণব গীতিকবিতার একটা মোটামুটি কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। কীর্তনগানে প্রায়ই একটি রসপর্যায় অনুসৃত হত। ভক্ত বৈষ্ণবেরা কাব্যরচনায় এই রসতত্ত্বের নির্দেশিত কাঠামোকে ধরেই অগ্রসর হতেন। কিন্তু কবির নিজস্ব জিজ্ঞাসা সর্বত্র কি উদ্বুদ্ধ হত? বিভিন্ন পর্যায়ের অনুভূতি ও জীবনবোধ কি সবাইকে সমভাবে আকর্ষণ করত? এর উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যেই অনেকের কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচয় মিলবে।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা এই রসপর্যায় সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং পর্যায় ও শ্রেণীবিভাগ মিলিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। কাজেই, বিষয়বস্তুর স্বাধীন নির্বাচনের সুযোগ তাঁদের ছিল না। কতগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট পাত্রপাত্রীর [তাদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয় ; শেষপর্যন্ত রাধা ও কৃষ্ণ এ দুটিই থাকে] মনোভাব অঙ্কনই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কাজেই পুনরুক্তি ঘটত প্রচুর, একই মুডের একই অভিব্যক্তি একের পর এক কবি প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করে যেতেন। এর মধ্য থেকে কবির ব্যক্তি-প্রবণতা খুঁজে বের করা দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নেই। যদি কবিচিত্তের ব্যক্তিগতবোধ খুব তীব্র না হয় তাহলে সহস্রের ভিড়ে সে হারিয়ে যায়। মুষ্টিমেয় কবির মধ্যেই ব্যক্তিত্বের এই তীব্রচেতনা লক্ষ্য করা চলে এবং জ্ঞানদাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে জ্ঞানদাসেরও অজস্র কবিতায়—বলা যায় বেশির ভাগেই—কেবল প্রথা ও নিয়মের অনুসরণ। সেখানে আর দশজন থেকে তাঁর পার্থক্য একরূপ অনুপস্থিত। কিন্তু যেখানে তাঁর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত তারা একক, আধুনিক সমালোচকের প্রথম কর্তব্য তাদের চিনে নেওয়া।

এবারে দেখা যাক কোন্ পর্যায়ের কবিতা রচনায় জ্ঞানদাসের সর্বাধিক উৎসাহ এবং কবিমনের সর্বাধিক উল্লাস ; রচনারীতি ও চিত্রধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি কোন পর্যায়ের কবিতায় সবচেয়ে বেশি।

আমরা আগেই দেখেছি মুষ্টিমেয় গৌরবিষয়ক যে পদাবলী তিনি লিখেছেন তাতে কবিচিত্তের উদ্বোধনের স্পর্শ নেই। কাজেই রচনায়ও রূপসৃষ্টির উৎকর্ষ নেই। এখানে প্রথারই অনুসরণ, প্রাণের নয়।

বাৎসল্যরসের দু-একটি মাত্র পদ জ্ঞানদাস লিখেছেন। তা মামুলি এবং অকৃত্রিমও নয়। লক্ষণীয় বাৎসল্যরসের স্নিগ্ধ কোমল ভাব আঁকতে গিয়ে তিনি ব্রজবুলি ব্যবহার করেছেন, অথচ ব্রজবুলিতে কোন দিনই তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল না। সখ্যরসের পদে তুলনামূলক কিছু সার্থকতা থাকলেও জ্ঞানদাসের অনুভূতির গভীর আকুলতার স্পর্শ এখানে মিলবে না। সম্ভবত সখ্যরসের স্বাভাবিক পরিকল্পনার জন্যই পদগুলি গভীরতা থেকে বঞ্চিত। জ্ঞানদাসের বাল্যলীলার পদে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ সখ্যরসের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বাধা দিয়েছে :

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন / রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন / তাহে অলি বসি করে গান।

কোথাও গোষ্ঠলীলার পদে ব্রজবধূর প্রেমভাবের উল্লেখ অসঙ্গত রসাভাসের সৃষ্টি করেছে—

যমুনা-তীরে / ধীরে চলু মাধব / মন্দ মধুর বেণু বায়। ইন্দু-বরণ / ব্রজবধূ কামিনী / স্বজন তেজিয়া বনে ধায়॥

কোথাও আবার সখা গোপবালকদের কণ্ঠে জননীর আকুলতার সুর অনৌচিত্যের সৃষ্টি করেছে :

হিয়ার কণ্টক দাগ / বয়ানে বন্ধন লাগ / মলিন হইয়াছে মুখশশী। আমা সভা তেয়াগিয়া / কোন বনে ছিলা গিয়া / তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥

আসলে সখ্য ও বাৎসল্যরসের প্রতি কবি হিসেবে জ্ঞানদাসের কোন আকর্ষণ ছিল না, তবে সখ্য ও বাৎসল্য সাধনাবেগ হিসেবে বৈষ্ণবদের কাছে অতি মূল্যবান—তাই পরিহার্য নয়। বালগোপালের ষোড়শ রূপ জ্ঞানদাসের বর্ণরূপ-সন্ধানীদৃষ্টিতে কিছু আসক্তির সঞ্চার করেছিল বলে মনে হয়। বস্তুরূপ থেকে তার বর্ণ নিষ্কাশিত করে নেবার যে শক্তি ও প্রবণতা জ্ঞানদাসের আয়ত্তা তার পরিচয় আছে এই কবিতাগুলিতে। ষোড়শ গোপালের রূপের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই, কেবল তাদের বেশভূষা দেহবর্ণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এক বর্ণপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। তবে কবিপ্রাণ বা আবেগের সঙ্গে এই দেহবর্ণ সর্ববিধ সম্পর্করহিত।

জ্ঞানদাস রাধার বাল্যলীলা বিষয়েও গুটিকয়েক কবিতা লিখেছেন। বৈষ্ণব কাব্যধারায় এ খুব স্বাভাবিক নয়, সহজলভ্য নয়। জ্ঞানদাস কি উদ্দেশ্যে এই কবিতা কটি লিখেছিলেন বলা যায় না, কিন্তু বালিকা রাধার চোখে যে রূপবিহ্বলতা তিনি কল্পনা করেছিলেন :

তাঁহার বেটায় / রূপের ছটায় / জুড়ায়ল মোর প্রাণ॥

এবং

বিজুরী উজোর / মোর অঙ্গখানি / সেই নব জলধর।

তা বয়সোচিত না হলেও তাতে জ্ঞানদাসের রাধার বিশিষ্টতার অস্পষ্ট পূর্বাভাস আছে।

বৈষ্ণব কবিরা প্রার্থনা বিষয়ক পদে আপন সাধকজীবনের কামনাবাসনার কথা প্রকাশ করেছেন। এগুলি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক নয়। চৈতন্য-পূর্ব কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতির প্রার্থনাপদে পঞ্চোপাসক হিন্দুর মনোবাসনা অভিব্যক্ত, আর চৈতন্য-পরবর্তী নরোত্তমদাসে বৃন্দাবনের সিদ্ধান্তানুযায়ী সিদ্ধ কিশোরীদেহ প্রাপ্তির কামনা, গোবিন্দদাসে গৌরাঙ্গ পাদস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা রূপায়িত। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে 'প্রার্থনা' শ্রেণীভুক্ত কবিতা নেই।

উপরের আলোচনা থেকে জ্ঞানদাসের প্রবণতার একটি স্থূল ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই কবিকে সর্বাধিক আকর্ষণ করে—এবং একমাত্র এ জাতীয় বিষয় অবলম্বনেই তাঁর কবিচিত্তের স্ফূর্তি এবং সৃষ্টির সার্থকতা। এর মধ্যেও আবার রাধার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতাই যেন কবি সব অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। কৃষ্ণের প্রেমানুভব জ্ঞানদাসের রচনায় আদৌ সার্থক হয়ে ওঠেনি। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ নৌকাবিলাস রাসলীলা মান প্রভৃতি পালায় কিছু সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে ঠিকই, কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভূতিপূর্ণ কবিতার মধ্যে পূর্ববাগের বিষয় ছাড়া জ্ঞানদাস কৃষ্ণের দিকে বড দৃষ্টিপাত করেননি। কেবল কবির মনোযোগ আকর্ষণের দিক থেকেই নয়, রচনার উৎকর্ষের দিক থেকেও কৃষ্ণপ্রণয়ের প্রকাশ খুব উচ্চস্তরেরও নয়। কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনায় গোবিন্দদাসের কবিতা সৌন্দর্য সৃষ্টির আবেগে যেমন বিশ্বরূপ সঙ্কলন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছে :

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু-তনু-জ্যোতি। / তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥ /
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ-যুগ চলই। / তাঁহা তাঁহা থলকমল দল থলই॥

জ্ঞানদাসের রচনায় তার চিহ্নমাত্র মিলবে না। তাঁর কৃষ্ণের পূর্বরাগের অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি ভাষায় লেখা। কিন্তু রাধার অধিকাংশ পূর্বরাগের পদই বাংলাভাষায়। বাংলাতেই জ্ঞানদাসের অনুভূতির স্বাভাবিক স্ফূর্তি।

কৃষ্ণের পূর্বরাগের ভাব ও ভাষা প্রথানুগত। বিদ্যাপতির পদাবলীতে কৃষ্ণের একটি প্রত্যক্ষ স্পষ্ট ভূমিকা আছে, রাজসভার পরিবেশে বর্ধিত, রুচিবৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ, নাগর-চাতুর্যে উল্লসিত এবং রাজসিক ভোগলালসায় উজ্জীবিত কৃষ্ণের দৃষ্টিতেই যেন কবি স্বয়ং রাধার রূপযৌবন দেখেছেন, তাঁর সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। জ্ঞানদাস কোন কালেই কৃষ্ণের চোখ দিয়ে জগৎসৌন্দর্য ও রাধার দেহকান্তি দেখেননি। রাধার দৃষ্টির আলোকই ছিল তাঁর কাম্যধন। তাঁর কৃষ্ণে বিদ্যাপতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মিলবে না।

জ্ঞানদাসের পদাবলী রাধার মানসিকতার যে পরিচয় বহন করে তার বিশিষ্টতা অতি স্পষ্ট। কৃষ্ণের পূর্বরাগে রাধার যে ব্যবহারাদির উল্লেখ আছে তাতে জ্ঞানদাসের

রাধাচরিত্রের সমর্থন নেই ; তার বিরুদ্ধতা আছে। যে নারী কৃষ্ণকে দেখে :

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ / হেরত না হেরত সহচরী মাঝ ॥ / বোলইতে বচন অল্প অবগাই। / হাসত না হাসত মুখ মচুকাই ॥ /

সে জ্ঞানদাসের রাধিকা নয়। এই ব্রীড়া ও তৃষ্ণা বিজড়িত, প্রথম যৌবনের অর্ধস্ফুট চেতনা মিশ্রিত চাঞ্চল্য বিদ্যাপতির রাধার পরিচয় হতে পারে। জ্ঞানদাসের রাধা কৃষ্ণকে দেখে রূপাস্বাদের অতি গভীর উপলব্ধিতে আত্মস্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হয়ে বলে, 'তিমিরে গরাসিল মোরে'—তাই সে অন্য রাজ্যের অধিবাসী; কৃষ্ণের দর্শনে প্রথম যৌবনের দেহলাবণ্যের এই সচেতন ভঙ্গি তার পক্ষে সম্ভব নয় :

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল। / অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল ॥ / পাশ উপাসল পালটি নেহারী। / তাহি চলল মন বাহু পসারি /···/ কেশ বিথারল পিঠহি লোল। মাথ আধ পর রহল নিচোল ॥ / পহিরণ পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ। / তব ধরি নয়ানে রহল কিয়ে ধন্দ ॥

এই ভাবানুভূতি এবং ভাষাভঙ্গি সম্ভবত বিদ্যাপতির প্রত্যক্ষ অনুসরণেরই ফল, আপন স্বতন্ত্র উপলব্ধিজাত নয়।

জ্ঞানদাস বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন পূর্বরাগ ও অনুরাগ—বিশেষ করে আক্ষেপানুরাগের পদে এবং এই উভয়বিধ কবিতায়ই রাধার অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। জগৎ এবং জীবনকে, প্রেমের অনুভূতিকে—তার বেদনা ও চিত্তচাঞ্চল্যকে কবি রাধার দৃষ্টিতেই দেখেছেন, কৃষ্ণের দৃষ্টিতে নয়। চণ্ডীদাসের রাধার মতো জ্ঞানদাসের রাধাও অনেকখানি কবির আন্তরসত্তারই প্রতিফলন। আপন-সৃষ্ট রাধিকার সঙ্গে জ্ঞানদাস প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছেন ; তাই রাধারই বেদনায় কবির হৃদয়ের সব কটি তারে ঝঙ্কার উঠেছে। এই অর্থেই জ্ঞানদাস লিরিক কবি। লিরিক কবি আপন ব্যক্তিসত্তার দেখার রঙে সব কিছুকে রঞ্জিত করে। জ্ঞানদাস রাধার মধ্য দিয়ে আপনার দেখা দেখেছেন এবং রাধার ভালোবাসায় আপন মনের রঙ লাগিয়েছেন।

জ্ঞানদাসের উপরে চণ্ডীদাসের যে প্রভাবের কথা বলা হয়ে থাকে তার ভিত্তিও এখানেই। উভয়ের প্রেমদৃষ্টির মধ্যেই অতলস্পর্শী গভীরতা আছে,—এই গভীরতা রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা তো বটেই, কবিদের নিজেদেরও হৃদয়-বিদীর্ণকারী বেদনা।

পাঁচ

রাধার প্রেম উপলব্ধি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুযায়ী যে স্তরপরম্পরার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তার সর্বত্র জ্ঞানদাস সমান আকর্ষণ অনুভব করেননি। দানলীলা, নৌকা-বিলাস, রাসলীলা পর্যায়ের পদগুলি গীতাত্মক স্বতন্ত্র কবিতা নয়, একটি কাহিনীর সূত্রে

তারা আবদ্ধ। জ্ঞানদাসের কবিআত্মার বস্তু-উর্দ্ধ প্রবণতা যে এ জাতীয় পালাগান রচনায় দক্ষতা দেখাবে না তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিশুদ্ধ গীতিপ্রেরণাময় অভিসার ও মাথুর পর্যায়ের কবিতা রচনায় জ্ঞানদাসের উৎসাহের অভাব এবং রচনাগত অপকর্ষ পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করে। মান পর্যায়ের কবিতায় কোন কবিই বিশেষ সার্থকতা দেখাতে পারেননি। কারণ এর মধ্য দিয়ে প্রেম-উপলব্ধির কোন গভীর লোক, কোন রহস্যময়তা প্রকাশিত হবার নয়। এর লীলাচাঞ্চল্য বহিরাঙ্গিক প্রসাধনকলার কবিদের যদিবা কিছুটা উদ্বুদ্ধ করতে পারে, হৃদয়ের গভীর মহলে পরিভ্রমণশীল কবিদের আদৌ তা পারে না। কিন্তু অভিসার বা মাথুরের পরিকল্পনার মধ্যেই এমন একটা চমৎকারিত্ব ও ভাবগভীরতার সম্ভাবনা আছে যে এ ধরনের কবিতায় জ্ঞানদাসের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান না করলে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিচয় অনেকখানিই অজ্ঞাত থেকে যায়।

জ্ঞানদাসের রাধা ধ্যানময়ী। আপন উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করে সে আত্মহারা। অবস্থানগত বাস্তব দূরত্বের সমস্যা তাঁর কাছে গুরুত্বহীন। এই দূরত্ব নিরসনের জন্য অভিসার-গমনের তাই প্রশ্ন উঠে না। নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে থেকেও দুটি দেহ-মন-আত্মা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় না কেন এই ভাবনাই যার ট্রাজেডি চেতনার মূলে সে বহুপূর্বে অভিসারের স্তর অতিক্রম করে গেছে। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের অভিসারের কবিতায় রূপচিত্রের যে নিটোল দ্যুতি বা প্রেমাকুতির যে গভীর অভিব্যক্তি সেই প্রসাধনকলা বা সাধনাবেগ উভয় থেকেই জ্ঞানদাসের অভিসারের কবিতা বঞ্চিত। যে মুষ্টিমেয় অভিসার-পর্যায়ের কবিতা তিনি লিখেছেন তাতেও প্রকৃতির উপযুক্ত ভাবপরিবেশে অভিসারের বিশিষ্ট রসাবেদন ফোটাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন :

> মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার। / ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার ॥ / ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি। / নীলবসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি ॥ / দুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল। / নব অনুরাগভরে চলি গেল ॥ /

অন্ধকার ঝড়ের রাত্রিতে প্রিয়মিলনের অভিসারে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের রহস্য ও রোমাঞ্চ জ্ঞানদাসের কবিকল্পনায় ধরা পড়েনি। এই পিচ্ছিল পথে গতাগতির যে দুঃসহ কঠোরতা 'দুই চারী সহচরী সঙ্গহি' নিলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

ঠিক একই কারণে মাথুরের দীর্ঘ বিরহও তাঁর রাধার কণ্ঠে অতি উচ্চ ও তীব্র আর্তনাদ জাগাতে পারেনি। দুঃখবাদী কবি জ্ঞানদাসের চিরন্তন দুঃখ। মিলনেও দুঃখের বেদনা। কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। মথুরা গমনের আকস্মিক ঘটনায় বিদ্যাপতি-শেখরের কবিতায় যে বুকফাটা আর্তনাদ ভাষাবন্ধনকেও ভেদ করেছে তা জ্ঞানদাসে নেই। জ্ঞানদাসের ক্রন্দন দীর্ঘস্থায়ী, শিকড়ের মতো চিত্তের অন্তঃস্তলে শাখা-প্রশাখা নামিয়ে দিয়ে তাকে নীরবে ঝাঁঝরা করে ফেলে, আকাশের ঝড়-বিদ্যুৎকে টেনে এনে সশব্দে বিদীর্ণ হয় না। তাই

আক্ষেপানুরাগেই জ্ঞানদাসের রাধার বেদনা অন্তরশায়ী, মাথুর বিরহে নয়।

ছয়

জ্ঞানদাসের রাধার দুই রূপ। পূর্বরাগে রূপতন্ময় বালিকার ভাব-ব্যাকুলতা, অনুরাগে পরিণত প্রেমের কাছে আপনাকে নিঃশেষ করে আত্মনিবেদন। পূর্বরাগের রাধা গানে গানে কৃষ্ণের দেহরূপের বর্ণনা করেনি, আপন সৌন্দর্যচেতনার তরঙ্গকম্পনে তাকে আন্দোলিত করেছে। প্রসঙ্গত চণ্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের পার্থক্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রয়োজন।

চণ্ডীদাস অরূপলোকের অনুভূতির ব্যাকুলতায় আকণ্ঠ-নিমজ্জিত। রূপজগতের পাত্রে অরূপের বেদনা ও ব্যঞ্জনার সমারোহ জ্ঞানদাসের কবিতায়। চণ্ডীদাস বস্তু বা ভাবের সামান্য একটু ইঙ্গিতেই হৃদয়ার্তির অতি গভীর স্তরে অবতরণ করতে পারেন। তাই রূপাঙ্কনের দিকে চণ্ডীদাসের যেন কোন আকর্ষণই নেই। জ্ঞানদাস হৃদয়ার্তিকে রূপ-চিত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত করে দেন। ভাবের বর্ণে বস্তুর ছবি আঁকেন, সে ছবির রেখা অরূপের আকুল তৃষ্ণায়, অস্পষ্টতায় কুহেলিঘেরা রহস্যরাজ্যে বিলীন হয়ে যায়। চণ্ডীদাস শ্যামের নামটি শুনে ঐ শব্দোচ্চারণের ধ্বনিটুকুকে মাত্র অবলম্বন করে বিচিত্র ভাব-ভাবনায় রাধার অন্তরলোক ভরে দেন। আকাশের জলভরা মেঘে, ময়ূরের গ্রীবাদেশের বর্ণবিচ্ছুরণে অথবা আপন কালো কেশের নিবিড় ব্যাকুলতায় কৃষ্ণরূপের সন্ধান পান। জ্ঞানদাস কৃষ্ণরূপ বর্ণনায় রাধার অনুভূতির যে ভাষারূপ দিয়েছেন :

> চিকণ কালিয়ারূপ মরমে লাগিয়াছে / ধরনে না যায় মোর হিয়া / কত চাঁদ নিঙারিয়া মুখানি মাজিয়াছে / না জানি তায় কত সুধা দিয়া।

অথবা

> দেইখ্যা আইলাম তারে সই / দেইখ্যা আইলাম তারে / এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।

বস্তুবোধের দিক থেকে যে রূপ নয়নে ধরে না, নয়নের পাত্র উপছে পড়ে যায় তা অর্থহীন হলেও জ্ঞানদাসের রূপচিত্রণ এই অর্থাতীতের রাজ্যেই পরিক্রমা করে। রাধা বলে :

> আলো মুঞি জানো না জানো না / জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে। / চিত মোর হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে॥ / রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল। / যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

রূপের সরোবরে দর্শনেন্দ্রিয়ের ডুবে যাওয়া, যৌবনের বনে মন হারিয়ে যাওয়া চিত্র হিসেবে খুব অস্পষ্ট বলেই জ্ঞানদাসের ভাবাকুলতাকে পরিপূর্ণ ধরে রেখেছে। উপমারূপকাদি অলঙ্করণের সীমা অতিক্রম করে কবির রূপচিত্রণ এখানে চিত্রকল্পের স্তরে সমুন্নীত। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের অলঙ্কারকেন্দ্রিক চিত্রণপদ্ধতি অন্তরূপ মানস-

প্রবণতার দ্যোতক। রেখা-রঙ-আকৃতি সমন্বিত বস্তুবিশ্বের রূপ, ধ্বনি-সঙ্গীত, স্পর্শাকৃতি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর রূপনির্মাণে তাদের দোসর সে যুগের বাংলা কবিতায় নেই। কখনো কখনো তাঁদের চিত্ররচনা মননের স্পর্শে বা বাক্‌চাতুর্যে কিছু বক্রতা পেলেও রূপাতীতের রাজ্যে বড় অভিযান করে না। জ্ঞানদাস কিন্তু রূপবর্ণনা করতে গিয়ে একটি কথা বলেই শেষ করেন :

যত রূপ / তত বেশ / ভাবিতে পাঞর শেষ।

অথবা কৃষ্ণের রূপ দেখে রাধা যে জল না ভরেই ফিরে এসেছিল, বাড়ি ফিরে তার সমস্ত গৃহকর্ম এলিয়ে পড়েছিল এই খবরটুকু দিয়েই তার ভাষা ফুরিয়ে যায়, রূপবর্ণনা আর হয় না। খুব বেশি হলে রাধা বলে :

তিমিরে গরাসিল মোরে।

স্বভাবতই এর পরে বলবার আর কি আছে ? সমস্ত কথার এখানে শেষ। এর পরে কেবলই উপলব্ধির সোপানে গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে অবতরণ।

জ্ঞানদাসে অলঙ্কারের ব্যবহার নেই এমন নয়, রূপের বস্তুবিদ্ধ ছবিও মাঝে মাঝে কিছু আছে। কিন্তু একান্ত লৌকিক, কিছু বা গ্রাম্য দু-একটি শব্দের ব্যবহারে, রূপদর্শনজাত মানস-হিল্লোল ব্যক্ত করায়, বিস্ময়রসে ডুবে যাওয়ার ব্যঞ্জনায় তাঁর ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত। রূপ কম, রূপাস্বাদই প্রধান।

অনুরাগের কবিতায় জ্ঞানদাসের রাধায় চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদন পর্যায়ের কবিতার কিছুটা প্রভাব আছে। এই কবিতাগুলিতে জ্ঞানদাস যেন রূপাস্বাদের কল্পনা-স্বর্গ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। সেখানে সামাজিক সুনাম-দুর্নামের প্রশ্ন, কুলকলঙ্কের বিড়ম্বনা, সাংসারিক বিচিত্র আকর্ষণ এক জটিল আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেছে। রাধার যে মূর্তি এখানে কবি এঁকেছেন তাতে প্রেমের অনুভূতি আরও গভীর হয়েছে। পূর্বরাগে যা ছিল রূপদর্শনের বিস্ময়, অনুরাগে মিলনের কামনায় এবং বিরহের বেদনায় তা গভীর হয়ে উঠেছে। বিস্ময়ের অপরিচয় নেই, কিন্তু চিনে চিনেও কূল না পাবার বিমূঢ়তা আছে।

রাধার অনুরাগের মধ্যে আক্ষেপ-বেদনার যে উচ্ছ্বাস তার কিছু কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে এবং কিছু কারণ অনির্দেশ্য। প্রথমত, সমাজ ও কুলধর্মের বন্ধন কৃষ্ণ-মিলনে বাধার সৃষ্টি করে। রাধা বলে :

কাঁদিতে না পাই বঁধু, কাঁদিতে না পাই। / নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদ মুখ চাই॥ /
শাশুড়ী ননদী কথা সহিতে না পারি।···

অথবা

গুরুজন জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।

এই বাধাটি বাস্তব ও সামাজিক। রাধার পরকীয়া প্রেমের মহিমা এই পঙক্তিগুলিতে জীবন্ত।

রাধার আক্ষেপ-বেদনার দ্বিতীয় কারণ 'তোমার নিঠুরপণা সোঙরিয়া মরি।'

জ্ঞানদাসের প্রেমকবিতায় কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কোন বস্তুগত প্রমাণ নেই। অন্য নারীর প্রতি তার কিঞ্চিৎ আসক্তির ফলে 'মান' পর্যায়ের কল্পনা করেছেন বৈষ্ণব কবিরা। এগুলি আদৌ সে পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। খণ্ডিতা নায়িকার অভিমান-বোধ অপেক্ষা অনুরাগের বেদনা অনেক গভীর। গ্রাম্য বধূদের লম্পট পুরুষকর্তৃক বঞ্চিত হবার সামাজিক বেদনা এখানে সঙ্গীতরূপ নিয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন। তবে এই গানগুলিতে ঘৃণার ভাব আদৌ চোখে পড়ে না এবং ভৎর্সনাও খুব তীব্র নয়।

মনে হয় জ্ঞানদাসের রাধার এই বেদনা তাঁর অতি প্রবল রূপোল্লাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। রূপের যে তীব্র অনুভূতি পূর্বরাগের রাধাকে বিস্ময়ে ডুবিয়েছিল এখানে তাই ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির পথ ধরে রূপ-রস-গুণ-স্পর্শের মূর্তিমান বিগ্রহ কৃষ্ণকে পরিপূর্ণভাবে নিজের করে নেবার—দ্বৈতকে অদ্বৈতে রূপান্তরিত করবার—অতি-ব্যাকুল কামনারূপে প্রকাশ পেয়েছে :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।/ প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥ / হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।/পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ / সই লো কি আর বলিব। / যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব॥ / রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে। / বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে॥ / দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা। / দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥

মুহূর্তমাত্র কৃষ্ণকে না দেখলে তার 'এ ঘর বসতি অনলের খনি' বলে মনে হয়। চরম মিলন-মুহূর্তেও যেন অতৃপ্তি জড়িয়ে থাকে। আরও গভীর মিলন—একেবারে অচ্ছেদ্য একাত্মতা ঘটল না কেন—এই জিজ্ঞাসা এবং আকূতি জ্ঞানদাসের 'সম্ভোগ-মিলন' পর্যায়ের কবিতাগুলিকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে :

হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোওয়ায়। / বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥ / নিদ্রার আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে। / কি ভেল কি ভেল বলি চমকে উঠিয়ে॥/ হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে। / নাসিকায় নাসিকায় এক নয়ানে নয়ানে॥

দুটি দেহের পার্থক্যকে বিলুপ্ত করে দেবার এ-স্বপ্ন-সাধনা জ্ঞানদাস ব্যতীত পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক অপরের সম্ভোগ-মিলনের কবিতায় মেলে না। মিলন মুহূর্তে :

হিয়ায় হিয়ায় / লাগিবে বলিয়া / চন্দন না মাখে অঙ্গে।

চন্দনের বাধাও সহ্য হয় না। কারণ—

শিশুকাল হৈতে / বন্ধুর সহিতে / পরাণে পরাণ লেহা। / না জানি কি লাগি / কো বিহি গড়ল / ভিন ভিন করি দেহা।

এই তো বেদনা, এই তো ক্রন্দন! আত্মায় তো বাধা নেই, দেহের এ বাধা কি করে ঘুচবে? কিন্তু এ-ও তো কল্পনা। দুই আত্মার সম্পূর্ণ মিলন কবে কোথায় হয়েছে?

কিন্তু এ কামনা তো চরিতার্থ হবার নয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির আনন্দে—প্রাণমনের গভীর মিলনে ইন্দ্রিয়ই বাধা হল কেন? দুটি পৃথক ব্যক্তিত্ব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের নির্বস্তুক অনুভূতিমাত্রের পথ দিয়ে কখনো একাকার হয়ে যেতে পারে না। তীব্র

sensuous অনুভূতির কবিদের রচনায় তাই এক জাতীয় একাকীত্বের বেদনা ধ্বনিত হয়। মনে হয় ইন্দ্রিয়গুলিই বুঝি বাধা। দেহ থেকে রূপটুকু, অঙ্গ থেকে স্পর্শটুকু, ব্যক্তিত্ব থেকে গুণটুকু ছেঁকে নিয়ে যে স্বাদের কল্পনা তার জন্য প্রয়োজন বুঝি সকল ইন্দ্রিয়-বন্ধের টুটে ফুটে যাওয়া। কিন্তু তা ঘটে না, আর ঘটে না বলেই এত ক্রন্দন। সমস্ত ভালোবাসা তাই মায়া বলে মনে হয়। দীর্ঘকালের চিত্ত-বিনোদন ব্যর্থ বলে ধারণা জাগে। রাধা বলে :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু / অনলে পুড়িয়া গেল।

এখানেই জ্ঞানদাসের প্রেমদর্শনে দুঃখবাদ।

৪ ৭ গোবিন্দদাস

এক

মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে রূপসিদ্ধ বলে গোবিন্দদাসের খ্যাতি আছে। ভক্তির আকুলতাকে রচনার সৌকর্যের সঙ্গে দ্বিধাহীন সম্বন্ধে আবদ্ধ না করলে কবিতার সার্থক রসাবেদনের রাজ্যে তার স্থান হয় না—এ বোধ গোবিন্দদাসের ছিল। বেশি বয়সে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশের ফলেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয়, কিন্তু তাঁর কাব্য-চেতনার তীক্ষ্ণতা ধর্মবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি। তাই কবি আপন ধর্মোপলব্ধির প্রকাশকেই কাব্যসৃষ্টির চরম আদর্শ বলে মনে করেননি। রূপ-রচনার দিকে সচেতন প্রবণতা, অলঙ্করণের অতন্দ্র নিষ্ঠা এই মনোবৃত্তি থেকেই জন্ম নিয়েছে। অল্প পূর্ববর্তী কবি জ্ঞানদাসের স্খলিতবাক্, শিথিলদেহ পদ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি, চণ্ডীদাসের [যদি আদৌ তাঁর কবিতার সঙ্গে গোবিন্দদাসের পরিচয় থাকে] অতি গভীর অনুভূতির অতি সরল এবং অনলংকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করার মানসিকতাও গোবিন্দদাসের ছিল না।

জ্ঞানদাসের কবিতার রূপরচনার প্রধান ত্রুটি হল উপলব্ধির গভীর প্রদেশ থেকে উৎসারিত দু চারটি বাক্যের অলঙ্কারহীন সরল আকুলতার পরেই অতি সাধারণ পংক্তির মামুলি ভাব-বিন্যাস :

দেইখ্যা আইলাম তারে— / সই দেইখ্যা আইলাম তারে। / এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে।

হৃদয়ার্তি জাত এই বাণী-বিপর্যয়েই এর সৌন্দর্য। পরবর্তী পংক্তিগুলিতে এর অনুসরণ মাঝে মাঝেই বাধা পেয়েছে। আবার—'আলো মুঞি জানো না' কবিতারও প্রথমের পঙক্তিগুলির ব্যাকুলতার উঁচু সুর পরে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। সাধারণভাবে বিদ্যুৎচমকের মতো উপলব্ধির গভীর আকুলতা প্রকাশ এবং নিপুণ রূপকর্ম সম্বন্ধে আদ্যন্ত অতন্দ্র দৃষ্টির অভাব—জ্ঞানদাসের পদাবলীর একটি বড় লক্ষণ।

গোবিন্দদাসের রূপ-সচেতন কবি-চিত্ত জ্ঞানদাসের কাব্যলক্ষণের এই দুটি

বিশিষ্টতার কোনটিরই পক্ষপাতী ছিল না।

আবার চণ্ডীদাসের কবিতার পূর্বসূরিত্বের দিকেও তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয়নি। চণ্ডীদাসের ভাবগভীরতা রূপনির্মিতিতে যথেষ্ট সার্থক হয়নি এমন মন্তব্য একালের সমালোচকেরাও করে থাকেন। মন্তব্যটির গ্রহণযোগ্য নয়। চণ্ডীদাসের কবিতার রূপনির্মিতিকে পৃথক করে চেনা যায় না। ভাষা এত সরল, ছন্দ এত সাধারণ, অলঙ্করণের এত স্বল্পতা যে মনে হয় কবি আদৌ রূপসচেতন নন। কিন্তু কবির অন্তরানুভূতির বিশিষ্ট সারল্য ও গভীরতার রাজ্য থেকেই এই ভাষা-ছন্দ শব্দের জন্ম তাতে সন্দেহ থাকে না। চণ্ডীদাসের কাব্যদেহের মার্জনা বিশ্বসৃষ্টির কৌশলের মতো। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায় বিশ্বলক্ষ্মীর মতোই এঁরও রান্নাঘর ও ভাঁড়ার দৃষ্টির অন্তরালেই থাকে। গোবিন্দদাসও তাই চণ্ডীদাসকে পরিত্যাগ করেছেন ঐ গভীর অনুভূতি তাঁর অনায়ত্ত বলে এবং চণ্ডীদাস তাঁর দৃষ্টিতে যথেষ্ট রূপদক্ষ নন বলে।

পূর্বসূরী হিসেবে গোবিন্দদাস তাই বিদ্যাপতি এবং জয়দেবের দিকে তাকিয়েছেন। জয়দেবের কান্তকোমল পদাবলীর বিশেষ করে সঙ্গীতরসটি এবং বিদ্যাপতির চিত্রধর্ম তথা আলঙ্কারিকতা তিনি অনুসরণীয় বলে মনে করেছেন। রূপদক্ষ কবি গোবিন্দদাস প্রথমাবধি সাহিত্যের এই দুটি প্রধান উপকরণকে চিনে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে—চিত্র এবং সংগীত। কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়' এই এক কথায় বলরামদাস কী না বলিয়াছেন। ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে। দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তিলাভ করিয়াছে। এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থবিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে-কথাটা যৎসামান্য এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।"—[সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্য]।

দুই

বিদ্যাপতির কবিতায় চিত্রধর্ম এবং মননশীলতার বাহুল্য। সংগীতের ললিত রেশ সেখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি। তাই সাধারণভাবে বিদ্যাপতি-পন্থী গোবিন্দদাস জয়দেবের অনুসরণে সুরকে যুক্ত করেছেন চিত্রের সঙ্গে। গোবিন্দদাস-কৃত একটি সংস্কৃত কবিতা যেন এই প্রভাবের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হয়ে আছে:

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজকলিতং/ব্রজবণিতা-কুচকুঙ্কুমললিতম্ ।/বন্দে গিরিবরধরপদকমলং,/

কমলাকমলাঙ্কিতমমলম্ ॥ / মঞ্জুল মণিনূপুররমণীয়ং / অচপলকুলরমণী কমনীয়ম্ ।
অতিলোহিতমতি রোহিতভাষং / মধু মধুপীকৃত—গোবিন্দদাসম্ ॥

জয়দেবের কবিতার সঙ্গে পরিচিত পাঠকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না, কার লেখার উপরে গোবিন্দদাস মক্স করেছেন। কিন্তু সংগীতধর্মের ব্যাপারে জয়দেবের কাছে ঋণ গোবিন্দদাসের থাকলেও তা পাঠগ্রহণের স্তরেই সীমাবদ্ধ। জয়দেবসুলভ অতি ইন্দ্রিয়ালুতা, কিছুমাত্র কাঠিন্যহীন 'ললিতগীত কলিতকল্লোল' গোবিন্দদাসের সংগীতধর্মের বৈশিষ্ট্য নয়। গোবিন্দদাসে যুক্তবর্ণের বাহুল্য, অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার এবং দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ সুপ্রচুর। "গোবিন্দদাসের রচনাকে কোথাও কোথাও ইহা ভারাক্রান্ত করিয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও উদাত্ত-অনুদাত্ত মৃদঙ্গধ্বনি-বৈচিত্র্যে বিষয়বস্তুকে তথা ভাববস্তুকে ইহা মহনীয়ই করিয়া তুলিয়াছে—'স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব-কদম্ব' বা 'ত্রিভুবন মণ্ডন কলিযুগ-কালভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে' ইহার উদাহরণ।" [শ্যামাপদ চক্রবর্তী : বৈষ্ণবপদাবলীর ভূমিকা।] গোবিন্দদাস জয়দেবের সংগীতটুকুই মাত্র গ্রহণ করেছেন, তারল্য নয়। গোবিন্দদাসের সংগীতে গাম্ভীর্য আছে।

গোবিন্দদাসের কবিতায় সংগীতোপকরণটিকে আধুনিক অর্থে গীতিধর্ম বলে মনে করার কোন কারণ নেই। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের মতো গীতিপ্রাণতা তাঁর কবিচিত্তের কোন ধাতু নয়। বস্তু-অতীত ভাবলোকের দিকে তাঁর রূপরচনা আমাদের নিয়ে যায় না। বস্তুরূপকে ছেঁকে কোন রস নিষ্কাষণের [জ্ঞানদাস-সুলভ] চেষ্টাও তাঁর চিত্র-গুলিতে অনুপস্থিত। অস্পষ্টতার ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যরাজ্যের দিকে আদৌ তাঁর প্রবণতা নেই। আবার কাব্যরাজ্যের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে আপন চিত্তলোকের অন্বয় সম্বন্ধও তিনি আবিষ্কার করেন না। তাই কোন অর্থেই তাঁকে গীতিকবি [আধুনিক রীতির] বলা চলে না। তাঁর কবিতার সংগীতরস স্থিরচিত্রকে গতিময় করে তুলবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত। চিত্রাত্মক শব্দের বস্তুভার আছে, কারণ তারা অর্থপ্রাণ। বিশেষত যুক্তাক্ষর ব্যবহার এর ভার বাড়িয়েছে। সংগীতপ্রবাহটি এদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং ভাসমান তরঙ্গোদ্বেলতা পাঠকচিত্তে আঘাত করে রসনিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করা যায় :

১. নন্দনন্দন চন্দ্রচন্দন / গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ। / জলদ সুন্দর কম্বুকন্ধর / নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥

২. তনু ঘনগঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন। / কঞ্জনয়নী নয়ন ললিতাঞ্জন ॥ / নন্দ সুনন্দন ভুবন আনন্দন। / নাগরী নারী-হৃদয়ঘন চন্দন ॥

৩. কুসুমিত কুঞ্জ কল্পতরু কানন / মণিময় মন্দির মাঝ। / রাসবিলাস কলা উৎকণ্ঠিত / মনমোহন নটরাজ ॥

এ কবিতাগুলিতে যে সংগীত বিদ্যমান তা চিত্রের বাহনমাত্র, প্রাণ নয়।

তিন

গোবিন্দদাস মূলত চিত্ররসের কবি। ভক্তির আবেগআকুলতা চিত্ররূপে সংহত হয়েছে, অথবা বলা যায় বস্তু ও চিত্রের যে দূরত্ব, ভক্তি ও কাব্যের মধ্যেও সেই দূরত্বের সীমা টেনে কবি সাহিত্যিক সাফল্যলাভ করতে চেয়েছেন। এ তাঁর শিল্প-চেতনারই প্রমাণ। সংগীত যেমন তাঁর কবিতায় চিত্রের বাহন, তেমনি নাট্যরসও চিত্র-সৌন্দর্যের সহায়ক হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ। কোন স্বতন্ত্র স্বাদে তার মূল্য নয়।

গোবিন্দদাসের চিত্র বস্তুলোকের—চিত্তলোকের নয়। হৃদয়ানুভূতির গভীর আর্তি সহযোগে রচিত চিত্র তারা নয়। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসে তাদের প্রাচুর্য, বিদ্যাপতিতেও অভাব নেই। কিন্তু গোবিন্দদাসের কবিমন অন্য লোকের অধিবাসী। দেহরূপ, গতিভঙ্গি, বস্তুবিশ্ব ও প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনেই তাঁর সার্থকতা। যেসব পর্যায়ের কবিতায় এই চিত্ররসের সম্ভাবনা নেই তার প্রতি গোবিন্দদাসের কবিচিত্তের আসক্তি সর্বাপেক্ষা অল্প। তাই রূপানুরাগের পদে তাঁর কিছু অবদান আছে, কিন্তু আক্ষেপানুরাগে নেই, অভিসারে আছে কিন্তু মাথুরে নেই। অভিসার ও রাসের প্রকৃতি কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে, আর বিষয়বস্তুর স্বাভাবিক ঘটমানতা এর চিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। মাথুর ও আক্ষেপানুরাগে কেবলই হৃদয়ের আর্তি। তার ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশের ভাষা গোবিন্দদাসের নেই।

চিত্রসৃষ্টির নানা পদ্ধতির মধ্যে দুটিই প্রধান। প্রত্যক্ষচিত্র ও অলঙ্কারপ্রাণ চিত্র। চণ্ডীদাস যখন বলেন—'একদিঠ করি ময়ুর ময়ুরী কণ্ঠ করে নিরিক্ষণ' তখন প্রত্যক্ষ-ভাবেই চিত্ররস আস্বাদ করা যায়। কিন্তু গোবিন্দদাস যখন বলেন—'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব'—তখন অলঙ্কার বিশ্লেষণের সাহায্যে এর চিত্ররস আস্বাদ করতে হয়। যদিও গোবিন্দদাস উভয়শ্রেণীর চিত্ররচনায় দক্ষ।

প্রথমেই আসে আলঙ্কারিক পদ্ধতির কথা। এই পদ্ধতিতে কবি সাধারণভাবে প্রাচীন সংস্কৃত কবিকুল এবং বিশেষভাবে বিদ্যাপতির কাছে ঋণী। অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য প্রধানত মৌলিকতায়। অভিনবত্বে এর প্রাণ। যে উপমা বহু ব্যবহারে জীর্ণ চিত্ররচনায় তার সীমাবদ্ধ সার্থকতা। তবে পুরানো অলঙ্কারও কবিদৃষ্টির বিশিষ্ট বর্ণসম্পাতে রঞ্জিত হলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বিন্যাসের গুণে কখনো কখনো জীর্ণ উপমাদিও নতুনের স্বাদ নিয়ে আসে। গোবিন্দদাসের চিত্রকেন্দ্রিক অলঙ্কারগুলি বহুক্ষেত্রে অতীতের অনুবর্তন মাত্র হলেও অনেকসময়ে আবার অভিনবও। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে :

১. যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি। / তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥ / যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই। / তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ॥

২. যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙ বিলোল। / তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥

৩. চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্কর / ভকত ভ্রমরগণ ভোর।

৪. নীল অলকাকুল / অলিকে হিলোলত / নীল তিমিরে চলু গোই। / নীল

নলিনী জনু / শ্যামর সায়রে / লখই না পারই কোই ॥

৫. হেরইতে হামারি / সজল দিঠি-পঙ্কজ / তুহুঁ পাতুক করি নেল।

তৃতীয় উদাহরণটিতে পায়ের সঙ্গে পদ্ম এবং সহচর ভক্তদের সঙ্গে ভ্রমরের তুলনা করা হয়েছে। বস্তু সঞ্চয়েও যেমন নবীনতা নেই তেমনি উপস্থাপনেও বিশিষ্টতার অভাব। রূপ-সচেতন কবি শব্দানুপ্রাসের ধ্বনিসৌকর্যে চিত্রের দুর্বলতাকে অতি যত্নে আবৃত করেছেন এখানে। প্রথম উদাহরণটির তুলনাত্মক বস্তুগুলিও বহুব্যবহৃত। দেহজ্যোতির সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের, পায়ের সঙ্গে পদ্মের তুলনা আমাদের কাব্যে একটু মাত্রাতিরিক্ত প্রাচুর্য পেয়েছে। কিন্তু বাচনের বিশিষ্টতায় অতিপরিচিত এবং জীর্ণ বস্তুও নতুন রসসৌন্দর্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। রাধার দেহজ্যোতি যেখানে পড়ছে সেখানেই যেন চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ, যেখানে সে ফেলছে পদযুগল সেখানেই ফুটে উঠছে স্থলকমল। কেবল বলার ভঙ্গিতে সাধারণ উপমা-উৎপেক্ষার বস্তু একটি অভিনব ভাবের বাহন হয়েছে এখানে। বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী যেন এই রাধিকা। তারই দেহের জ্যোতি নিয়ে আকাশের বিদ্যুতে এত দীপ্তি, পদপাতের সৌন্দর্য নিয়ে স্থল-কমলের এত পেলবতা। অবশ্য বিদ্যাপতির 'যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই' কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে পড়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে গতিভঙ্গির সঙ্গে কালিন্দী নদীর তরঙ্গহিল্লোলের তুলনা বস্তুচেতনার দিক থেকেই অভিনব। বিদ্যাপতির 'যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই' কবিতার প্রভাব গোবিন্দদাসের আলোচ্য কবিতাটিতে থাকলেও এই পঙক্তিগুলি বিদ্যাপতিতে নেই, গোবিন্দদাসের নিজস্ব সৌন্দর্যচেতনার ফল হিসেবেই এই পঙক্তিদ্বয় গ্রাহ্য। রাধিকার মন্থর গতির ছন্দময়তাই কেবল নয়, যৌবন ভারাবনতা ভাবটিও এই তুলনার দ্বারা বিদ্ধ হয়েছে। চতুর্থ উদাহরণটিতে কল্পনার বিশিষ্টতা সাধারণকে আশ্চর্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। অতিপরিচিত বস্তুর সম্পর্ক একটি অভিনব চিত্ররস সৃষ্টি করেছে। কৃষ্ণবর্ণ সরোবরে নীলপদ্মের অবস্থিতি যেমন লক্ষ্য করা যায় না তেমনি অন্ধকার রাত্রে আকুল কৃষ্ণ কেশে অঙ্গ আবৃত করে রাধার অভিসারও দুর্লক্ষ্য। কালো রঙে ছবি আঁকা সবচেয়ে দুরূহ। শিক্ষার্থী পরিণতির অনেক ধাপ না এগোলে নাকি কালো দিয়ে তাকে ছবি আঁকতে দেওয়া হত না কোন কোন দেশে। ভাষাচিত্র অঙ্কনে গোবিন্দদাস শিক্ষার্থী নন, পরিণত শিল্পী। কালো রঙের অল্পাধিক গাঢ়তার অতি নিপুণ ব্যবহারে এখানে এক সার্থক চিত্র এঁকেছেন গোবিন্দদাস। পঞ্চম উদাহরণে চোখের সঙ্গে পদ্মের যে তুলনাটি আছে তা মামুলি এবং চিত্ররচনায় কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই তার নেই। তপ্ত পথে চলেছে রাধা। কৃষ্ণের প্রীতির সজল দৃষ্টি যেন তার পায়ে পঙ্কজের পাদুকা পরিয়ে দিল। চিত্রটির সৌন্দর্য কবির কল্পনার বৈচিত্র্যে। দৃষ্টি ও পদ্মের তুলনা এখানে একান্ত গৌণ।

আলঙ্কারিক চিত্ররচনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব অবিমিশ্র না হলেও প্রশংসা দাবি করতে পারে। আবার অলঙ্কারের সাহায্য না নিয়ে গোবিন্দদাস যখন ছবি এঁকেছেন, তখনও কম সাফল্য আসে নি।

'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।'—এই পঙ্‌ক্তিতে সৌন্দর্য কোমল তরল রূপ ধারণ করেছে কেবল শব্দচয়ন ও বাক্যবয়নের গুণে। কঠিন দেহরূপ বিগলিত হয়ে মাটিতে গড়িয়ে যাচ্ছে এই ভাবনা এবং সেই ভাবনার উপযোগী রূপরচনা গোবিন্দদাসের এক অক্ষয় কীর্তি। চৈতন্যদেবের ভাবোন্মত্ত রূপাঙ্কনেও কবি উভয় পদ্ধতিরই প্রয়োগ করেছেন। তাঁর দুই চোখকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করায় অসীম আকাশের দ্যোতনা এসেছে, ভাব-রোমাঞ্চকে কদম্ববিকাশের সঙ্গে তুলনা করায়ও চিত্রসৌন্দর্যের হানি ঘটেনি বস্তুবোধের তীক্ষ্ণতায়। কিন্তু স্বর্ণ-কল্পতরুর সঙ্গে চৈতন্যদেবের তুলনা বস্তুচিন্তার বিঘ্ন ঘটায়। তাই চিত্রটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এই কবিতায় আলঙ্কারিক রীতির সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই দেখানো হল। আর একটি কবিতার সাহায্যে বিশেষ করে চিত্ররীতির পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক।

১. উন্নত গীম সীম / নাহি অনুভব

২. বিপুল পুলকাকুল / আকুল কলেবর / গর গর অন্তর প্রেম ভরে। / লহু লহু হাসনি, গদগদ ভাষণি ইত্যাদি—

প্রথমটিতে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব গ্রীবাদেশের উন্নত বিচিত্র ভঙ্গিতে যেমন প্রকাশিত, দ্বিতীয়টিতে তেমনি অভিব্যক্ত প্রেমাকুল চিত্তের দেহগত প্রকাশ লঘু হাস্যে, গদগদ ভাষণে, বিপুল পুলকে, আকুল কলেবরে।

প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনে গোবিন্দদাস সর্ববিধ অর্থালঙ্কারকে পরিহার করে বস্তুচিত্র এঁকেছেন। কখনও সাফল্য এসেছে, কখনো সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে তা ওঠেনি। সম্ভবত বৈষ্ণব পদাবলীর রাজ্যেও পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় প্রকৃতির কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি দেখেননি। বহু কবির রচনায় রাধা বা অন্য নায়িকা বার বার উপস্থিত হয়েছে। অলঙ্করণের সাহায্যে সেখানে তাই বিশিষ্টতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন কবি। কিন্তু প্রকৃতি-প্রসঙ্গ বহু পদপাতে ধূলিধূসর নয়। কবির গতি এখানে একরূপ নতুন পথে। তাই অলঙ্কারবিহীন স্বভাবসৌন্দর্যে তৃপ্ত থেকেছেন সাধারণত। তবে বর্ষা বর্ণনায় কখনো একটু ধ্বনিসাম্যের সংযোগে চিত্রটিকে বিচিত্র করতে চেয়েছেন :

ঝর ঝর জলধর-ধার। / ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥ / ঝলকত দামিনী-মালা / ঝামরি ভৈ গেল বালা॥

'ঝ' ধ্বনির অতি-ব্যবহার চেষ্টাকৃত অলঙ্কৃতি হিসেবে নিন্দনীয় হলেও কিছু শব্দ-সৌন্দর্যেরও কারণ বটে। আবার শারদপূর্ণিমার রাত্রির বর্ণনায় অতি সরল চিত্র একটা আনন্দোল্লাসের ছন্দ ও বর্ণে স্বাদু হয়ে উঠেছে :

শরদ-চন্দ পবনমন্দ / বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ / ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথি / মত্ত মধুকর ভোরণি।

তবে বর্ষাভিসারের কবিতায় প্রকৃতি ও রাধার চিত্ররচনায় গোবিন্দদাস যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা তুলনারহিত। পঙ্কিল পথ, নীল নিচোলে বাধা মানে না দুঃসহ বৃষ্টির বেগ, বজ্রপাতের শব্দ, বিদ্যুতের আকস্মিক চমক, ত্রস্ত অভিসারিকার 'হেরইতে

উচকই লোচন তার' চিত্র হিসেবে ভাবগর্ভ এবং নিপুণ।

এক ॥ তাঁর চিত্ররচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা চলে। চিত্ররচনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে অর্থালঙ্কারের প্রতি গভীর আকর্ষণ গোবিন্দদাস অনুভব করেছেন। কিন্তু আলঙ্কারিকতা গোবিন্দদাসের চিত্ররচনার একমাত্র লক্ষ্য নয়। অর্থালঙ্কারের অভাব পূরণে শব্দালঙ্কারের ব্যবহারে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ চিত্রে বিচিত্রতা আনার চেষ্টা হয়েছে—এ-ও দৃষ্টি এড়াবার নয়।

দুই ॥ বিশেষ করে রাধা বা কৃষ্ণের কোন মূর্তি এর মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে ওঠে না। অভিসারিকা রাধিকার একটা ভাবচিত্র মনে এঁকে নেওয়া হয়ত সম্ভব তাঁর ইঙ্গিত-গুলির সাহায্যে, কিন্তু পূর্বানুরাগে রাধার কোন দেহচিত্র বা ভাবচিত্র কিছুই মনে মুদ্রিত হয় না। গোবিন্দদাসের চিত্রগুলি খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন। টুকরো টুকরো রূপকে কেন্দ্রীভূত করে কোন নারীমূর্তির সামগ্রিক চেতনা তিনি জাগাতে পারেননি। একটি দৃশ্য, একটি উপমা, একটি বিশেষ মুডের চিত্ররূপ এঁকে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। গোবিন্দদাসের রাধার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তাই কখনই খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

তিন ॥ চৈতন্যদেবের চিত্র-অঙ্কনে তিনি কিন্তু যথেষ্ট সার্থক। তাঁর ব্যক্তিত্ব, দেহলাবণ্য, অন্তরের সমস্ত করুণার পুঞ্জীভূত প্রতীক জলভরা দুটি চোখ আর প্রেমোপ-লব্ধির আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রের সংযোগে একটা পরিপূর্ণ মূর্তি ধারণ করেছে গোবিন্দদাসের কবিতায়।

চার ॥ ইন্দ্রিয়ালু কামনার অতিরেক অথবা বুদ্ধিমার্জিত সংক্ষিপ্ত ঔজ্জ্বল্য তাঁর চিত্ররচনার উপকরণ হয়ে ওঠেনি। চিত্ররস আস্বাদের পিছনে যে রূপসম্ভোগের বাসনা গোবিন্দদাসের ক্ষেত্রে তা এতই দেহভাবনাবিচ্যুত যে আশ্চর্য হতে হয়। [কবির মিলন বর্ণনামূলক পদগুলি গতানুগতিক রসপর্যায়ের অনুসরণ মাত্র।] চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের পক্ষে এই বিদ্রোহী প্রেমের কামবাসনাশূন্যতাই স্বাভাবিক বলে মনে করব না। জ্ঞানদাসের কবিতার সাক্ষ্যই অন্যরূপ। গোবিন্দদাসের শিল্পীসুলভ আশ্চর্য নিরাসক্তি এখানে অভিব্যক্ত। কাব্য-গুরু বিদ্যাপতির সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। কবির প্রৌঢ়ত্ব[১] এই নিস্পৃহ ভোগকামনাহীন রূপ সম্ভোগের অন্যতম কারণ হতে পারে। কিন্তু কবিচিত্তের গভীরে যে শৈল্পিক নিরপেক্ষতার বোধে তিনি সিদ্ধ ছিলেন, যার প্রকাশ ঘটেছে কবির রাধা বা কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে আত্মবিলীন করবার অনিচ্ছায়—এক্ষেত্রেও তার রহস্য উদ্ঘাটন প্রয়োজন। কিন্তু কবিজীবনের সামান্য তথ্যের মূলধনে সে রহস্যের শেষে পৌঁছানো আজ একরূপ অসম্ভব।

১ শাক্তধর্ম পরিত্যাগ করে প্রৌঢ় বয়সে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং পরে কবিতা রচনা করতে থাকেন।

চার

অলঙ্করণের প্রতি গোবিন্দদাসের প্রবণতা কবির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অলঙ্কার কি কেবলই মাণ্ডনিকতা—এই প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক।

এমন কবিতা অবশ্য আছে যেখানে কবি অলঙ্কারের সৌন্দর্যেই মেতেছেন। যেমন :

১. কুটিল কুন্তল কুসুম কাঁচলি / কান্তি কুবলয়-ভাস। কুঞ্চিতাধর কুমুদকৌমুদী / কুন্দ কৈরব হাস॥

২. মুখরিত মুরলী মিলত মুখমোদনে / মরকত মুকুল মৈলান। মানিনী মান মথন মচুকায়নি / মুনিমানস মূরছান॥

৩. নীরদ নীল নয়ন নিন্দী নীরজ / নীকে নেহারণি ছন্দ। / নিরখিতে নিয়ড়ে নিতম্বিনী নিচোল / বিকসিত নীবিনিবন্ধ॥

৪. বহল বারিদ বরণ বন্ধুর / বিজুরী বিলসিত বাস। / বিকচা বান্ধুলী বলিত বারিজ / বদন বিম্ব পরকাশ॥

এই অলঙ্কারবিলাস কবিতাগুলির আদ্যন্ত চলেছে। এ কি কবির বিশ্রম্ভ-কৌতুক অথবা সত্যকার কবিতা রচনার চেষ্টা? আমি অবশ্য প্রথমটিকেই এ জাতীয় অলঙ্কার-সর্বস্ব কবিতাগুলির উৎস বলে মনে করি।

কবিতার অলঙ্করণ মণ্ডনশিল্পে অবনমিত হয় তখনই যখন কবির জীবন-জিজ্ঞাসা ও রূপচেতনার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হয়ে কেবল কলাচাতুর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহৃত হয়। ভারতচন্দ্রের অলঙ্কারপ্রীতি শিল্পগুণেরই অঙ্গ কারণ তাঁর মার্জিত জীবনবোধ ও রসচেতনা অলঙ্করণেই স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্ত। নিরলঙ্কার হলে তা গ্রাম্য হয়ে পড়ত। ভারতচন্দ্রের নাগর-বৈদগ্ধ্য অলঙ্কারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। বিদ্যাপতি সম্পর্কেও ঐ একই কথা। জীবন সম্পর্কে তির্যক বোধ, ইন্দ্রিয়াসক্তি অথচ রুচির মার্জিত চাকচিক্য অলঙ্কারকে তাঁর সহজ সঙ্গী করে তুলেছে। গোবিন্দদাসের কোন বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি ছিল কি? তিনি ভক্ত বৈষ্ণব। কিন্তু কবি হিসেবে কোন বিশেষ দার্শনিক-জিজ্ঞাসা তাঁকে কি উচ্চকিত করেছিল? সম্ভবত নয়। ভক্ত বৈষ্ণব হিসেবেই তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দিকে তাকিয়েছেন। রাধা এবং কৃষ্ণের বৈষ্ণব তত্ত্ব-নির্দিষ্ট রূপ তাঁর কাছে যত স্পষ্ট চৈতন্যোত্তর অন্য কোন প্রধান কবির কবিতায় তা তত স্পষ্টভাবে অঙ্কিত নয়। এই সমস্যাটির একটু বিস্তৃত বিচার প্রয়োজন, কারণ কবির মূল জিজ্ঞাসা এবং অলঙ্করণ-সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনায় তা অপরিহার্য।

পাঁচ

বিদ্যাপতির রাধা নিঃসন্দেহে মানবী—উপলব্ধির গভীর ও চরম মুহূর্তেও। তাঁর কল্পনায় কৃষ্ণ কেবল মানবসন্তানই নয়, কবিরই মতো রাজসভার বিদগ্ধজন, রসিক নাগর। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের রাধা ভাবময়ী হলেও পৃথিবী-বৃত্তেই তাদের অবস্থান।

বাংলার গ্রাম্যবধূরূপেও তাদের পরিচয় মাঝে মাঝে মেলে। এঁদের কবিতার প্রেমজিজ্ঞাসা রোমান্টিক কিন্তু মানবিক। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে এ কথাটাই আমরা বোঝবার চেষ্টা করেছি।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তো বটেই, শ্রীনিবাস আচার্যের প্রত্যক্ষ শিষ্য। তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিতই শুধু নন, তত্ত্বজ্ঞানে প্রাজ্ঞ। সম্ভবত এ-ব্যাপারে তিনি জ্ঞানদাসের থেকেও অগ্রসর। তাঁর কবি-চিত্ত তাই রাধার প্রেমের তাত্ত্বিক চেতনা ছাড়া কোন মানবিক প্রেমের বিশিষ্টতা কল্পনা করতে সক্ষম হয়নি।

কৃষ্ণের ভাবরূপ বা চরিত্রচিত্র তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠেনি। তারই মধ্যে যে চিত্রের ইঙ্গিতটুকু দু-একটি কবিতা ধরিয়ে দেয় তা চৈতন্যদেবের ভাবব্যাকুলতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলনজাত। যেমন :

১. বৈঠলি তরুতলে পহু নেহারই / নয়ানে গলয়ে ঘন লোর। / 'রাই' 'রাই' করি সঘনে জপয়ে হরি / তুয়া ভাবে তরু দেয় কোর॥ / শীতল নলিনীদল / তাহে মলয়ানিল / আগোরে লেপই অঙ্গ। / চমকি চমকি হরি উঠত কত বেরি / হানত মদন-তরঙ্গ॥

২. 'রা' কহি 'ধা' পহু কহই না পারই / ধারা ধরি বহে লোর। / সেই পুরুখমণি/ লোটায় ধরণী পুনি / কো কহ আরতি ওর॥

এ কৃষ্ণে পৌরুষ নেই। বিরহবেদনারও একটা পুরুষোচিত রূপ আছে। গোবিন্দদাস সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি। তত্ত্ববোধের সাহায্যে কৃষ্ণের বিরহ ও গৌরাঙ্গের বিরহকে মিলিয়ে দিয়েছেন সহজেই। তত্ত্ববোধের এ জয়ে কবিকল্পনার জয় হয়েছে কি?

অভিসার পর্যায়ের কবিতার সাহায্যে এবারে রাধারূপের কিছু পরিচয় নেওয়া যাক। অন্য স্তরের কবিতায় রাধার এই আংশিক রূপও ফোটেনি। অভিসারের কবিতায় গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার্য। প্রকৃতির পটভূমির জীবন্ত চিত্র রচনায়, রাধার অভিসারিকা রূপে এমনই একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রচিত হয়েছে যে বিস্মিত হতে হয়। অন্ধকার রাত্রে :

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন / নীলিম হার উজোর। / নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত / পহিরণ নীল নিচোল॥

এখানেও কবির চিত্ররস-সম্ভোগ। কবির চোখে এই নীলবর্ণও বস্তু বিশেষে বিচিত্র হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নাভিসারের পদকে এর বিপরীতে রেখে কবির বৈচিত্র্যপিপাসু চিত্ররস সম্ভোগবৃত্তির আরও ভালো পরিচয় মেলে :

কুন্দ-কুসুমে ভরু কবরিক ভার। / হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥। চন্দন-চরচিত রুচির কপূর।। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরপুর॥

উভয়ত রাধার গুরুজনকে লুকিয়ে যাবার চেষ্টা, কিন্তু বিলাসলীলায় সৌন্দর্যচর্চা লক্ষণীয়। এই সাধনায় কৃচ্ছ্রতা এবং লীলা উভয়ের সংযোগে রাধা তত্ত্বরূপিণী।

দিবাভিসারে বালুকাতপ্ত পথে গমনে কেবলই কৃচ্ছ্রসাধন, বর্ষাভিসারেও তাই। গোবিন্দদাস রাধার অভিসারিকা মূর্তির মধ্যে তাত্ত্বিক সাধনভাবটিকে কোথাও পরিহার করতে পারেননি। উল্লেখযোগ্য তাঁর অভিসার-প্রস্তুতির কবিতাটি 'কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল' সাধনার দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধকার রাত্রে নিবিড় বর্ষার কণ্টকময় পথে যে অভিসার তা পূর্ব থেকে প্রস্তুতির অপেক্ষা রাখে না। ঘন শ্রাবণ-ধারায় হৃদয় যখন আকুল হয়ে ওঠে, কিছুতেই আর ঘরে থাকা যায় না তখনই অভিসার সম্ভব। এর মধ্যে চিত্তের নাটকীয় আকস্মিক জাগরণ আছে। পূর্বের দীর্ঘ প্রস্তুতি এর রস ও রহস্যকে বিনষ্ট করে। রূপ-নির্মাণে সার্থক এই কবিতার কল্পনার ভিত্তিটি তাই বেশ দুর্বল, অথচ এর সাধনগত তাৎপর্য আছে। সেটিই কবির অভিপ্রেত। সাধনগত তাৎপর্যের উপরে বেশি ব্যক্তিগত গুরুত্ব আরোপ করায় কবির দিবাভি-সারের পদে রাধার সোচ্চার আত্মঘোষণায় নির্ভয়তার সুর বাজেনি। আবার বিদ্যাপতির ছদ্মবেশে অভিসারে যে লীলাময় ভঙ্গী—গোবিন্দদাস তাকে আপন রচনার বিষয়ভূত করেননি।

কোন বিশিষ্ট প্রেমানুভূতির রূপরচনায় নয়, কতকগুলি চিত্রকে ধরে রাখায়ই গোবিন্দদাসের কবি-কৃতিত্ব। এই চিত্রগুলি কোথাও ভাবগর্ভ, সে ভাব সাধারণত বৈষ্ণবীয় প্রেমচেতনার অনুসারী, অন্তত কোন নূতন বোধের ইঙ্গিতধন্য নয়। কোথাও নিসর্গের বিশিষ্ট ছবি, কোথাও বস্তুর অলঙ্কৃত রূপ কবি নিপুণভাষায় ও ছন্দে বাণীবদ্ধ করেছেন। ভাবাকুলতায় নয়, চরিত্র-জিজ্ঞাসায় নয়—রূপরচনায়, সৌন্দর্যসম্ভোগে, চিত্রনির্মাণেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

ছয়

খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন চিত্রাঙ্কনে অলঙ্করণের সহায়তা যে কবি সার্থকভাবেই গ্রহণ করেছেন অনেকগুলি কবিতায় তা আমরা দেখেছি। আর তাই-ই কবির লক্ষ্য।

কবিদৃষ্টির যে নিস্পৃহ নিরাসক্তির কথা বলেছি, এবং কবির প্রেমচেতনার যে জগতোত্তর সুস্পষ্ট তাত্ত্বিকতার সন্ধান পেয়েছি তাতে অলঙ্কার প্রয়োগের বিশেষ প্রবণতার সম্ভাব্য কারণ মিলছে। অলঙ্কারের সীমা টেনে তিনি জগৎ ও জগতাতীতের মধ্যে নিস্পৃহতার বেড়াটি বেঁধে দিতে চান। ব্রজবুলির মতো বাঙালি পাঠকের কাছে অর্ধপরিচিত ভাষা ব্যবহারের পিছনেও গোবিন্দদাসের অনুরূপ মানসিকতা সক্রিয় কিনা তা চিন্তার বিষয়।

৫ মঙ্গলকাব্য

৫. ১. বিজয় গুপ্ত / মনসামঙ্গল

এক

অজস্র মঙ্গলকাব্যের এবং তার মুখ্য তিনটি ধারার মধ্যে মনসামঙ্গলই কাব্য-মূল্যে শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস-বিচার থেকে কাব্য-সৌন্দর্য আলোচনার প্রশ্নে এই ধারাকেই তাই প্রাধান্য দিতে হবে। কি আখ্যান-নির্মাণে, কি চরিত্র-চিত্রণে মনসামঙ্গলের কিছু কাজ যুগোত্তীর্ণ; এবং ধর্মপ্রভাব-নিরপেক্ষভাবেই আস্বাদ্য।

অবশ্য মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে মুকুন্দরামকেই হয়ত উল্লেখ করতে হবে। আর যদি অন্নদামঙ্গলকেও এই গোষ্ঠীভুক্ত করি তো একক কবি হিসেবে ভারতচন্দ্রের প্রতিভারই অবিচল-শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। মনসামঙ্গলের ভাগ্যে তুল্য প্রতিভাধর কোন কবির আবির্ভাব ঘটেনি এ-কথা বিজয়গুপ্ত-নারায়ণ দেবের নাম মনে রেখেও বলা চলে। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যধারায় স্বাভাবিকভাবেই এমন একটা সাহিত্যগুণদীপ্ত ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে যে ছোট বড় যে-কোন কবিই এই ধারায় কাব্য-রচনা করেছেন, ঐতিহ্যানুসারী অন্তত পাঠযোগ্য গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে তাঁরা উপহার দিতে পেরেছেন। তবে এ ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে উপরে উক্ত কবিদের হাতে এবং মনসামঙ্গল ধারায় এঁরাই বড় কবি। অন্যদের পাঠযোগ্যতা ঐতিহ্যসৃষ্ট কাহিনী ও চরিত্রবোধগত, রচনা-সৌকর্যের ফল নয়।

সাধারণ বিচারে এঁরাও মাঝারি ধরনের ভালো রচয়িতা। মনের প্রবণতায় এবং রচনাভঙ্গিতে এঁদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও চরিত্র-বোধে এবং কাহিনী-গঠনে ঐক্য আছে।

মনসামঙ্গল কাব্যধারার কাব্যসৌন্দর্য বিচারই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য, তবে বিশেষভাবে বিজয় গুপ্তের কাব্য অবলম্বনে তা করা হয়েছে। বিজয় গুপ্ত এই ধারার সবচেয়ে শক্তিশালী কবি।

দুই

কাব্য বা কথাসাহিত্য যেখানেই কাহিনী আকর্ষণের কেন্দ্রে সেখানে প্লট-নির্মাণ সৌন্দর্য-বিচারের একটি প্রধান নিরিখ। প্লটে সময়ে-গাঁথা কতকগুলো ঘটনার পারম্পর্য থাকে। কিন্তু এখানে তার শুরু, শেষ নয়। ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যাওয়াই নয় কেবল—এই ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণসূত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা চাই। কতকগুলো টুকরো ঘটনাকে নিয়ে কোন একটি আইডিয়া যা একটি চরিত্রের জীবন-

সূত্রে মালা গাঁথলেই আখ্যান-নির্মাণ সার্থক হয় না, তার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য থাকা প্রয়োজন। একটি মূল সমস্যার বীজ থেকে বহুদল পত্রের মত যে বিকাশ আখ্যানকাব্যের তা-ই আদর্শ।

চণ্ডীমঙ্গলের দুটি ভিন্ন কাহিনী কালকেতু আর ধনপতিকে কেন্দ্র করেছে। কিন্তু কালকেতুর জীবনের ঘটনাগুলি কি কোন কেন্দ্রীয় ঐক্যে নিবিড়-বদ্ধ? পশু-হনন, ভোজন-প্রাচুর্য আর দারিদ্র্য-বহনে তার বর্বর জীবনের নৈমিত্তিকতা, চণ্ডীর অযাচিত কৃপায় অজস্র সম্পদে তার দারিদ্র্য-উত্তরণ, কিংবা কলিঙ্গরাজের সঙ্গে তার সংঘাত সবই কতকগুলো বিচ্ছিন্ন টুকরোর মতো কালকেতু নামক মানুষটির চারপাশে জড়ো হয়েছে মাত্র। আসলে কালকেতুর জীবন-সমস্যার কোন বিশিষ্ট রূপের সঙ্গে ঐ ঘটনাবলী আমাদের পরিচিত করায় না। কালকেতুর গল্পে তাই দ্বন্দ্ব প্রায় অনুপস্থিত। ধনপতির গল্পও নানা টুকরো কাহিনীর সঙ্কলন। পৃথকভাবে অনেকেরই হয়ত কিছু রসাবেদন আছে। কিন্তু যেখানে কাহিনীর অঙ্গীকার সেখানে খণ্ডকে অখণ্ড করে তোলা চাই। ধনপতি-কাহিনীর ব্যর্থতা সেখানে। তাই চণ্ডীর সঙ্গে তার বিরোধ খুবই আকস্মিক বলে মনে হয়, মনে হয় মনসামঙ্গলের কৃত্রিম অনুকরণ বলে। ধর্মমঙ্গলের বিস্তৃত কাহিনীতেও অনেক টুকরো সংগ্রামের বর্ণনা। তবে তার একটি সূত্র আছে। মহমুদ পাত্রের দ্বারাই লাউসেনকে হেয় প্রতিপন্ন করে বিনাশ-সাধনের জন্য এই যুদ্ধঘটনাগুলির উপস্থাপনা। কিন্তু বাইরের ঘটনাগত এই ঐক্য যুদ্ধবর্ণনার বিস্তারের মধ্যে চাপা পড়েছে। এবং মহমুদ চরিত্রের এই ভাগিনেয়-বিদ্বেষের কারণ থাকলেও তার এত জিঘাংসা-তীব্র বিস্তার একটা অন্ধ জিদের মতই মনে হয়। দ্বিতীয়ত, লাউসেনের পক্ষ থেকে মাতুলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ নেই, মাথা নিচু করে প্রত্যেকটি চক্রান্ত ও যুদ্ধের সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা আছে। রূপকথার রাজপুত্র যেমন আনুগত্যের পথে দৈবানুগ্রহে সব চক্রান্ত থেকে শেষপর্যন্ত জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসে,—ঠিক তেমনি। তাই এ গল্পেও কোন কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব নেই, যার ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিনীর অগ্রগতি।

এদিক দিয়ে মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে মনসামঙ্গল তুলনাহীন। মনসামঙ্গলই একমাত্র কাব্য যার অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করে একটা তীব্র সংগ্রাম আদ্যন্ত প্রসারিত। সে সংগ্রাম কেবল ঘটনাগত দ্বন্দ্ব বা রাজায় রাজায় যুদ্ধের পর্যায়ভুক্ত নয়, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের, নীতির সঙ্গে শক্তির, বলা যেতে পারে মুক্তবুদ্ধির সঙ্গে যুগ-সঞ্চিত অন্ধভক্তির। এই দ্বন্দ্ব-বীজে কাহিনীর প্রাণ, এরই আকর্ষণে ঘটনার মালা কেন্দ্রবিদ্ধ, আর প্রতিটি খণ্ডই অখণ্ডের দিকে প্রসারিত ও গভীর তাৎপর্যবহ। এমন একটি কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের কল্পনা সেকালে কবিদের শিল্পবোধে ধরা পড়েছে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

মনসামঙ্গলে প্রসঙ্গচ্যুতি নেই, অনাবশ্যক বিষয় নেই, দীর্ঘ বিতানিত দেব-বন্দনা

ও ভক্তিরসের প্রবাহ নেই এ-কথা আমরা বলি না। আর এ প্রত্যাশাও ঠিক নয়। মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট কাঠামোর অনুসরণ করেছেন মনসামঙ্গলের কবিও। প্রথমে দেবী বন্দনা, দিগ্বন্দনা, কবির আত্মজীবনী, স্বপ্ন-দর্শন, স্বর্গকাহিনী, পরিশেষে মর্তবিবরণ। মর্তবিবরণেও প্রসঙ্গচ্যুতি যথেষ্ট। রান্নার তালিকা, কাপড়-গয়নার ফর্দ থেকে নারীদের পতিনিন্দা, আর পূজা-অর্চনার খুঁটিনাটি বর্ণনার প্রাচুর্য মনসামঙ্গলেও আছে। স্বভাবতই আধুনিক নাটকের ঐক্যের আদর্শ এখানে অনুসরণীয় নয়, হওয়া উচিতও নয়। মঙ্গলকাব্যের এই প্যাটার্ন-এর কথা মনে রেখে, আর মেনে নিয়েই এর কাহিনীগত ঐক্যকে বুঝতে হবে, আর যুগগত 'ছাড়' কিছুটা দিতে হবে বৈকি।

চাঁদ-মনসার সংগ্রামই কাহিনীর অবলম্বন। এই সংগ্রামের পথে ঘটনার খণ্ডগুলি এইভাবে এসেছে। মনসা চাঁদের 'গুয়াবাড়ি' কেটেছে। চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরী ওঝা সুপারির বাগানটি জিইয়ে তুলেছে। মনসা তখন নানা কৌশলে ধন্বন্তরীকে বধ করেছে। অতঃপর নিশ্চিন্তমনে মনসা চাঁদের উপবন ধ্বংস করেছে। কিন্তু মুহূর্ত-মধ্যে মহাজ্ঞানবলে চাঁদ তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। মনসা এবার নটীর বেশে চাঁদের মনোহরণ করে মহাজ্ঞান নিয়ে গিয়েছে। এর পরে মনসার পক্ষ থেকে যে আঘাত এসেছে তা গুরুতর। ভাতে বিষ মিশিয়ে চাঁদের ছয় ছেলেকে বধ করেছে মনসা। বাণিজ্য-লব্ধ চাঁদের অতুল সম্পদপূর্ণ ডিঙাগুলি ডুবিয়ে দিয়েছে। আর পরিশেষে চাঁদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন লক্ষ্মীন্দরকে হত্যা করেছে। কিন্তু চাঁদ সদাগর মাথা নোয়ায়নি। এ পর্যন্ত কাহিনীর একটি পর্ব।

ঘটনাগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু এই খণ্ডসজ্জায় একটি ক্রমোন্নতি আছে। সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। আঘাতের লক্ষ্য বাইরের বস্তু থেকে অন্তরের গভীরতায় ক্রমেই প্রবিষ্ট হয়েছে। আর চাঁদের প্রতিরোধও বাইরের বস্তু-অবলম্বন হারিয়ে সম্পূর্ণ অন্তরময় হয়ে উঠেছে। বন্ধু ধন্বন্তরীর সাহায্য কিংবা মহাজ্ঞানের সাহচর্যে যে প্রতিরোধ, তার শক্তি-উৎস চাঁদের আপন হৃদয় নয়। প্রথম দিকে মনসা কিছু পিছু হটেছে, পিছু হটে নতুন কৌশলে চাঁদের প্রতিরোধ চূর্ণ করেছে। কিন্তু ধন্বন্তরীর মৃত্যু এবং মহাজ্ঞান-হরণের পরে চাঁদের যে প্রতিরোধ তা কেবলই হৃদয়ের। মনসার আক্রমণ-জাত বিনষ্টি তাতে রুদ্ধ না হলেও জয়ের সীমা বিস্তৃতি পায়নি। গল্পের স্রোতে এমনি করে ক্রমেই বহির্জগত থেকে অন্তর্জগতের প্রাধান্য এসেছে।

পরবর্তী পর্বে কাহিনী বাস্তব পৃথিবী ছেড়ে স্বপ্ন-কল্পনার পথ ধরেছে। বেহুলা চরিত্র-বিচারে কাহিনীর এ-অংশের পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাবে।

কাহিনীর সমাপ্তি নিয়ে যে প্রশ্ন তার বিচারও চাঁদ-চরিত্রের বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

কাহিনীর প্রারম্ভে মূল দ্বন্দ্বটি শুরু হবার আগে স্বর্গবিবরণ মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই একটি সাধারণ ঐতিহ্য। কিন্তু মনসামঙ্গলের কোন কোন কবি, বিশেষ করে বিজয় গুপ্তের হাতে, এই সাধারণই অসাধারণ হয়ে উঠেছে। খুব প্রত্যক্ষভাবে না হলেও

অন্তত একটি প্রধান চরিত্রের পরিণতির-প্রক্রিয়া বেশ মনস্তাত্ত্বিক নৈপুণ্যের সঙ্গে ইস্বর্গ-কাহিনীর ভিতরে জড়িয়ে আছে। মনসামঙ্গলে একটি প্রধান চরিত্র মনসা। তার পূর্বজীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট প্রবণতা কি করে ক্রমে জন্ম নিল তার ইতিহাস মিলবে এখানে। কাজেই ঘটনার মূল সূত্রে এ অংশ বাদ দেবার নয়। বিজয় গুপ্তে এটি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে চিত্রিত। অন্যপক্ষে নারায়ণদেবের স্বর্গ-বিবরণে কিন্তু নানা পুরাণের সার সঙ্কলন ঘটেছে। এদের বিস্তার মূল কাহিনী-দ্বন্দ্বের সঙ্গে প্রায় কোনদিক দিয়েই সম্পর্কিত নয়। সেখানে শুধুই প্রথানুগত্য।

পার্শ্বকাহিনী হিসেবে হাসান-হোসেনের কথা কৌতূহলোদ্দীপক হলেও অনাবশ্যক। মূল দ্বন্দ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক আদৌ প্রত্যক্ষ নয়। তবে পৃথক ক্ষুদ্র কাহিনী হিসেবে এরও পাঠযোগ্যতা স্বীকার্য। কারণ এখানেও একটি বিরোধের মূলে ঘটনার বিকাশ। ভক্ত রাখাল বালক তথা মনসার সর্পশক্তি এবং হাসান-হোসেনের রাজকীয় শক্তির মধ্যে সংঘাত গল্পটিকে কিছুটা উপভোগ্য করেছে। তবে চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বে এর স্থান নেই; মনসা-চরিত্র বিকাশেও এর ভূমিকা নেই।

মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে ধন্বন্তরী-বধ কোন কোন কবির রচনায় প্রয়োজনকে ছাপিয়ে বিস্তৃত হয়েছে। লক্ষ্মীন্দর-বেহুলার জন্মপূর্ব দেবপরিচয় [অনিরুদ্ধ-উষার কাহিনী] বর্ণনায় অতিবিস্তার ঘটেছে। এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের আকার নিয়েছে এরা। তবে ভারতীয় গল্পকথনের বিশিষ্ট শিথিল ভঙ্গির কথা মনে রেখে মনসামঙ্গলের কাহিনীগত এসব ত্রুটি ধরার নয়।

তিন

অন্তত তিনটি চরিত্র সৃষ্টিতে মনসামঙ্গল যুগোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টির সাফল্য দাবি করতে পারে। চাঁদসদাগর, বেহুলা এবং মনসা।

বিজয় গুপ্তের হাতে মনসা চরিত্রের একটি বিশিষ্ট পরিচয় সত্য হয়ে উঠেছে বিশেষত স্বর্গকাহিনীতে। বিজয় গুপ্তের কবি-দৃষ্টির বস্তুমুখিতা অনেক সমালোচকই মেনে নিয়েছেন। এর সর্বোৎকৃষ্ট ফসল মনসার মনস্তাত্ত্বিকতা, চরিত্র-কল্পনায় এবং তা নির্মাণের সার্থক নৈপুণ্যে।

মনসার চরিত্রটি এমনকি মঙ্গল দেবতাদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদী। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই তাদের শক্তি ও জবরদস্তি এবং এতে কোন মাহাত্ম্য নেই। প্রধানত এই শক্তির ক্রীড়ায়ই বিহ্বল ও ভীত মানুষ এদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু মঙ্গলদেবগোষ্ঠীর মধ্যে এ-ব্যাপারে মনসার জুড়ি নেই প্রায়। মনসামঙ্গল কাব্যে তার যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাতে সহজেই তাকে বিষধর সর্পের সঙ্গে এক করে ফেলা চলে। কবিও বারবার করেছেন। নারীরূপী দেবতা সর্পরূপী ভয়ংকরীতে পরিবর্তিত হয়েই বাঙালির পুজো কেড়েছে বোঝা যায়। এমনকি কবিরাও যে সর্পের খল-হিংস্রতাকে মনসার সন্ত্রাস-চেতনার তুলনায়

কোমল এবং স্নেহময় বলে মনে করেছেন তার প্রমাণ আছে। কালী নাগিনী লক্ষীন্দরকে দংশন করতে গিয়ে চোখের জল ফেলেছে। কিন্তু মনসার চোখ থেকে যা বর্ষিত হয়েছে তা অগ্নি এবং হলাহল। কালী নাগিনীর দ্বিধা মনসায় নেই।

সর্বনাশ-বর্ষণে মনসা দ্বিধাহীন। উদ্দেশ্যে সে স্থির এবং উপায়ের নীতি-ন্যায় তার বিচারের বাইরে। চাঁদ সদাগরকে ধ্বংস করতে হবে। যে-কোন উপায়ে মনসার তা করা চাই, শিশুপুত্রদের ভাতে লুকিয়ে বিষ মিশিয়ে কিংবা সদ্য বিবাহিত লক্ষীন্দরের বাসরে সাপ ঢুকিয়ে দিয়ে। যুক্তি দেখানো যেতে পারে চাঁদের পূজা-আদায়ের উপরেই মনসার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল। কিন্তু মনসার ব্যবহারে একটা দ্বিধাহীন হিংস্রতা এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে যাতে নটীবেশ ধারণের তুচ্ছতা কিংবা মালিনীর ভূমিকায় অভিনয়ের হেয়তা এত স্বাভাবিকভাবে সে স্বীকার করে নিয়েছে, যাতে একটা তীব্র আক্রোশ যেন আপনার সূচীমুখ উদ্যত করে রেখেছে বলে মনে হয়।

মনসার এ আক্রমণ যেন মূর্তিমতী নিষেধ—নিষেধ দাম্পত্য মিলনের প্রথম মুহূর্তের রোমাঞ্চকর ঘনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে, নিষেধ মানব-কামনার সুপ্রচুর সম্পদ-সঞ্চয়ের সফল-সাধনার বিরুদ্ধে। তার উদ্যত অস্ত্র মাতার স্নেহ, পিতার আলিঙ্গন, পত্নীর প্রেমাকুতিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যই সদাজাগ্রত। ভালোবাসার সার্থকতা আর জীবন-সাধনার সফলতাই যেন তার আক্রমণের লক্ষ্য, চাঁদ সদাগর উপলক্ষ মাত্র।

মনে হয় মনসা চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতা একবর্ণে রঞ্জিত। অধিকাংশ মনসা-মঙ্গলেই চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বে এর কাহিনীর ভিত্তি, কিন্তু বিজয় গুপ্তের কাব্যে এর একটি মনস্তাত্ত্বিক ভূমি রচিত হয়েছে। তারই আলোয় মনসা-চরিত্রের উপরের ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নতুন হয়ে ওঠে।

মনসার কৈশোর এবং যৌবনের কথা বিজয় গুপ্তের কাব্যে একটু বিস্তৃতভাবেই বলা হয়েছে। এই পরিচয়ের একদিকে মনসার জাতিগত পরিচয় আছে। মূলত অনার্যদের দেবতা আর্যসমাজে গৃহীত হয়েছিল কত আভ্যন্তর বাধা এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার অস্পষ্ট ঐতিহাসিক ইঙ্গিত এ কাহিনীতে আছে। কিন্তু মনসার ব্যক্তি-পরিচয়টি ফুটে উঠেছে আরও স্পষ্ট হয়ে।

বিজয় গুপ্তের শিব অতি দরিদ্র এবং শিথিল-চরিত্র বাঙালি গৃহস্থ। তার চঞ্চল মন গৃহধর্মের নিত্যবদ্ধতায় খুশি নয়। মুহূর্তের দর্শনেই পাটনী নারীর যৌবন তার কাম-বাসনাকে কি পরিমাণ উদ্রিক্ত করতে পারে তার কৌতুককর পরিচয়ও বিজয় গুপ্ত বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনসার জন্মঘটিত রহস্য এবং অলৌকিকতা, মাতৃপরিচয়ের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি একটা বিশেষ সত্যেই আমাদের পৌঁছে দেয়। মনসার মাতৃপরিচয়ের এমন কোন জোর ছিল না যাতে করে উচ্চ কৌলীন্যমণ্ডিত দেবসমাজে সে গৃহীত হতে পারে। কাজেই পিতৃপরিচয়কে একমাত্র সম্বল করতে হয়েছে তাকে। স্বভাবত, জন্মলগ্নে একটা অতি নির্মম চিহ্ন ললাটে ধারণ করেছে

মহাদেবের এই অবৈধ কন্যা। এবং তার জন্য তার নিজের দায়িত্ব সামান্য মাত্র ছিল না।

কৈশোর অতিক্রান্ত-প্রায় এই নারীর জীবন কি পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল তার একটুখানি পরিচয় মিলবে বচাই-বাড়ি পুজোর বিবরণে। শিব তাকে বচাইয়ের বাড়িতে রেখে গেলেন বলেই নয়, এমনিতেই বচাইদের সঙ্গে তার নিত্যনৈমিত্তিক সাক্ষাৎ ঘটত বনজীবনে। আর এদের হীন কামুকতা থেকে বাঁচবার প্রয়োজনে আপনার মধ্যে যে শক্তিকে সে কেন্দ্রীভূত করেছিল তারই প্রতীক-দ্যোতনা সর্পরূপে, সর্পবিষে। অবশ্য এ বিষ তার অন্তরে কেবল পরিবেশের আঘাতে-সংঘাতেই সঞ্চিত হয়নি, এ শক্তির বীজ তার ব্যক্তি-চরিত্রের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য।

কৈশোরের প্রান্তে পিতা কর্তৃক দেবসমাজে সে নীত হয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রথমেই চণ্ডীর যে অভ্যর্থনা তার ভাগ্যে জুটেছে তা নিতান্ত মর্মদাহী। বিমাতার লাঞ্ছনার তীব্র এবং বাস্তব বর্ণনা বিজয় গুপ্তে মিলবে :

> আপন ইচ্ছায় গালি দেয় কারো ভয় নয়। / মুখে গালি পাড়ে দেবী যত মনে লয়॥ / খলখলি হাসে দেবী হাতে দিয়া তালি। / চোপাড়ে চাপড় মারে দেয় চুণ কালী। / বুকে পিঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়। / মারণের ঘায় পদ্মা করে থর থর॥ / বিপরীত ডাকে পদ্মা প্রাণে লাগে ব্যথা। / নিষ্ঠুর হইয়া মারে কার্ত্তিকের মাতা॥

'কার্ত্তিকের মাতা' চণ্ডীর এই বিশেষণটি কবির শব্দব্যবহারের নৈপুণ্যের পরিচায়ক। কিশোরী মনসার বিমাতার হাতে এই অত্যাচারের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে বিমাতার মাতৃত্বের পরিচায়ক এই শব্দদুটি মনসার মাতৃহারা অসহায়ত্ব এবং সন্তানবতী রমণী হওয়া সত্ত্বেও এক বালিকা কন্যার প্রতি চণ্ডীর নির্মমতা সুন্দর ফুটিয়েছে। আবার :

> ব্যাধের হাতে প'ড়ে যেন পক্ষীর কিলকিলি। / উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পদ্মা বাপ বাপ বলি॥ / উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পদ্মা ব'লে বাপ বাপ। / তবু ত দেবীর শরীরে তিলেক নাহি তাপ॥ / মাতা নাহি ভ্রাতা নাহি একমাত্র বাপ। / তোমার চণ্ডীর শরীরে কিঞ্চিৎ নাহি তাপ॥

বিমাতার এ ব্যবহারে কিশোরী মনসার যাবতীয় সুকুমার মনোবৃত্তি যে শুকিয়ে যাবে তা খুবই স্বাভাবিক। মনসার অন্তরের অশুভ শক্তিকে এই অত্যাচার খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলে। মনসার সেই অন্তরের শক্তিই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,—কেবল প্রতিকূল পরিবেশেই এর জন্ম নয়। মনসার চরিত্রের মূলে এক স্বাতন্ত্র্যময়ী তেজোগর্ভ নারীত্বের বীজ সুপ্ত। দুর্বল, অন্য-সাপেক্ষ, অবহেলিত নারী-মন হলে বিপরীত ঘটনার প্রবাহে তার হৃদয়ের সুকুমার অমৃতত্ব শুধু লুপ্ত হত, এই হলাহলও জেগে উঠত না। এক অখ্যাত সামান্য সমাপ্তিই তার ভাগ্যে ঘটত।

কাজেই বিমাতার অত্যাচারে মনসার প্রতিরোধ হয়েছে তীব্র। শক্তির পরিচয়ে তাকে চণ্ডীর গৃহে আশ্রয় পেতে হয়েছে :

মা নাই পদ্মাবতীর বাপে করে দয়া। / বিক্রম জানিয়া পালন করে মহামায়া ॥

কিন্তু তীব্রতর আঘাতের সামনে পড়েছে সে বিবাহের রাত্রে। এ কেবল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা নয়, সমগ্র জীবনের বর্তমান-ভবিষ্যৎ, আশা-কামনা চূর্ণ হয়ে যাওয়া। দেবকুমারী মনসার জন্য দেবসমাজে পাত্র মেলেনি। ঋষিবংশজাত জরৎকারু মনসার যাবতীয় পার্থিব কামনা পরিপূর্ণ করতে সক্ষম ছিল না, রাজী ছিল বলেও মনে হয় না। বিয়ের রাত্রিতেই পত্নীকে তপস্যার জন্য কুশ আনতে আদেশ করাকে রূপক হিসেবে গ্রহণ করা চলে। এ ঘটনা বিয়ের রাত্রির দাম্পত্য মিলনের পার্থিব ভোগবাসনার উপরে ঋষি জীবনচর্যার, ব্রহ্মচর্যের জয় ঘোষণার দ্যোতক। জরৎকারুর কাছে এ যতই সত্য হোক না কেন যৌবনবতী নারী মনসার কাছে এর চাইতে ছলনা, বৃহত্তর ব্যর্থতা. কঠিনতর আঘাত আর কি হতে পারে? স্বভাবতই দীর্ঘকাল ধরে অন্তরের যে অশুভ শক্তির সাধনা সে করেছে তাই অকস্মাৎ সর্পরূপে ফণা তুলেছে সামান্য কিছু বিতর্কের উত্তেজনায়। সে স্বামীকে আঘাত করেছে ফলে মনসা জরৎকারু কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে চিরকালের জন্য।

ধীরে ধীরে মনসা পরিবর্তিত হয়েছে। যখন সে জন্মেছিল তার এক নয়নে নাকি ছিল বিষ, অন্য নয়নে অমৃত। এই অমৃত-নয়নও ক্রমে বিষের তীব্র জ্বালায় আচ্ছন্ন হয়েছে। ভক্ত-কবিরা অবশ্য বিষ-নয়ন পরিহার করে একবার অমৃত-নয়নে চাইতে অনুরোধ করেছেন মাতা মনসাকে। কিন্তু সে কেবল ভক্তির স্তোত্র। জীবনের পাত্র থেকে সঞ্চিত সবটুকু মধুই অপচিত মনসার।

পরিশেষে মনসার নির্বাসনের পালা এসেছে। দেবসমাজে আর অধিকদিন তাকে রাখতে সাহসী হয়নি শিব। দূরে এক আবাস নির্মাণ করে তাকে রেখে আসতে হয়েছে সেখানে। মনসার নিজের মুখে নির্বাসনকালে জীবনব্যাপী ব্যর্থতার আর্তি প্রকাশ করেছেন বিজয় গুপ্ত—এই ব্যর্থতায় পুড়ে পুড়ে যার জন্ম তারই সন্ত্রাসে মনসামঙ্গল কাব্যে নানা বিপর্যয়ের চিত্র বাস্তব হয়ে উঠেছে।

চার

চাঁদ সদাগরের বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে অনন্য। সেকালের কবি এমন চরিত্র কল্পনায় আয়ত্ত করতে পারেন ভাবতে বিস্ময় জাগে। মঙ্গলকাব্যের সচেতন উদ্দেশ্যমুখিতার কথা মনে রাখলে বলা যায় দ্রোহবুদ্ধির উপরে পরিশেষে দৈবীশক্তির জয়প্রদর্শনই এই কাহিনীর পরিকল্পনায় কাজ করেছে। কিন্তু পরিকল্পনার চৌহদ্দীর মধ্যে চাঁদের চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ পুরে দেওয়ার চেষ্টা নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছে। জোর করে পরিকল্পনাগত সীমার মধ্যে চাঁদকে প্রবেশ করাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আপনার প্রাণাবেগেই চরিত্রটি কবিদের প্রয়োজন-বুদ্ধিকে এতটা ছাপিয়ে উঠেছে যে গল্প শেষ করতে গিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা এবং দুর্বল কৈফিয়ৎ বা

আকস্মিক পরিবর্তনের পথ ধরেছেন কবিরা। এমনকি বিজয় গুপ্তও এই সীমাবদ্ধতার বাইরে নন।

চাঁদসদাগরের চরিত্র-কেন্দ্রে যে বোধটি স্থিত, তাকে উনিশ শতক-সুলভ চিত্তমুক্তির চেতনার সঙ্গে সহজেই তুলনা করা চলে। চাঁদসদাগর তাঁর হৃদয়ের বোধকে এবং বুদ্ধিকেই স্বীকার করে নিয়েছে সর্বান্তঃকরণে। আপন ব্যক্তিসত্তার উপরে এই একান্ত নির্ভরতা সে যুগে কি করে সম্ভব হল ভাবা যায় না। বাঙালি সমাজের উচ্চ ও নিম্নকোটির সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের পরিচয় এ চরিত্রের প্রবল প্রতিরোধে হয়ত জীবন্ত হয়ে আছে। হয়ত এ ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির পেছনে বণিকবৃত্তিগত কোন সমাজেতিহাসের প্রতিফলন ঘটেছে। তবে বিজয় গুপ্তে তার যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য রূপ পেয়েছে তার প্রত্যক্ষতাকে অস্বীকার করা যায় না। চাঁদ আপন স্বতঃপ্রবুদ্ধ জীবনচেতনা এবং চর্যা থেকে বিচ্যুত হতে রাজী হয়নি। মনসাকে সে পুজো করবে না। কারণ শ্রদ্ধা বা ভক্তি হৃদয়ের সহজাত প্রবৃত্তি। এরা যখন অন্যের আদেশের সাপেক্ষ হয়ে পড়ে তখনই ব্যক্তিত্বের অবমাননার প্রশ্ন আসে। ব্যক্তিবুদ্ধিকে নির্জিত করার কথা ওঠে। সাধারণ মানুষ বাইরের দু-ধরনের চাপের কাছে আত্মবিসর্জন করে থাকে— সেকালে এবং একালে একথা সমভাবেই সত্য। একটি হল লোভ, অন্যটি ভয়।

চাঁদসদাগরে নাস্তিকতা এবং দেবভক্তির দ্বন্দ্ব আদৌ লক্ষ্য করা হয়নি। চাঁদের মনসা-বিরোধিতাকে নাস্তিকতা বলে মনে করার কারণ আছে। লেখক-কবিদের মনসাভক্তির আত্যন্তিকতায় মনসা-বিরোধিতা এবং দেব-বিরোধিতা কাব্যমধ্যে প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু চাঁদসদাগর নিষ্ঠাবান শৈব বলে সব মনসামঙ্গলেই উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই সমস্যা নাস্তিক্য ও আস্তিক্য বুদ্ধির ভেতরকার সংঘর্ষের নয়। এখানে সংগ্রাম লোভ ও ভীতির আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন কামনার।

চাঁদসদাগরে নির্ভীকতা আছে, তবে সে নির্লোভ নিরাসক্ত সন্ন্যাসী নয়। হলে মনসার আক্রমণের সামনে তার স্থিতি অনেক বেশি দৃঢ় হত। কিন্তু তীব্র হাহাকার এবং ব্যক্তিত্ব-বিদারী আর্তনাদ [মনসামঙ্গলের যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদ] থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। মনসামঙ্গলের সাহিত্য-সৌন্দর্যের প্রধান কথা চাঁদের জীবনের ট্রাজেডি। ঘটনার চক্রে সন্ন্যাসীর জীবনে করুণ কিছু ঘটতেও পারে, কিন্তু তার চিত্ত নির্লোভ-নিরাসক্ত বলেই সন্ন্যাসীর কোন ট্রাজেডি নেই।

চাঁদ আদর্শবাদীও নয়। বলা চলে জীবনবাদী। তাই চাঁদের কাহিনীতে বাণিজ্য এবং নৌকা হারানোর পর্বটি গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষীন্দরের মৃত্যুর মতো গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ছয় পুত্রের মৃত্যুর চেয়ে কিছু কম নয়। চাঁদসদাগরের-জীবনকামনা, বস্তুসম্পদ-পরিপূর্ণ জগৎভোগের চেষ্টা তাঁর বাণিজ্যব্যাপারে বিস্তৃতভাবে রূপায়িত হয়েছে। বাণিজ্যে যখন প্রভূত লাভ হল, চৌদ্দ ডিঙ্গা সহ মধুকর আহরিত বিচিত্র মূল্যবান পণ্যে পরিপূর্ণ হল তখন চাঁদের উল্লাস কবির লেখায় নির্ভুলভাবেই ধরা পড়েছে। এমন

কি বস্তুবদলের সময়ে চাঁদের সুকৌশল বণিক্‌বুদ্ধিতে অতিরিক্ত লাভও লক্ষ্য করবার।

একদিকে ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ জগৎ-কামনা অন্যদিকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে একটি সুখী সম্পূর্ণ জীবন—চাঁদসদাগর এই-ই চেয়েছিল। তার জন্য সুদূর দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য-যাত্রা করতে কিংবা লোহার বাসরঘর নির্মাণ করে আপন স্নেহের ধনটিকে সযত্নে রক্ষা করতে বিবিধ শ্রম-কঠিন চেষ্টার বিরাম ছিল না। কাজেই এর প্রতিটির বিনষ্টি তাঁকে গভীর আঘাত করত। এইসব চাওয়াকে পাওয়ার মধ্যে ধরে রাখতে সবকিছু করতেই সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু একটি মূল্য দিতে সে রাজী ছিল না—সে হল ব্যক্তিত্বের মূল্য, তার অখণ্ড হৃদয়-বোধের বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার মূল্য।

তাই চাঁদে বেদনা ছিল, কিন্তু দ্বন্দ্ব ছিল না। মনসাকে পুজো করবে কি করবে না এই হৃদয়-সংক্ষোভে সে আদৌ আন্দোলিত নয়। কারণ মনসাকে পুজো করার দিকে তার মনের কিছুমাত্র প্রবণতা ছিল না, কাজেই হৃদয় আন্দোলনের প্রশ্ন ওঠে না। চাঁদের ট্রাজেডি তাই দ্বন্দ্বজাত নয়। সমগ্র জীবনব্যাপী কামনা এবং সাধনার ধন একে একে বিসর্জিত হওয়ায় তার প্রাণে যে হাহাকার জেগেছে তার আলোয় চাঁদের চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট এবং সত্য হয়ে উঠেছে। চারপাশে চলেছে কান্না-অশ্রুর সমুদ্র, কিন্তু চাঁদের বেদনার প্রকৃতি ভিন্ন। সে এটুকু নিঃসংশয়ে জানে যে ব্যক্তি-চেতনাকে উচ্চে আসন দিয়েছে বলেই দৈবীরোষ শতখণ্ডে ভেঙে পড়েছে তার জীবনে। পাপবোধ না থাকলেও এর নিমিত্ত সে যে নিজে এ জ্ঞান তার স্পষ্ট। কিন্তু এত জেনেও সে আপন হৃদয়কে অপমানিত করতে পারছে না, করার কথা ভাবতেও পারছে না। ফলে মহৎ ট্রাজেডির লক্ষণ চাঁদ চরিত্রে আছে।

মনসামঙ্গলের কবিরা চাঁদকে যে প্রয়োজনে কাব্যের বিষয়ভুক্ত করতে সাহসী হয়েছেন; চাঁদ যে সে প্রয়োজনকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়ে গেছে তার উল্লেখ আগে করেছি। অন্তত দুটি বিষয়ের বর্ণনায় তা স্পষ্ট। বাণিজ্যযান হারাবার পরে ভিক্ষুকবেশী চাঁদের দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর গল্প কবিরা করেছেন। নানা নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার মধ্যেও তার অবিচল চিত্ত আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে ঠিকই, কিন্তু কবিরা যেন এই সুযোগে তাঁদের আরাধ্যা দেবীর বিরুদ্ধাচারী এই মানুষটিকে যতভাবে সম্ভব অপমানিত করেছেন। এই অপমানের তুচ্ছতা ও নীচতা চাঁদের চরিত্র-গৌরবকে অনেকখানি নামিয়ে দিয়েছে। হাটুরে লোকের হাতে অকারণে মার খাওয়া কিংবা গৃহে প্রমুখের দাসী প্রভৃতির দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়া একান্তই বাহ্যিক এবং দৈহিক প্রক্রিয়া। মনের উপরকার অতি বড় আঘাতের পরীক্ষায় যে সগৌরবে সমুত্তীর্ণ তাকে এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে নামিয়ে আনা মনসা-উপাসক কবিদেরই সচেতন আক্রোশজাত বলে মনে হয়।

কিন্তু নিজের সৃষ্ট ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের তাড়া খেয়ে চমকে উঠতে হয়েছে কবিদের কাহিনীর সমাপ্তিতে। চাঁদকে স্বাভাবিকভাবে মনসার পায়ের নিচে নামিয়ে আনবার কোন সুযোগই তাঁরা রাখেননি। কারণ সে লাউসেন নয়, কালকেতুও নয়। অথচ

কাব্যের সমাপ্তি একটি এবং একটিমাত্রই হতে পারে। সে হল চাঁদের সশ্রদ্ধ পূজা-অর্চনার মধ্যে ভক্তিরসের একটা প্রবল প্রবাহের সৃষ্টি। তাই এখানে নানা কবির হাতে নানা গোঁজামিলের চেষ্টা চলেছে।

প্রথমেই স্বর্গপুরী থেকে বেহুলা যে যাবতীয় হারানো ধন এবং মৃত পুত্র পরিজন নিয়ে ফিরে এল এ ঘটনার কোন বাস্তবতাই নেই। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যও একে স্বপ্নকল্পনা বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। এবং আমাদের মনে হয় এ স্বপ্ন চাঁদসদাগরের ব্যর্থ বার্ধক্যের স্বর্ণদিগন্ত দর্শন, ধূসর চিত্তমরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনের মতো সত্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। সমগ্র জীবনের সাধনার ধন যেন চোদ্দ ডিঙা মধুকর পূর্ণ করে তার প্রাসাদসংলগ্ন নদীঘাটে ভিড়েছে। শুধু বরণ করে ঘরে তুলে নেবার অপেক্ষা। চাঁদের সমস্ত বার্ধক্য সফল কামনার এই স্বপ্নে বিভোর। একথা ঠিক যে মনসামঙ্গলের কবিদের রচনায় এমন ইঙ্গিত বড় নেই যাতে একে স্বপ্নকল্পনা বলে মনে করা চলে। কিন্তু অন্য কোন ব্যাখ্যাই এর বাস্তব-ভিত্তির সমর্থক নয়। চাঁদের এই স্বপ্নসার্থকতা এবং এই 'চাওয়া'কে দুই হাতে ধরবার মূল্যরূপে তাঁরই ব্যক্তিত্বের—মুক্তচিত্তের সব অঙ্গীকারের বিসর্জন দাবি করা—চাঁদের জীবনব্যাপী ট্রাজেডির প্রতীক হিসেবেই গ্রহণীয়।

রূপকথার এক রাজপুত্রের কাহিনী। 'সর্ব সুখের' সন্ধানে সে দুর্গম পথে যাত্রা করেছিল। এক চার রাস্তার মোড়ে পথের হদিশ না পেয়ে গাছের ডালের এক শকুনকে জিজ্ঞেস করেছিল। শকুন পথ বলে দিল এবং তার দাম হিসেবে রাজপুত্রের হৃদ্‌পিণ্ডের একটি টুকরো তুলে নিল। এমনি করে অনেক চার রাস্তার মোড় এড়িয়ে শকুনদের নিশানা ধরে হৃদ্‌পিণ্ডের অনেক টুকরো ব্যয় করে যখন সে এসে হাজির হল সর্ব সুখের সামনে, সে দেখল হৃদ্‌পিণ্ডের স্থানটি তার বুকের মধ্যে শূন্য পড়ে আছে। স্বর্গ কেন কোনো সুখানুভূতির উপায় তার আর রইল না।

চাঁদের জীবনের সমাপ্তির ঘটনা [অর্থাৎ মনসার পূজা করে সবকিছু পাওয়া] স্বপ্নের ইঙ্গিত না হয়ে যদি বাস্তব ঘটনাই হয় তাহলেও রূপকথার ঐ রাজপুত্রের মানসিকতার মিল আছে তার সঙ্গে। সর্বকামনার এই সুখসিদ্ধি,—আপন ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে এই সুখ অর্জন করে কি হবে, কে তা অনুভব করবে? কাজেই প্রশ্নটা স্নেহ-প্রীতির কাছে বীর্য-ব্যক্তিত্বের পরাজয় স্বীকারের নয়। অনেকেই এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। চাঁদ চরিত্রের ভিত্তিতে স্নেহ-প্রীতি যে একটি মূল উপাদান, তার বীর্য-ব্যক্তিত্বেরই অংশ সে আলোচনা আমরা আগেই করেছি।

কাজেই চাঁদসদাগর বাঁ হাতে ফুল ছুঁড়ে দিল কিনা সে আলোচনা অবান্তর। কাহিনীর এই সমাপ্তি অংশ কবির সচেতন সৃষ্টি এবং বলা যেতে পারে অপসৃষ্টি।

পাঁচ

বাস্তব-দৃষ্টিতে মনসামঙ্গলের বেহুলা পৌরাণিক সাবিত্রীর অনুসরণ। কিন্তু মনসামঙ্গলের

কবিদের, বিশেষ করে বিজয় গুপ্তের কল্পনায় সে প্রতীকধর্মী এক বিশিষ্টতা।

বেহুলার জীবনের যে কটা দিন সে সমাজ পরিবেশে বেড়ে উঠেছে তার চেয়ে সে অনেক বেশি আমাদের মন কেড়ে নেয় যখন সে বাস্তব পৃথিবী থেকে, এর সমাজ-পরিবেশ থেকে, এর মৃত্যু-বেদনা থেকে সুদূর রহস্যাবৃত মৃত্যু-অতীত রাজ্যে মহাপ্রস্থান করেছে। বাস্তব জগৎ থেকে এই রূপকথার রাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে আর মানবী-পরিচয়ে আমাদের কাছে সত্য নয়। মৃত স্বামীর শব-দেহ নিয়ে জীবন-কামনায় যাত্রা মানবিক চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক-দ্যোতনায়ই অধিক সত্য। যে 'সুকুমার ক্ষীণতনুলতা' প্রেম সর্বশক্তিমান মৃত্যুর মুখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে 'মৃত্যু তুমি নাই'—বেহুলার মধ্যে আমাদের সেই কামনার দীর্ঘশ্বাসকে অমৃতলোকের দিকে প্রেরণ করেছি। এ যেন চাঁদসদাগরের দীর্ঘস্থায়ী সংক্ষুব্ধ সংগ্রামের অবসানে একটি প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাসের লিরিক আর্তি। একের বেদনাকে এ যেন মুহূর্তে সকলের বেদনায় পরিণত করে। আমাদের নিত্যবৃত্ত জীবনে বাসনার প্রচণ্ডতা এবং বেদনার বিষণ্ণতার যুগপৎ ছায়াপাত ঘটে।

প্রসঙ্গ হাস্যরস

বিজয় গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গির দুটি বৈশিষ্ট্য কোন কোন সমালোচকের কাছে ধরা পড়েছে। [এক] তাঁর বাস্তবতা। [দুই] রঙ্গ-ব্যঙ্গের পরিবেশ-সৃষ্টিতে সার্থকতা।

অবশ্য বিজয় গুপ্তে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গ অধিক এবং সে রঙ্গ ঘটনা-বিন্যাসে, মুহূর্ত-নির্বাচনে এবং সিচুয়েসন-নির্মাণে, কখনও বা কোন চরিত্রের প্রতি সামান্য ইঙ্গিতে।

দু-একটি ঘটনার সাহায্যে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যেতে পারে।

চাঁদসদাগর বাণিজ্য-ব্যপদেশে দক্ষিণ-পাটন নামক 'হবুচন্দ্রের রাজ্যে' উপস্থিত হয়েছে। উপযুক্ত সহকারী ধনার চাতুর্যে এবং আপনার ব্যবসায়িক কৌশলে রাজার যে অবস্থা দাঁড়াল তার কৌতুককর বর্ণনা দিয়েছেন কবি :

> নারিকেল বদলে শঙ্খ জোড় হইল রে / তবু বলে সাধুর ধন দেড়া। / বাউস বদলে সুবর্ণ কলস লইল রে / তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।··· / কুকুর বদলে ঘোড়া ভাল হইল রে / তবু বলে সাধুর ধন দেড়া। / কবুতর বদলে ময়ূর লইল রে / তবু বলে সাধুর ধন দেডা।··· / হরিদ্রা বদলে সোনা ভাল হইল রে / তবু বলে সাধুর ধন দেড়া। / মুগ বদলে মুক্তা হইল রে / তবু বলে সাধুর ধন দেড়া।

একে বাণিজ্যিক বস্তু-বদল না বলে কবির ভাষায় বলা উচিত :

> চক্ষুর নিমেষে লুটে ডাকাতি করিয়া।

এ সত্ত্বেও চাঁদ মাঝে মাঝেই বলতে লাগল :

> এই দ্রব্য মাত্র আমি করিনু বদল। / দেশে গেলে স্ত্রী আমারে বলিবে পাগল ॥

এই বাক্‌পটুত্ব চাঁদসদাগরের চরিত্রকে কৌতুকাশ্রয়ী করে তুলেছে। চাঁদ এখানে ব্যক্তিমাত্রই নয়, ব্যবসায়িক শ্রেণীর প্রতিনিধি। পণ্যকে নয়, মুখের কথাকে সম্বল

করে বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করার নিপুণ কৌশল তার। সচেতন শব্দ যোজনায় এই কাব্যজাল-সৃষ্টির চমৎকার পরিচয় ফুটেছে চাঁদের মূল্যের গুণ-বর্ণনায়:

চান্দ বলে মহারাজ কর অবধান। / পৃথিবীতে বস্তু নাই ইহার সমান॥ / অতি ধবল দেখি কার্পাসের তুলা। / মৃত্তিকার হেটে জন্মে নাম ইহার মূলা॥
রাজা বই ইহা আর অন্যে নাহি খায়। / মূলা হেন দ্রব্য লোকে অতি ভাগ্যে পায়॥

নারকেল নিয়ে যে গল্প জুড়েছেন বিজয় গুপ্ত তা অতিশয়োক্তি তো বটেই, আজগুবিও। উচ্চ গাছের মাথায় যে ফল জন্মে তার মধ্যে জল কোত্থেকে এল, বিশেষ করে শুকনো খোসার অভ্যন্তরে, এ সমস্যায় চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন রাজার পারিষদবর্গ। তাঁরা গবেষণা জুড়ে দিলেন:

বিষম বাঙালী লোকে / প্রকারে মারিতে তোকে / তার লাগি আনিছে বিষফল। / সাধু বড় কহে সাঁচ / ডাঙ্গর দীঘল গাছ / মাথায় ছড়ায় ধরে ফল॥ / বুঝিনু কপট যত / বায়ু যেতে নাহি পথ / তাতে জল গেলেক কেমনে। / শাকবর্ণ বাহির কালা / ছুলিলে যে বার হয় বলা / লালবর্ণ হয় পরক্ষণে॥

সুতরাং 'রাজারে না খাইও নারিকেল।' লক্ষণীয় রাজ-পারিষদদের নানা যুক্তি এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এই যুক্তি-প্রমাণ-গবেষণার আড়ম্বর তাঁদের অনিবার্যভাবেই এক অতি সাধারণ ভুল সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছে, এখানেই কৌতুকের বীজ।

তাই তারা পরামর্শ দিল—আগে পরীক্ষা হোক। দ্বারবান উষা পরীক্ষক নির্বাচিত হল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সে পুত্র-পরিজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এল। বহু ক্রন্দন, অশ্রুপাত, অভিসম্পাত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উষা নারকেল-জল পান করল এবং ভয়ের আধিক্যে ও অভিনব স্বাদজাত [ধনা যে পূর্বেই নারকেল জলে খানিক চিনি মিশিয়ে দিয়েছিল এ কৌতুক ঘটনাও বিজয় গুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নি।] প্রথমত অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—

এ মত ফলের গুণ কহিব কাহাতে। / খানিক লাগিয়া স্বর্গ না পালাম হাতে॥

এবং

কহিতে কহিতে উষা আড় আঁখি হাসে। / খান দুই ছোলা লুকাইয়া থুইল পাশে॥ / অমৃত সমান বস্তু মাউগ পুত্রে খাবে। / স্বাদ পাইয়া রাজা কাহারে না দিবে॥

এখানে উচ্চহাস্যের মূলে দুটি কারণ আছে। পাঠক-সাধারণের কাছে নারকেল নিত্যকার একান্ত পরিচিত বস্তু। রাজ-আদেশে মানুষরূপী গিনিপিগের উপরে যখন অজ্ঞাত বস্তুর গুণাগুণ পরীক্ষা হতে চলল, উষার চিন্তা, মৃত্যুভয় এবং ক্রন্দন খুবই বাস্তব এবং মর্মবিদারী হতে পারত, কিন্তু এর গোড়ায় যে বস্তুটি তা আমাদের অতি পরিচিত

বলেই সমগ্র রসাবেদন অন্যপথ ধরল। হাস্য-স্রোত হয়ে উঠল অবাধ। দ্বিতীয়ত, নারকেলের স্বাদ পাবার পরে তার ব্যবহারে ঊষা চরিত্রের কৌতুকময়তার প্রতি অতি মৃদু বিদ্রূপের স্পর্শ মুহূর্তের জন্য ঝিকিয়ে ওঠে। যে নারকেলের জল পান করতে গিয়ে ঊষাদ্বারী চোখের জলে দেশ ভাসিয়েছে, নানা ঘটনার ঘনঘটার অবতারণা করেছে, পরে তাকেই দেখি নারকেলের দু-টুকরো খোসা সরিয়ে রাখতে, কারণ একবার স্বাদ পেলে মায় খোসা পর্যন্ত রাজা বাদ দেবেন না। ঘটনার বাঁকে বাঁকে এই জাতীয় সিচুয়েসন-সৃষ্টি কাহিনীগত সমস্ত কৌতুকের সার নিষ্কাশন করে।

তবে ঘটনা-বিন্যাসে এবং চরিত্র সঙ্কেতে কৌতুক চরমে উঠেছে চট-উপাখ্যানে।

চাঁদ সদাগর রাজাকে কয়েক খানা চটের খান দেখাতে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, এ গাছের বাকলে কি হবে? চাঁদ খুব আশ্চর্য হবার ভাণ করল। তারপরে কথার মালা গেঁথে অনায়াসে রাজাকে বুঝিয়ে দিল যে এ গাছের বাকল নয় মোটেই, অত্যন্ত টেঁকসই এবং অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র। মূলো উপাখ্যানে চাঁদের যে বাক্-বিন্যাস লক্ষ্য করেছি এখানে তার চেয়েও অনেক বেশি চাতুর্য প্রকাশ পেয়েছে :

> আমার দেশের জাতি জন কত আছে তাঁতি / বুনাইতে অনেক দিবস লাগে / কেবল ধীরের কাম বস্ত্র বড় অনুপম / প্রাণশক্তি টানিলে না ছিঁড়ে ॥ ··· / রাজার যোগ্য বসন না পরে সামান্য জন / অনেক শকতি ইহা কিনি। / যতনে রাখিয়া ঘরে সর্বকাল লোক পরে / বড়ই দুর্লভ চটের ভুনি ॥

চট-বস্ত্রের এই গুণকীর্তনের মধ্যে লুক্কায়িত অপর একটি ইঙ্গিতও দৃষ্টি এড়াবার নয়। বিজয় গুপ্তের আমলে বাংলার বহির্বাণিজ্য লুপ্ত হয়েছে। স্বর্ণপ্রসূ মসলিন ইত্যাদি হয়ত নামেই বেঁচে আছে, স্বর্ণপ্রসবের ক্ষমতা অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত। তাই সমসাময়িক বাঙালি বণিকের নৌকোয় মূলো আর চটের থানেরই প্রাধান্য। দক্ষিণ-পাটনের বাণিজ্যে চাঁদ পণ্যের উৎকর্ষে জয়ী হয়নি, কথার কৌশলে জয়ী হয়েছে। চট নিয়ে চাঁদের এই বাক্-বিস্তারে বাংলার প্রাচীনতম মসলিন-ব্যবসায়ের স্মৃতি জড়িয়ে কবির কৌতুক কটাক্ষে ব্যঙ্গের আমেজ লেগেছে।

চাঁদের বিবরণে রাজা মুগ্ধ। কারণ মনসা চাঁদের প্রতি যতই বিরূপ থাকুক না কেন তার জিহ্বাগ্রে যে সরস্বতীর অধিষ্ঠান দক্ষিণ-পাটনের বাণিজ্য তা সন্দেহাতীত-ভাবেই প্রমাণ করেছে। বহুমূল্য রাজ-বেশ দূরে ছুঁড়ে ফেললেন দক্ষিণ-পাটনের অধিপতি। তিনখানা চট নিয়ে :

> একখান কাছিয়া পিন্ধে / আর খান মাথায় বান্ধে / আর খান দিল সর্ব গায়।

এমনি অপূর্ব শোভায় সজ্জিত নৃপতি অন্তঃপুরেও কয়েকখানি চট পাঠিয়ে দিলেন, রাণীকে পরতে বললেন—'যেন দেখি জুড়ায় নয়ন'।

কিন্তু ক্লাইম্যাক্স এল এরও পরে। রাণী রাজকীয় হীরা-মুক্তা-খচিত, রেশম-পশমের বস্ত্র পরিত্যাগ করে চটের থান তো পরলেনই, ধাইকে ডেকে বললেন :

হেন মনে লয় ধাই পক্ষী হয়ে তথা যাই / চটের বসন আছে যথা ॥ / মিতার
ঘরে যত চেড়ী তারা পরে পাটের শাড়ী / বিদ্যাধরী হেন লয় মনে। / হেন
ছার দেশ ছাড়ি তথা যাইতে ইচ্ছা করি / একাসনে বসি সাধু সনে ॥

তখন ঘটনার অতিশয়োক্তিতে হাস্য উদ্দাম হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্তরালের ব্যঙ্গের স্বরটিও সম্ভবত দৃষ্টি এড়ায় না। মঙ্গলকাব্যে নারীদের বেশ-বিন্যাস এবং বেশ-বিলাসের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বস্ত্রের নামের দীর্ঘ তালিকা এবং পছন্দরূপ স্বর্ণ-হরিণীর পেছনে ছোটার কাহিনী আছে।[১] দক্ষিণ পাটন-রাণীর এই রুচি-বিপর্যয়ে ব্যঙ্গের আঘাত সেকালের সৌখীন নারীসম্প্রদায়কে বর্তেছে—এবং এর মৃদু কৌতুক বিজয় গুপ্তের কাল ভেদ করে এ-যুগ পর্যন্ত প্রসারিত।

ঘটনা-বিন্যাসের আজগুবি অতিশয়োক্তি, সিচুয়েসন-সৃষ্টির আকস্মিকতা, অর্ধস্ফুট ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনা, বাক্‌বিন্যাসগত চাতুর্য এবং দু-একটি চরিত্রের প্রতি কৌতুককর ইঙ্গিতে বাণিজ্য-পালার হাস্য বহুপরিমাণে রসিক মনের স্বীকৃতি পাবে।

তিন

বস্তু-বদল পালায় চরিত্র গৌণ। কিন্তু শিব-চরিত্র অঙ্কনে বিজয় গুপ্তের কৌতুকবোধ মূলত চরিত্রটিকেই অবলম্বন করেছে। ঘটনা সেখানে এই মানুষটির ব্যবহার ও কথাকে

১ জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। কবি এখানে বেহুলার বেশ-বিন্যাস বর্ণনা করছেন। একটু দীর্ঘ হলেও খুবই প্রাসঙ্গিক :

কাপড়ের পেটারি বালি আনে টান দিয়া।
থান কত বস্ত্র তোলে নিচিয়া বাছিয়া।
প্রথমে পরেন সাড়ী নামে যাত্রাসিদ।
নাটুয়ার নাট করে গায়ানে গায় গীত।
সে কাপড় পরিয়া বালি আগে পাছে চায়।
মনোরমা নহে কাপড় পেটারি পুরায়।
তার পাছে পরে কাপড় কাপড়ের রাজা।
সরুয়া কাকলি রামা মুষ্টে ধরে মাজা।
সে কাপড় পরে বালি আগে পাছে চায়।
মনোরমা নহে কাপড় খসিয়া ফেলায়।

এর পরে 'খুঞানেত্তা' নামক শাড়ি পরল, পছন্দ না হওয়ায় 'মগ্গাফুল' নামক কাপড় পরল। এ কাপড়ের সুতো তোলা প্রতি পঞ্চাশ টাকা মূল্য। কিন্তু তাও পছন্দ হল না। অবশেষে :

তাহার পাছে পরে সাড়ী নামে অগ্নিফুল।
কাপড়া সুন্দরী হুহে হইল সমতুল।
সে কাপড় পরিয়া বালি আগে পাছে চায়।
মনোরমা হইল কাপড় নাচিয়া বেড়ায়।

ধরেই হাস্যের রাজ্যে পৌঁছেছে—বিন্যাসগত অভিনবত্ব বা সিচুয়েসনজাত আকস্মিকতা লেখকের হাস্য সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে গৃহীত হয়নি।

হিউমারের মধ্যেও কৌতুকহাস্যের পশ্চাতে বেদনার অশ্রুসজলতা সর্বত্র সুলভ নয়। উচ্চস্তরের দু চার জন কৌতুকরসিকই এ জাতীয় হিউমার সৃষ্টির যোগ্যতা রাখেন। তাই উক্ত রসের সাধারণ লক্ষণ এ নয়। একথা মনে রেখে বলা চলে যে শিব-চরিত্রের রসানুপ্রেরণা হিউমারজাতীয়। আসলে চরিত্রাশ্রয়ী হাস্যই হিউমারের আধার।

অধ্যাপক অ্যাডাম ফক্স হিউমারের সামান্য লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'Humour is the exhibition of individual peculiarities of an entertaining character'। বিজয় গুপ্তের শিব একটি 'entertaining character'। এবং তার 'individual peculiarities'-এর বর্ণনাই স্বর্গকাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ। তাই একে হিউমার আখ্যা দেওয়া খুব অসমীচীন হবে না।

ভারতচন্দ্রের শিব-কল্পনায় অনেক সমালোচকের ধর্মবোধ আহত হয়েছে। কিন্তু শিব মানুষটি বাঙালি কবির কাছে প্রায় কখনই খুব গুরুগম্ভীর চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয় নি। একমাত্র নাথপন্থীদের হাতে ছাড়া শিব হয় চাষী, নয় দরিদ্র গৃহস্থ, কিংবা ভিক্ষুক অথবা ইন্দ্রিয়-শিথিল ব্যক্তিরূপে বাংলা শিবায়ন, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলে হাসির খোরাক জুগিয়েছে। কোথাও কখনও যে তাকে ধ্যানস্তব্ধ দেখিনি তো নয়, কিন্তু কবিরা নির্ভুলভাবে এ ধ্যান যে ভাঙের ক্রিয়া অথবা কামদেবের শরে জাগরিত হবার সাগ্রহ অপেক্ষা তা নির্দেশ করতে ভোলেননি। বাংলা যাত্রায় বা পুরাণাশ্রিত কাব্যাদিতে নারদ মুনির ভূমিকার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এর মিল থাকলেও মূলে পার্থক্য আছে। নারদ হাসি জুগিয়েছে কিন্তু নিজেও ভাঁড়ের পর্যায়ে থেকে গিয়েছে। শিব কিন্তু তার যাবতীয় অসঙ্গত অদ্ভুত আচরণ সত্ত্বেও আপন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেই আমাদের সস্নেহ-সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। বাংলা সাহিত্যে শিব সিরিয়াস নয়, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভাঁড় হিসেবেও তাকে চিহ্নিত করা হয়নি।

বিজয় গুপ্তের শিব শিথিল-চরিত্র দরিদ্র গৃহস্থ। দেবসমাজে তার সত্যকার কোন মর্যাদা নেই, কিন্তু পেছন থেকে মর্যাদাবোধ উদ্রিক্ত করে নারদ প্রমুখ মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে মজা দেখে। অল্প প্রশংসায় সে গলে যায়, তখন বিষ খাওয়ার মতো সাংঘাতিক কাজও তাকে দিয়ে অনায়াসে করিয়ে নেওয়া যায়। আবার সামান্যেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাণ্ডব বাধিয়ে দেয়। শিবের আনন্দ-বেদনার মাত্রা এবং তার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে শিশুসুলভতা তাকে আরও কৌতুকাশ্রয়ী করে তুলেছে। মনসার বিষে চণ্ডীর মূর্ছা দেখে তার উচ্চৈঃস্বরে রোদন কিম্বা বচাই-এর জীবন-প্রাপ্তিতে 'নাচে শিব দিয়া বাহু নাড়া' দেখে চরিত্রটির উপভোগ্যতায় আমাদের আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বিজয় গুপ্তের শিব ইন্দ্রিয়-শিথিলতার জন্য আরও কৌতুককর হয়ে উঠেছে

পাঠকদের কাছে। শিবের চরিত্রে গৌরীর সন্দেহ, আঁচল বেঁধে নিদ্রা, গ্রন্থি ছেদন করে শিবের পলায়ন আমাদের কৌতূহলী করে। কিন্তু এই কৌতূহল উচ্ছ্বসিত কৌতুকে ভেঙে পড়ে গৌরী যখন ডোমবধূর বেশে শিবকে ছলনা করবার জন্য নদীর ঘাটে উপস্থিত হল। যাবার সময়ে যে মানুষটি 'পার হইয়া না দেয় খেয়ার কড়ি' সে-ই যে তার স্বামী শিব, চণ্ডিকা সহজেই চিনতে পারে। ফিরবার পথে ডোমিনীর ছদ্মবেশে গৌরী তাই বলে :

গণিয়া বাছিয়া আগে খেয়ার কড়ি দে। / কড়ি না পাইলে তোরে পার করে কে॥

শিব সহজেই ঝুলিটি দেখিয়ে উত্তর দেয় :

পার হইয়া না দেব কড়ি তোমার মনে বাসে॥ / হের দেখ কান্ধে ঝুলি সকল ধন আছে।/ যেই ধন চাও সেই ধন দিব নাও আন কাছে॥

এই বলে সে ঝুলি নাড়াচাড়া করল এবং একটিও কড়ি নেই দেখে ভ্রূকুটি করে সের চারেক ভাঙ-ধুতুরা মুঠি মুঠি খেয়ে নিল। পরে বলদ নিয়ে কথা উঠলে শিব বলল—একে নিয়ে আর অসুবিধেটা কি? নৌকোয় না ধরে তো সাঁতরে পেরুবে। কতটুকুই বা ওজন এর গায়ে? 'আমার বলদের গায়ে তুলা হেন ভার।'

বিজয় গুপ্তে শিবের ইন্দ্রিয়-শিথিলতা এই পর্যন্তই কৌতুকসৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে, এর পরে তা প্রত্যক্ষ কামুকতার পথ ধরেছে, কৌতুক সেখানে সংকুচিত।[১]

৫.২ নারায়ণদেব/মনসামঙ্গল

এক

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে করুণরস স্থায়ী রস হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। সেকালের বাংলা কাব্যে এই আদর্শের অনুসরণ চলেছে। মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা ছাড়া তাই সত্যকার করুণরসাত্মক কাব্য চোখে পড়ে না—অন্তত আখ্যান-কাব্যের রাজ্যে। মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনীর আকারটি মোটামুটি এমনটা ছকে বাঁধা যে দেবপূজায় ও সর্বপ্রাপ্তির সিদ্ধিতে এর সমাপ্তি, তাই করুণরসাত্মক হয়ে উঠবার সুযোগ এদের মধ্যে অল্প। ধর্মমঙ্গলে যুদ্ধ ঘটনার অতি বর্ণনার চাপে করুণরস তেমন স্ফূর্তি পায়নি। চণ্ডীমঙ্গলে সামান্য দু-একটি স্থানে যে ক্রন্দন ধ্বনিত হয়নি এমন নয়, তবুও সে বেদনা গভীর আত্মায় সঞ্চারিত হয়ে তীব্র হাহাকারে এর মূল তারকে ঝঙ্কৃত করেনি। মনসামঙ্গলেই একমাত্র এমন একটি কাহিনী-কল্পনা আছে যেখানে করুণরসের ভূমিকা প্রধান।[২]

১. পরের অধ্যায়ে করুণরস সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্তের নিপুণতার বিশ্লেষণ আছে।

২. এই প্রসঙ্গে একটি কথা লক্ষণীয় যে একালে 'রস' শব্দটিকে আমরা সাধারণভাবে 'সাহিত্যিক স্বাদ'—এই অর্থেই গ্রহণ করে থাকি, সেকালে অলঙ্কার শাস্ত্রে শব্দটির সঙ্গে যে বিশেষ পারিভাষিক অর্থ জড়িয়ে ছিল বর্তমানকালে কাব্যবিচারে তার সম্যক্ প্রয়োগ ঘটে না।

মনসামঙ্গলের কাহিনী চাঁদসদাগরের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে আবর্তিত হয়ে জীবনে বিপর্যয়ের যে প্রবল গম্ভীর হাহাকার মন্দ্রিত করে তুলেছে তাকে কেবল করুণ না বলে ট্রাজিক বলাই সঙ্গত। তা ছাড়া এই কাব্যের অকাল মৃত্যুর ঘটনাগুলি বিশেষ করে লখীন্দরের মৃত্যু ঘটনা হিসেবে করুণরসের বিষয় হবার সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু বস্তুগত সম্ভাবনা রূপায়ণ সার্থকতায় কোথায় সমুন্নীত—তাই আমরা সন্ধান করব ; এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলের কথা মনে পড়ে। অন্য কবিদের কথা প্রসঙ্গক্রমে আসবে।

দুই

এ বিষয়ে বাধা দুটি। [১] মঙ্গলকাব্যের ছকে বাঁধা কাহিনী-বিন্যাস ও চরিত্র-কল্পনার মধ্যে, কবিদের প্রথানুসরণের আগ্রহে এবং আপন ক্ষমতা ও প্রবণতা সম্পর্কে সজ্ঞানতার অভাবে কারও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। [২] নারায়ণদেবের কাব্যের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোন সংস্করণ প্রচলিত নেই। ড. তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটি নানা কারণে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। 'বাইশ-কবির মনসামঙ্গলে' আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত অংশ এবং 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে' দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত অংশটুকু সন্দেহাতীত বলে মনে হয়। কিন্তু এগুলি একান্তই অসম্পূর্ণ। কাজেই সংশয়পূর্ণ এবং সংশয়াতীত উভয় প্রকার উপকরণের সাহায্যেই আমাদের বক্তব্যকে দাঁড় করানো ছাড়া উপায় নেই।

তিন

নারায়ণদেবের করুণরস সৃষ্টির সার্থকতা বিজয় গুপ্ত এবং ক্ষেমানন্দের সঙ্গে তুলনায় বিচার্য। প্রথমেই লখীন্দরের মৃত্যু-ব্যাপারটির কাব্য-রূপায়ণে এঁদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেওয়া যাক। ক্ষেমানন্দের কবিতায় লখীন্দরের মৃত্যু ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেহুলার আর্ত ক্রন্দনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে লোকলজ্জার প্রশ্নটিই যেন গুরুত্ব পেয়েছে :

> নরলোকে কবে কি। / বেহুলা বান্যার ঝি ॥··· / খাইলু আপন পতি / কে মোরে বলিবে সতী ॥

আবার,

> বিভার মঙ্গল রাতি / খাইল প্রাণের পতি / কলঙ্ক ঘোষিব লোকে ॥

এর মধ্যে বেহুলার চরিত্রের গর্বিত ভাবটিই সমস্ত ক্রন্দনরোল ভেদ করে ফুটে উঠেছে— 'সহিতে না পারি আমি দুরক্ষর বাণী' এই আত্মমর্যাদার সুর বেহুলার চরিত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে কেতকাদাসের কাব্যে।

নারায়ণদেব ও বিজয় গুপ্তের বেহুলা কিন্তু অনেক কোমল এবং করুণ। উভয় কবিই বেহুলার ক্রন্দনের মধ্যে যৌবনের ক্রন্দন শুনেছেন। এক রাত্রির লজ্জার বাধায়

যেরা স্বপ্নমিলনের পরে চিরকালীন বিরহের বেদনায় আকুল হয়ে উঠেছে নারায়ণদেবের বেহুলা :

হাসি হাসি দেয় মোরে অঙ্গে আলিঙ্গন। / তবে সে যুড়াএ প্রভু অভাগীর প্রাণ॥,
বিশুদ্ধ কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতিঃ। / অকালেতে রাড়ী হৈলুম শুন প্রাণপতি॥

নারায়ণদেবের বেহুলার এ ক্রন্দনের সঙ্গে বিজয় গুপ্তের তুলনা চলে। তাঁর বেহুলা বলে :

বিয়ার রাতে প্রাণপতি মাগিল আলিঙ্গন। / লজ্জা করি অভাগিনী নাহি দিল মন॥ / মুই ত না জানিলাম প্রভু হইবে এমন। / গা তোল প্রভু মোরে দেও আলিঙ্গন॥

এর পরে অবশ্য কবি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু কিছু পরেই আবার বিজয় গুপ্তের বেহুলার কণ্ঠে অশাশ্বত যৌবনের চিরকালীন আর্তি ধ্বনিত হয়েছে :

আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল। / নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কত কাল॥ / সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বান্ধিব। / হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাইয়া পাব॥

সনকার অপবাদে বেহুলাকে দিয়ে যুক্তিপূর্ণ আপত্তি তুলেছেন বিজয় গুপ্ত—'তোমার ছয় পুত্র মৈল সেও কি আমার দোষ'। কেউ বলেন বেহুলা চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্য এতে বিনষ্ট হয়েছে। অনেকে বলেন ব্যক্তিত্বের বিস্ফোরণ। সনকার অপবাদে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ক্ষেমানন্দের বেহুলা কিন্তু নীরব।

নারায়ণদেবের বেহুলা হিন্দু সমাজ সংস্কারানুযায়ী স্বামী মাহাত্ম্য কীর্তন করেছে 'স্বামী ব্রহ্মা স্বামী বিষ্ণু' প্রভৃতি, কিন্তু তাতে করুণরসের সহজ আন্তরিকতা ব্যাহত হয়েছে বলেই মনে হয়।

সনকার বেদনার্ত চিত্রে ক্ষেমানন্দ বিশেষত্বহীন। বেহুলার ভাগ্যকে দোষারোপ এবং আকুল ক্রন্দনেই তার পরিচয়। বিজয় গুপ্তের সনকাও বধূকে দোষ দিয়েছে। তবে কবি সনকার বেদনার প্রকাশে বেশ নাটকীয় ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। সনকা বিয়ের পরের প্রভাতে বরণডালা সাজিয়ে বাসরে প্রবেশ করেছে :

মায় নিল বরণসজ্জা বরিবার তরে। / লখাইরে বরিব আজি মনে কুতূহলে॥

এমন সময়ে :

এক সখী উঠি বলে তোর বধূ কেন কান্দে॥

শুনেই সনকা হাহাকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। নাটকীয় বৈপরীত্যে সনকার বেদনার প্রকাশ বেশ তীব্র এবং মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

নারায়ণদেবের সনকা কিন্তু এক বিষয়ে আশ্চর্য স্বতন্ত্র। বিজয় গুপ্ত বা ক্ষেমানন্দের মত সে পুত্রের মৃত্যুর অপরাধ বেহুলার উপরে চাপায়নি,

সর্ব গুণ বধূর তিলেক দোষ নাই। / যে বলিমু বধূর দোষ মৈলেক লখাই॥

পুত্রহারা জননীর কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। কাউকে দোষ দিতে পারার যে

সামান্য মানসিক স্বস্তি তা থেকেও সে তাই বঞ্চিত। সনকার শোকার্ত ভাবটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর ফুটেছে লখীন্দরের মৃত্যুপূর্ব কথায় :

আহ্মা শোকে জননীএ তেজিব অন্নপানী। / আহ্মার মরণে মায় হৈব পক্ষিণী ॥

চাঁদসদাগরের শোকমূঢ় চিত্র অঙ্কনেও আলোচ্য তিনজন কবি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষেমানন্দ-অঙ্কিত চিত্রটি অতিরিক্ত রূঢ়তায় হৃদয়হীনতার পর্যায়ে নেমে গেছে। চিত্ত দয়া-মায়া-স্নেহহীন করে আঁকলে চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং কঠোরতা সহজেই দেখানো যেতে পারে, কিন্তু তার অস্বাভাবিকতা পাঠককে আহতই করবে। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে ক্ষেমানন্দের চাঁদ বলল :

ভাল হৈল পুত্র মৈল, কি আর বিষাদ। / কানী চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ ॥ / ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলিছে চাঁদ বাণ্যা। / কানীর উচ্ছিষ্ট মড়া ফেল নিয়া টান্যা ॥। ঝাট কর্যা কাট নাড়া রামকলার পাত। / মৎস্য পোড়া দিয়া আজি খাব পান্তাভাত।

এই অস্বাভাবিকত্বের কবি-কৃত ব্যাখ্যা :

মনসার হটে তার মরে সাত পো। / নিষ্ঠুর শরীরে তার নাহি মায়া মো ॥

আমাদের নিশ্চিন্ত করে না। কঠোরতার অন্তরালে প্রবাহিত বেদনার ফল্গুধারাটির কিছু পরোক্ষ প্রমাণ এখানে থাকলে তবেই চাঁদ চরিত্রের তাৎপর্যটি উদ্ঘাটিত হত। কবি যদি এই প্রবল আঘাতে চাঁদসদাগরের মস্তিষ্ক বিকৃতিও দেখাতে চাইতেন, [কবির রচনাই কিন্তু প্রমাণ যে এ-চাঁদ সুস্থ চিত্তের মানুষ]—তা হলেও এই চিত্রের তাৎপর্য বোঝা যেত।

অন্যদিকে বিজয় গুপ্তের চাঁদের ক্রন্দন চারিত্রবীর্য নিরপেক্ষভাবেই আর্তবেদনায় ভেঙে পড়েছে :

লোহার ঘরে দেখে সাধু লখাইর মরণ। / আহা পুত্র বলি সাধু হৈলা অচেতন ॥ / ক্ষণেক চেতন পাইয়া সাধুর নন্দন। / পুত্র পুত্র বলি ডাক ছাড়ে ঘন ঘন ॥ / কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর। / চম্পকের রাজা আমার বালা লখীন্দর ॥ / বিধুমুখে বাপ বলিয়া আর না ডাকিলা। / চম্পক রাজ্য তুমি কারে দিয়া গেলা ॥

এর মধ্যে চাঁদসদাগরের বীর্য প্রকাশিত নয় ঠিকই কিন্তু বীর্যবান চরিত্রের অনুভূতির প্রত্যেকটি স্তরে এই বীর্য প্রকাশিত হবেই এমন মনে করাও ঠিক নয়। মধুসূদনের রাবণ মেঘনাদের মৃত্যুতে যে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল তার সঙ্গে যেন এর কিছুটা তুলনা চলে :

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে / এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;— / সঁপি রাজ্যভার, পুত্র তোমারে করিব / মহাযাত্রা !

ক্ষেমানন্দের চাঁদ বলেছে 'কানীর উচ্ছিষ্ট মড়া ফেল নিয়া টান্যা।' মৃত পুত্রের দেহ সম্পর্কে পিতার এই উক্তি বর্বর বীর্যের পরিচায়ক না হয়ে গ্রাম্য অমনুষ্যত্বের প্রতিফলন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহাকাব্যের 'বর্বর' বীরেরা পুত্রের মৃতদেহটিকেও যেন

স্নেহ-কোমলতায় আবৃত করতে চেয়েছে। বিজয় গুপ্তের চাঁদসদাগরের আত্মজের প্রতি এক অপূর্ব মমতা ব্যক্ত। চন্দন কাষ্ঠে সৎকারের কথা বলেছে সে, বেহুলার প্রস্তাবে প্রথমে শিউরে উঠেছে :

যাহার ঘরে যাবা তুমি সেই প্রাণেশ্বর। / শৃগালে কুকুরে খাবে মোর লখীন্দর ॥
অবশেষে সকলের অনুরোধে রাজি হয়ে ভেলা নির্মাণের ব্যবস্থা করেছে :

মন দিয়া গড়াও মাজুষ না করিও হেলা। / মাজুষে বাণিজ্য যাবে লখীন্দর বালা ॥
শেষ পঙ্‌ক্তির এই মৌন হাহাকার নিঃসন্দেহে অন্তর বিদীর্ণকারী।

নারায়ণদেবের চাঁদ এই সঙ্কটমুহূর্তে অন্যদিক থেকে আশ্চর্য সার্থক কবি-কল্পনার পরিচয় বহন করে। তীব্র মনসা-বিদ্বেষ ও বীর্য এবং করুণ বেদনা এই চরিত্রে কবি মিলিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন :

চান্দো বলে পুত্র চাহিমু গিয়া পাছে। / বিচারিয়া চাহি নাগ কোন খানে আছে ॥ / বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া। / কান্দিতে লাগিলো চান্দো বিসাদ ভাবিয়া ॥··· / ডাল মূল গেল মোর মৈদ্ধ হৈল সার। / অখনে কানির সনে চাপি করো বাদ ॥ / যদি কানির লাইগ পাম একবার। / কাটিয়া খুজিব আমি মরা পুত্রের ধার ॥

কিন্তু :

চান্দো বলে এক দুঃখ মৈল সাত বেটা। / তাহা হইতে অধিক দুঃখ কলা যাইব কাটা ॥

সমস্ত সুর যেন কেটে দেয়। এই সামান্য স্বার্থবুদ্ধি চাঁদকে হীনতার স্তরে অবনমিত করে। বস্তুর জন্য বিপুল কামনা এ নয়। বরং পুত্র-মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে একে একান্তই অস্বাভাবিক আরোপ বলে মনে হয়।

চার

করুণরস সৃষ্টিতে নারায়ণদেবের বিশিষ্টতার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে কাব্যের সমাপ্তিতে। আপন কাব্যের এই সমাপ্তি-কল্পনা নারায়ণদেবের নিজস্ব। অন্য মনসামঙ্গলে এর সাক্ষাৎ মেলে না।

চাঁদ মনসার পূজা করল। পুত্র পরিজনে তার গৃহ পরিপূর্ণ। কিন্তু স্বপ্নের মতোই এই সুখ যেন অলীক, স্বপ্নের মতোই ক্ষণস্থায়ী, তাই বেহুলা-লখীন্দরের সংসার করা আর ঘটে ওঠে না। স্বর্ণমৃগের মতো, স্বর্ণ-তৃষিতের স্বর্ণ-স্বপ্নের মতো গোধূলির দিগন্তে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই তার অন্তর্ধান ঘটে। লখীন্দরের মৃত্যু এবং বেহুলার স্বর্গযাত্রাই মহাপ্রস্থান যাত্রা। এর পরে চাঁদ কোনদিনই তাদের বাস্তবত ফিরে পায়নি। স্বপ্নে একবার দেখা দিয়ে বেদনার ক্রন্দনকে তীব্রতর করে চিরকালের মতো তারা বিলীন হল।

পাঁচ

চাঁদ-জীবনের শেষ পর্বের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ট্রাজিক উপলব্ধির প্রকাশে নারায়ণদেবের করুণরসসৃষ্টি সার্থক। মধ্যযুগের কবিরা চাঁদের যে পরিণতি এঁকেছেন সে সম্পর্কে সৌন্দর্যজিজ্ঞাসার দিক থেকে আমাদের সাধারণ অভিযোগের কথা আগেই বলেছি। চাঁদের চরিত্রের সঙ্গতি রাখতে গেলে তাকে দিয়ে মনসা পূজা করান যায় না। আবার মনসা পূজা না করালে কাব্যটির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়, মধ্যযুগের ধর্মবুদ্ধি আহত হয়। নারায়ণদেবেও চাঁদের মনসা পূজায় এই একই অসঙ্গতি। কিন্তু হারানো জীবন ও সম্পদ নিয়ে বেহুলার আগমন থেকে শুরু করে মনসা পূজার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চাঁদের চিত্তলোকের যে তরঙ্গোৎক্ষেপ কবি বর্ণনা করেছেন বিপরীত বৃত্তির আঘাতে তা দ্বন্দ্ব-গভীর।

সনকা যখন মনসা পূজা করে মৃত্যুলোক থেকে প্রত্যাগত পুত্র-সম্পদ ঘরে তুলতে বলল, চাঁদ গর্জন করে উঠল :

চান্দে বলে সোনাঞি তোর হইল কুমতি।/ কোন কার্য সাধিব পূজিব পদ্মাবতী ॥ / জানি যাউক যে ধন জন আমার নিছনি। / কণ্ঠে বাণী থাকিতে না পূজিব লঘু কানী ॥

বেহুলা গিয়ে নৌকায় চড়ে স্বর্গাভিমুখে নৌকা ভাসিয়ে দিল। সনকার ক্রন্দন, আত্মহত্যার ভয় দেখানো চাঁদকে বিচলিত করল মাত্র, সঙ্কল্পচ্যুত করল না। ব্রাহ্মণদের অনুরোধ, প্রজাদের আকূতি, আত্মীয়বন্ধুদের উপরোধ—কবি চাঁদের চারপাশে আত্মীয়-বান্ধব-প্রজাকুলের এক বিরাট সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের অনুরোধের বাণীটি উচ্চ করে তুলেছেন। সামনে হারিয়ে পাওয়া পুত্র-সম্পদ বুঝি আবার হারিয়ে যায়। কিন্তু পুত্রধন দিয়ে কি হবে, মনুষ্যত্বই যদি বিকিয়ে দিতে হয়—

কি করিব পুত্রে মোর কি করিব ধনে। / না পূজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে ॥

শেষপর্যন্ত চাঁদ সর্ত আরোপ করে :

পিছ দিয়া বাম হাতে তোমারে পূজিম ॥

এবং

আমার নামে চান্দোয়ায় টাঙ্গাও ত উপরে ॥

অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের রীতি সে যুগের কাব্যে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু এই ঘটনাগুলি অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার প্রতিক্রিয়ায় অবক্ষয়েরই প্রতিফলন। এখানেই চাঁদ চরিত্রের গভীর ট্রাজেডি। মনসা পূজায় তার উল্লাস-আনন্দের যে চিত্র এর সঙ্গে সংযুক্ত তা কবিদের ধর্মবোধের আরোপ মাত্র।

৫. ৩. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ / মনসামঙ্গল

এক

মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। ড. সুকুমার সেনের মতো প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমালোচক তাঁকে এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন : 'মনসামঙ্গল পাঁচালীর মধ্যে রচনাগৌরবে এবং প্রচার বাহুল্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে ক্ষেমানন্দের [বা ক্ষমানন্দের] কাব্য'।[১] তাঁর মতে 'কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও কাশীরাম যেমন যথাক্রমে শ্রীরাম-পাঁচালী, চণ্ডীমঙ্গল ও ভারত পাঁচালী কাব্যের শ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ক্ষেমানন্দও তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যের।' মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্যও এঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে সম্মান জানিয়েছেন।[২] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ভূমিকায় দাবী করেছেন; 'এই দীর্ঘ মনসামঙ্গল গ্রন্থ পাঠ করিলে কবি যে তাঁহার সমসাময়িক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির গৌরবের অধিকারী ছিলেন, তাহা অনুমান করা শক্ত হইবে না।'

বলা যেতে পারে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ কবি হিসেবে ভাগ্যবান। বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকেই তাঁর উপরে প্রশংসাবাণী বর্ষিত হয়েছে। কাজেই তাঁকে বাদ দিলে প্রাচীন কাব্যের সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

দুই

কেতকাদাসের রচনারীতি রুচিবান পাঠককে সহজেই মুগ্ধ করে। মধ্যযুগের কাব্যের পাঠক যখন এ ব্যাপারে কবিদের চরম অবহেলা দেখতে দেখতে একটা বিরক্তিকর অভ্যস্ততার মধ্যে গিয়ে পড়েন তখন মুষ্টিমেয় অপর কয়েকজন কবির সঙ্গে কেতকা-দাসের বাচনভঙ্গির পরিচ্ছন্নতাও তাঁকে খুশি করে। মনসামঙ্গলের এই কবি যে অবহেলাভরে লেখাকেই শৈল্পিক আদর্শ বলে গ্রহণ করেননি এটা এ যুগের পাঠকের ভালো লাগবার কথা। মঙ্গলকাব্যের কবিরা সাধারণত প্রথাকে অনুসরণ করেই নিশ্চিন্ত, ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার প্রয়োগে মার্জিত রুচি যে কাব্যরচনায় অনিবার্য এ সত্যে তাঁদের অনেকেরই আস্থা ছিল না। ফলে ভাষাপ্রয়োগে গ্রাম্য শব্দের অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক ব্যবহার, ভাষার সংগীত-ধর্মের উপরে আদৌ গুরুত্ব আরোপ না করা, ছন্দে অজস্র স্খলন চোখে পড়ে। মনসামঙ্গলের পূর্বতন শক্তিশালী কবি নারায়ণদেব অমার্জিত ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির জন্যই বোধ হয় অনেক দুর্বল ক্ষমতার অধিকারী কেতকাদাসের কাছে যশের পরিমাপে হেরে গেছেন।

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ড. সুকুমার সেন

২. বাইশ-কবির মনসামঙ্গল [ভূমিকা]—আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

কেতকাদাসের এই সুমার্জিত এবং সঙ্গীতরসাত্মক ভাষার প্রধান গুণটি হল আতিশয্যহীনতা। পড়বার সময়ে এই কাব্য সহজে রুচিবান চিত্তকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কবির ভাষাপ্রয়োগের সচেষ্টতা কোথাও অতিপ্রকট হয়ে ওঠে না। তাঁর অধিকাংশ শ্লোকে যে অনুপ্রাসের ধ্বনিসাম্যকে মৃদুভাবে ব্যবহার করে একটা সুরের রেশ প্রবাহিত রাখা হয়েছে তা সতর্ক পাঠক ব্যতীত অন্যের চোখেও পড়বে না। কৌশলকে গোপন করার মধ্যেই তার সার্থকতা। এ সিদ্ধি আয়ত্ত করেছিলেন কেতকাদাস। বাচনভঙ্গির এই পরিচ্ছন্নতার জন্য যে প্রশংসা কবির প্রাপ্য ততটুকুর বেলাতে আমরাও অবশ্যই কার্পণ্য করব না।

কিন্তু এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গোবিন্দদাস বা ভারতচন্দ্রের ভাষা ও অলঙ্কাররীতি যেমন তাঁদের কবিব্যক্তিত্বের গভীরতা থেকেই উৎসারিত কেতকাদাসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। রুচিপূর্ণ ভদ্র ব্যবহার আর চরিত্র এক বস্তু নয়। ভারতচন্দ্রের কবি-চরিত্র তাঁর পোশাকের ভদ্রতায় প্রতিফলিত। কেতকাদাসের ব্যক্তিচরিত্রের সঙ্গে তার ভদ্র আবরণের অস্ত্যর্থক বা নঞর্থক কোন সম্বন্ধই আবিষ্কার করা যায় না। এমন হতে পারে কোন কবি আপন জীবন-দৃষ্টি ও কাব্যবস্তু নিরপেক্ষভাবেই অলঙ্কার প্রয়োগে অতিপ্রবণতা দেখাচ্ছেন। এই প্রবণতা সাহিত্যবিচারে প্রশংসা পাবে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য কবির কবি-চরিত্রের উপরেও আলোকপাত করবে। আবার জীবন-বোধের বিশেষ ভঙ্গিজনিত অতি অলঙ্কারপ্রবণতা কোন কোন কবির রচনায় দেখা যেতে পারে। অলঙ্কার প্রয়োগ-বাহুল্যের জন্য তাঁকে নিন্দা করা যাবে না। কেতকাদাসে এর কোনটিই ঘটেনি। অনুপ্রাস প্রয়োগ শব্দযোজনার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে মিলে সঙ্গীতরসের সৃষ্টি করে এ কাব্যকে যে কিছু শ্রুতিসুখকরতা দান করেছে তা আগেই বলেছি। বিচ্ছিন্নভাবে ভাবলে অলঙ্কার প্রয়োগ প্রসঙ্গে কেতকাদাস একান্ত বিশিষ্টতাহীন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য—'অতি স্বাভাবিকভাবে যে সকল অলঙ্কার কবির কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সৌন্দর্য ও প্রয়োগ-কুশলতা অলঙ্কার-রসিক মাত্রকেই তৃপ্তি দান করিবে।'—কেতকাদাসের কবি-প্রকৃতি বুঝতে বিশেষ সাহায্য করে না। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অলঙ্কাররসিক ও কাব্যরসিকের মধ্যে অনেক ব্যবধান। সংস্কৃত রসশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ প্রাচীন কালেই তা স্বীকার করেছেন।

কেতকাদাসের কাব্যে 'অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, মালোপমা রূপক, অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত-নিদর্শনা, অর্থাপত্তি কাব্য লিঙ্গের প্রয়োগ আছে।' কিন্তু এই অলঙ্কারগুলির প্রয়োগ তাঁর কাব্যে এতই বিশেষত্বহীন ও সংস্কৃত রীতি-অনুসারী যে এদের নিয়ে আলোচনা কাব্যসৌন্দর্য-বিচারে একরূপ অর্থহীন। বালিকা মনসা বিমাতা চণ্ডী কর্তৃক যখন অত্যাচারিত হচ্ছিল তখন বিজয় গুপ্ত উপমায় বলেছেন :

ব্যাধের হাতে পড়ি যেন পক্ষীর কলকলি।

পক্ষীশাবকের আশঙ্কিত ও আর্ত কলরোল এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিংবা মৈমনসিংহ গীতিকার কবি যখন মহুয়ার রূপ বর্ণনা করে লেখেন :

আগল ডাগল আঁখিরে আসমানের তারা।

তখন চক্ষুতারকার নক্ষত্রচারী সুদূরাভিসার হৃদয়কে আকুল করে। আর দস্যু কেনারামের উপমা :

হাত পায়ের গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুর উপমা প্রথানুসরণের রাজ্য থেকে পাঠককে মুক্তি দেয়। মুকুন্দরাম শিশু কালকেতুর বাহুর সঙ্গে লোহার শাবলের, সমুন্নত দেহভঙ্গির সঙ্গে শিশু শালের উপমা দিয়েছেন। এদের অভিনবত্ব কাব্যসৌন্দর্য বর্ধনে সহায়ক, তাই আলোচনার বস্তু। কিন্তু কেতকাদাসের :

বিজুরি জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।

অথবা

মধুর মধুর কথা কহেন হরিষে / পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরষে ॥ /

বস্তু-সঞ্চয়ে যেমন অতিব্যবহৃত জীর্ণতার অনুসারী, তেমনি উপস্থাপনার ভঙ্গিও একান্ত মামুলি হওয়ায় তাৎপর্যহীন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের কবি কেতকাদাস এই অলঙ্কারের মূলধনে কাব্য-কৃতিত্বের পরীক্ষায় অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেন না। অবশ্য গাভীর শ্বেত দেহবর্ণের উপমায় কবি সুন্দর বলেছেন :

মল্লিকা ফুলের মত তার ধৌত তনু।

তবে এ জাতীয় সার্থক-সুন্দর উপমার সংখ্যা এ-কাব্যে বেশি নেই।

মঙ্গলকাব্যের রচনারীতিতে চিত্রের স্থলে তালিকা-বর্ণন একটি সাধারণ বিশেষত্ব। কাব্যধর্মের বিচারে এই বিশেষত্ব প্রশংসার নয়। কেতকাদাসে তালিকা নির্মাণ প্রায় চরমে পৌঁছেছে। পক্ষিগণের আগমন প্রসঙ্গে সত্তর রকম পাখির নাম, রাখালদের ষাট-সত্তরটি গরুর নাম, প্রায় ষাটটি সাপের নাম, পঁচিশটির বেশি ফুলের নামের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন কবি। তা ছাড়া নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, পুরুষ ও মেয়েদের নামের তালিকা সংকলনের দিকে কবি একটু অধিক প্রবণতা দেখিয়েছেন। সমালোচক ঠিকই বলেছেন, 'কবি যখন যে বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়াছেন তখন সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কতটুকু তাহা সুস্পষ্টভাবে তাঁহার গ্রন্থপাঠক ও শ্রোতাদের মনে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।' —[কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-এর ভূমিকা : যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য] জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ রসের পথ থেকে কবিকে অনেকসময় ভ্রষ্ট করে। জ্ঞানলব্ধ তথ্যকে আপন চিত্তে জারিত করে রসরূপে পরিণত করার ক্ষমতা না থাকলে এ ব্যর্থতা অনিবার্য। কেতকাদাসের ক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটেছে।

কবির জ্ঞানতৃষ্ণার আরও প্রমাণ আছে বিবিধ পুরাণকাহিনীর অনুসরণে সমুদ্র-মন্থন ও ঊষা-অনিরুদ্ধ পালার বিস্তৃত বর্ণনায় এবং বাংলায় অচলিত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে।

তিন

পূর্বের এক অধ্যায়ে মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের দুটি কারণ নির্দেশ করা হয়েছে :
[১] গঠনভঙ্গির সংহত ও সংঘাত-কেন্দ্রিক ঐক্য। [২] চরিত্রসৃষ্টির অভিনব ঐশ্বর্য।
কেতকাদাসের কাব্য এ-দুদিক দিয়েই বিচার্য।

কেতকাদাসের কাব্যটিকে অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড পালার একটি বৃহৎ সংকলন বলে অভিহিত করা চলে।[১] প্রতিটি পালা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যথেষ্ট বিস্তৃত। পালাগুলির মধ্যেকার সংযোগসূত্রটি একান্ত ক্ষীণ। সব মিলিয়ে কাহিনীগত অখণ্ডত্বের কোন ধারণাই জন্মায় না। লক্ষণীয় চাঁদসদাগর ও মনসার বিবাদের কথা এর কেন্দ্রীয় বস্তু নয়। কাব্যের ২০৫ পৃষ্ঠায় এর আরম্ভ এবং ৩৫২ পৃষ্ঠায় এর সমাপ্তি। পূর্ববর্তী পালাগুলিতে চাঁদসদাগরের উল্লেখ-মাত্র নেই। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, বংশীদাসের কাব্যের প্রাপ্ত সংস্করণগুলির সাক্ষ্যে এ সত্যটি ধরা পড়ে যে নরখণ্ডের যাবতীয় ঘটনা এবং প্রাসঙ্গিক স্বর্গের কাহিনীগুলিও [যেমন অনিরুদ্ধ-উষার কথা] চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বের সূত্রে বদ্ধ। তাঁদের কাব্যের প্রথম দিকে দেবখণ্ডে ধৃত মনসার পূর্ব বিবরণকে এক্ষেত্রে ভূমিকা ও পূর্বকথা হিসেবে গ্রহণ করতে তাই দ্বিধা হয় না। কিন্তু কেতকাদাসের গ্রন্থে চাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে বহু পরে।

উষা-অনিরুদ্ধ পালার ঘটনা পুরাণকাহিনীর পথ ধরে একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ কাব্যে রূপায়িত হয়েছে এখানে। অথচ উষা-অনিরুদ্ধের মৃত্যুবরণ ও মর্ত্যগমনের প্রয়োজন চাঁদ-মনসার বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই। পালাটির বিস্তৃত বর্ণনার ভঙ্গিতে এই মূল পরিপ্রেক্ষিতটিই হারিয়ে ফেলেছেন কেতকাদাস। বিজয় গুপ্তের কাব্যে কিন্তু সংক্ষিপ্ত উষা-অনিরুদ্ধ কথা চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বের মাঝখানে সংস্থাপিত। কেতকাদাসে চাঁদসদাগরের সঙ্গে উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীর সম্পর্ক আবিষ্কারও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কারণ ঘটনার রঙ্গমঞ্চে চাঁদের প্রবেশ বহু পরে।

রাখালপূজা পালা সব মনসামঙ্গল কাব্যেই আছে। কিন্তু কেতকাদাসে তা প্রাসঙ্গিক বর্ণনা মাত্র না হয়ে স্বতন্ত্র পালার আকার নিয়েছে। মথন পালা সম্বন্ধেও একই কথা। বিজয় গুপ্তে রাখালপূজার ঘটনা বৃহত্তর হাসান-হোসেন পালার মুখবন্ধ।

ধন্বন্তরী বধ পালা সর্পবিরোধী ওঝার বিরুদ্ধে মনসার আক্রোশের ফল হিসেবে আলোচ্য কাব্যে চিত্রিত। চাঁদসদাগরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কের কথা কবি বলেন নি। অথচ পূর্ববর্তী কবিদের একাধিক মনসামঙ্গলে ধন্বন্তরী ও চাঁদ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ। আদর্শের ঐক্য ঘনিষ্ঠতাকে বাড়িয়েছে। মনসার প্রথম আক্রমণ হল চাঁদের গুয়াবাড়ির উপরে। সর্পবিষে বিনষ্ট সুপারি বাগান বাঁচিয়ে তুলল ওঝা ধন্বন্তরী [কোন কোন কাব্যে শঙ্কর গারুড়ী নামে অভিহিত]। মনসার তখন প্রথম লক্ষ্য হল তাকে হত্যা করা। বিজয় গুপ্ত প্রভৃতিতে ধন্বন্তরী পালায় কিছু অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য থাকলেও

---

১. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত গ্রন্থটিকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে। এর সঙ্গে 'হাসান-হোসেন' পালা যুক্ত করতে হবে।

চাঁদ-মনসার বিবাদে তার ভূমিকাটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেতকাদাসে চাঁদ ও ধন্বন্তরী পরিচয়-সম্পর্কহীন মানুষ। উভয়েই মনসার কোপে বিনষ্ট—এইমাত্র সম্বন্ধসূত্র।

চাঁদ সদাগরের পালাটিও যেন যথেষ্ট পরিমাণে বিরোধের ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। 'গুয়াবাড়ি কাটা', 'সনকার মনসাপূজা ও চাঁদের বাধা দান', 'নটী বেশে মনসা কর্তৃক চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ' প্রভৃতি ঘটনার অভাবে চাঁদের-দৃঢ়তা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।[১] একদিকে চাঁদের মানসদৃঢ়তা ব্যঞ্জক এই ঘটনাগুলির অনুল্লেখ অন্যদিকে নৌকাডুবির পরে চাঁদের অপমানিত হবার ঘটনাগুলিকে সবিস্তারে বর্ণনা করায়, চাঁদ-মনসা দ্বন্দ্বে পাল্লাটা মনসার দিকেই ঝুঁকেছে।

একথা মেনে নিতে হয় যে মনসামঙ্গলের কাহিনীতে যে সম্ভাবনার বীজ তাকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করে প্রথম শ্রেণীর কাব্য গড়ে তোলার ক্ষমতা এ-ধারার কোন কবিরই ছিল না। হয়ত সে যুগের পক্ষেও তা ছিল অসম্ভব। কিন্তু পূর্ববর্তী কবিরা কেতকাদাসের মতো বিচ্ছিন্ন পালার কৌতুকে মেতে সব সম্ভাবনার অঙ্কুর বিনষ্ট করেননি। কেতকাদাস কিন্তু তাই করেছেন। কাজেই এ-ধারার শ্রেষ্ঠ কবির দাবি আদৌ তাঁর নেই।

চার

মনসামঙ্গলে অপ্রধান চরিত্র চিত্রণে অভিনবত্বের সুযোগ কম। মনসা, চাঁদসদাগর ও বেহুলা চরিত্রে বিশিষ্টতা আছে। কবিরা তাকে কাজে লাগিয়ে জীবনের নানা গভীর জিজ্ঞাসাকে রূপায়িত করতে পারতেন।

চাঁদসদাগরের চরিত্রে কেতকাদাস পূর্ববর্তী কবিদের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন না। চাঁদের ব্যক্তিত্বের বজ্রকঠিন দৃঢ়তা, আপন আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, জীবনের কামনা বা ভোগবাদ—চাঁদের বাণিজ্য, সম্পদ, নটীগমন প্রভৃতির মধ্যে যার প্রতিফলন—এবং ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্যরক্ষায় এই ভোগ-কামনার বিসর্জন, আর সব মিলে ট্রাজেডির মর্মদাহ আলোচ্য কবির কাব্যে অনুপস্থিত।

লখীন্দরের মৃত্যুর পরে চাঁদসদাগরের যে চিত্র কবি এঁকেছেন তার সঙ্গে নারায়ণদেবের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও গভীর অসঙ্গতিও আছে। ক্ষেমানন্দে একটা হৃদয়হীন রূঢ়তা মাত্র ব্যক্ত। নারায়ণদেব করুণ-কঠোর সমন্বয়ে অপূর্ব।[২] ক্ষেমানন্দে কাহিনীর সমাপ্তিতে চাঁদ চরিত্রের দৃঢ়তা আদৌ অভিব্যক্ত নয়। নারায়ণদেবের কাব্যে প্রাপ্তি ও ব্যক্তিত্বের যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এই প্রসঙ্গে রূপায়িত, ক্ষেমানন্দে তার সাক্ষাৎ মিলবে না। চাঁদের কাছে মনসাপূজার বিরুদ্ধতা সমগ্র অন্তরমথিত আদর্শ নয় আর।

১. অধিকাংশ পুঁথিতে পাওয়া যায় না। দু-একটি পুঁথিতে মাত্র মিলেছে—এদের তাই প্রক্ষেপ বলা চলে।

২. আগের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এ যেন কেবল আপন অতীত আচরণের আমূল পরিবর্তন জনিত চক্ষুলজ্জা :

চাঁদ বাণ্যা মনে গণে বড় অপমান। / কেমনে করিব মনে মনসার ধ্যান॥ / যার সনে করি আমি বাদ বিসম্বাদ। / তাহার শরণ লৈব এ বড় প্রমাদ॥ / চেঙ্গমুড়ি বলিয়া যাহারে দিনু গালি। / কোন লাজে তার আগে হব পুটাঞ্জলি॥ / মরণ অধিক লজ্জা মস্তক মুণ্ডন। / মনসারে পূজিতে না লয় মোর মন॥

অন্যদিকে আবার আশঙ্কা,

সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর। / ঘরেতে পাইনু মুই চৌদ্দ মধুকর॥ / হেন মনসার পূজা নাহি করি যদি। / বিপাকে হারাই পাছে হাতে পায়্যা নিধি॥

শেষ পঙ্‌ক্তির এই কাতরতা চাঁদ চরিত্রের মাহাত্ম্যকে নষ্ট করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ক্ষত্রিয়োচিত' বলে চাঁদসদাগরের ভোগবাদের বিশেষণ দেওয়া চলে।[১] তা অল্পে তুষ্ট নয়। বিপুল তার কামনা; সব পাবার জন্য সব হারাতেও সে প্রস্তুত। অথচ এখানে তার চরিত্রে যে লোলুপতা প্রদর্শিত তা প্রাপ্ত বস্তুকে রাখার জন্য সদা ব্যস্ত। তার 'হারাই হারাই সদা হয় ভয়'। এ ব্যাপারে নারায়ণদেবের সঙ্গে কেতকাদাসের পার্থক্যটি দৃষ্টি এড়াবার নয়।

বেহুলার চরিত্রাঙ্কনে কেতকাদাস তুলনামূলকভাবে সার্থকতা দেখিয়েছেন। বুদ্ধিদীপ্ত চাতুর্য ও সক্রিয়তা তাঁর বেহুলাকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব দান করেছে। সর্প-দংশনের রাত্রিতে তার জেগে থেকে কৌশলে একের পরে এক সর্প বন্দী করা :

বেহুলা বলেন খুড়া কোথা আছ তুমি। / তোমা সভা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি॥ / অবিরত মনে কত গনিব হুতাশ। / আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস॥ / মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান। / কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান॥ / এতেক শুনিয়া সাপ বড় লজ্জা পায়্যা। / কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেঁট মুণ্ড হয়্যা॥ / বেহুলা না করে ভয় মনসার দাসী। / সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাঁড়াশি॥ / ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে। / সুখে শুয়্যা নিদ্রা যাও হড়পী ভিতরে॥

এর মধ্যে মৃদু কৌতুকের ঈষৎ ছোঁয়া আছে। স্বামীর মৃত্যু-আশঙ্কার সামনেও সে মৃদু কৌতুক অশোভন নয়—বেহুলার আত্মশক্তি-দৃপ্ত চিত্তেরই ক্ষণিক বিচ্ছুরণ মাত্র। কিন্তু বার বার সর্প বন্দী করেও নিয়তিকে যখন রোধ করা গেল না তখন মুহূর্তের জন্য হতাশা, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, পুরুষকারের উপরেও দৈবশক্তির অমোঘতার স্বীকৃতি বেদনার্ত স্বরে প্রকাশ পায় :

শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া। / অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়া।

ক্ষেমানন্দের বেহুলার ক্রন্দনে লোকলজ্জার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে উঠে এর করুণরসকে কিছুটা ব্যাহত করলেও বেহুলার চরিত্রের উপরে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোক-পাতে তার গর্বিত অন্তরের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'খাইনু আপন পতি কে

১. 'বিচিত্র প্রবন্ধের' 'মাভৈঃ' দ্রষ্টব্য।

মোরে বলিবে সতী'। ভাইয়েরা বেহুলাকে ফিরিয়ে নিতে এলে:

বেহুলা বলেন আমি হল্যাম কড়্যা রাঁড়ী। / কত ফেলাইব ভাই নিরামিষ্যা হাঁড়ী॥ / মা-বাপের বাড়ীতে আমার নাহি সাজে। / সকল ভাউজের সঙ্গে মোর দ্বন্দ্ব বাজে॥ / সহিতে না পারি আমি দুরক্ষর বাণী। / কূলে দাণ্ডাইয়া ভাই আর কান্দ কেনি॥

এই আত্মমর্যাদাবোধ ক্ষেমানন্দকৃত বেহুলার চরিত্রের কেন্দ্রীয় সত্য। আর এর ভিত্তিতে আছে তার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। ক্ষণিকের জন্য তা মূর্ছিত হয়ে পড়লেও সে সংগ্রামের দুশ্চর পথে আবার যাত্রা শুরু করে।

নারীব্যক্তিত্বের এই সহজ অথচ দৃঢ়, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল এবং কর্মকুশলতায় চতুর চরিত্র নির্মাণে ক্ষেমানন্দের সাফল্য অভিনন্দনযোগ্য। অথচ চাঁদের শক্তি-দৃঢ় পৌরুষ অঙ্কনে তাঁর ব্যর্থতা কেন? মনসা-বিরোধী চাঁদের প্রতি কবির সচেতন বিদ্বেষ এর অন্যতম কারণ কিনা তা ভেবে দেখবার মতো।

৫. ৪. দ্বিজ মাধব / চণ্ডীমঙ্গল

এক

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় মুকুন্দরামের পরেই দ্বিজ মাধবের নাম করতে হয়। অবশ্য মুকুন্দরামের মহত্তর কাব্যের প্রভাবে দ্বিজ মাধব পরবর্তীকালে অনেকখানি বিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু মুকুন্দরাম-নিরপেক্ষভাবে মাধবের কাব্যের মূল্য বিচার প্রয়োজন। এ-প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্য অবশ্য প্রণিধানযোগ্য, 'দ্বিজ মাধবের কবি-যশ তাঁহার পরবর্তী কবি মুকুন্দরাম অনেকটা হরণ করিয়া লইয়াছেন। মুকুন্দরাম দ্বিজ মাধবেরই বিষয়বস্তুকে অধিকতর শক্তির প্রভাবে পুনর্গঠিত করিয়া লইয়া নিজের কাব্য-সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। অনতিকাল ব্যবধানে মুকুন্দরামের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া দ্বিজ মাধবের যশ লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পূর্বেই সাধারণের দৃষ্টি মুকুন্দরামের অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টির উপর গিয়াই স্বভাবতঃই ন্যস্ত হইল। মুকুন্দরামের প্রভাবে দ্বিজ মাধবের প্রচার আর অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারিল না, চণ্ডীমঙ্গলের জগতে মুকুন্দরামই একপ্রকার একচ্ছত্র অধিবাসী হইয়া রহিলেন।' প্রয়াত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে রসজিজ্ঞাসু পাঠকসমাজ এই বিস্মৃত-প্রায় কবির কাব্যগুণের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন।

দ্বিজ মাধব প্রথম শ্রেণীর কবি নন। আখ্যানকাব্যের রাজ্যে বড়ু চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রের প্রতিভার সমকক্ষতার দাবি তাঁর নেই। বড়ুর অসূচীভেদ্য কাব্যদেহ গঠন এবং অতন্দ্র মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ অথবা ভারতচন্দ্রের তির্যক জীবনদৃষ্টি ও

রূপরচনার মার্জিত নৈপুণ্য দ্বিজ মাধবে মিলবে না। আবার মুকুন্দরামের কৌতুকরসের সূত্রে বস্তুবিন্যাসকে সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষভাবে রূপায়িত করার দক্ষতাও তাঁর নেই। কিন্তু তাঁর কাব্য পাঠে কোন সতর্কদৃষ্টি পাঠকই রচনার বিশিষ্টতা লক্ষ্য না করে পারেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের প্রথম সারিতে দ্বিজ মাধবের স্থানটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

দুই

মাধবের কাব্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় নেওয়া যাক।

মাধবের কাব্যান্তর্গত অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিতা প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। নিঃসন্দেহে এ-কবিতাগুলি বৈষ্ণবপ্রভাবজাত। কিন্তু গঠনরীতির দিক থেকে এ পদ্ধতিটি বৈষ্ণবপ্রভাবের যুগেও একক। কবি এগুলিকে বিষ্ণুপদ নামে অভিহিত করেছেন। সুধীভূষণবাবু কুড়িটি বিষ্ণুপদ তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে সংকলন করেছেন। পদগুলি নানা কবির রচনা। কয়েকটি কবিতা স্বয়ং মাধবের লেখা হওয়া সম্ভব। কবিতাগুলির মধ্যে বালগোপালকে কেন্দ্র করে যশোদার চিত্তোদ্বেলতা, নিমাইসন্ন্যাসে শচীর আর্তি অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিরহই বিষয় হিসেবে গৃহীত। বিচ্ছিন্ন কবিতা হিসেবে এদের অনেকগুলি সার্থকতার দাবি করতে পারে। তবে আলোচ্য কাব্যে সে বিচার গৌণ। কাহিনী কাব্যে এ জাতীয় কবিতার অন্তর্ভুক্তি কতটা সঙ্গত এবং দ্বিজ মাধব এদের ব্যবহার করে কোন বিশেষ ধরনের সার্থকতা লাভ করেছেন কিনা তাই এক্ষেত্রে বিচার্য।

কাহিনী-কাব্যে লিরিক কবিতার অন্তর্ভুক্তির সুযোগ কতটা এটিই প্রথম সমস্যা। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে এ-সমস্যাটি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তানুযায়ী আখ্যানকাব্যের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই বিষ্ণুপদগুলির প্রবেশের স্বাভাবিক সুযোগ নেই। দ্বিজ মাধব বৈষ্ণব ভাবুকতায় এতটা আচ্ছন্ন ছিলেন যে এই ভিন্ন জাতীয় উপাদানের স্বভাবজ স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারেননি। আমাদের কিন্তু মনে হয় কবির ক্ষমতার পরিমাণের উপরে ভিন্নজাতীয় উপাদানের মিশ্রণ ও সার্থক রসসৃষ্টি নির্ভর করে। প্রতিভাবান কবি আখ্যানকাব্যের কাঠামোয় গীতিকবিতাকে প্রবিষ্ট করিয়ে আপন অভিপ্রেত ফললাভ প্রত্যাশা করতে পারেন।

দ্বিজ মাধবের এই প্রচেষ্টা অভিনব এবং সম্ভবত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত। ভারতচন্দ্র কাব্যের প্রতি পালার প্রারম্ভে যে গানগুলি সংযোজিত করেছেন তা প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কহীন। বৈষ্ণব পদাবলীর গীতাত্মক আবেদনটি মাধব সম্পূর্ণই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। রাধা-কৃষ্ণের মিলন-বিরহ আশা-কামনা যে ঐ দুটি নাম ও ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে মানবপ্রেম মাত্রকে স্পর্শ করতে পারে, তার হৃদয়ের গভীর বাণী প্রকাশের ক্ষমতা রাখে সে যুগেই এ বোধ তাঁর হয়েছিল। খুল্লনা-ধনপতির প্রেমের

পটভূমিতে রাধাপ্রেমের সঙ্গীত সংযোজনে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। বাণিজ্য-গমনোন্মুখ শ্রীমন্তের জন্য খুল্লনার রোদনে নিমাইসন্ন্যাসের সুর বা বালক শ্রীমন্তের খেলার মধ্যে বৈষ্ণব বাৎসল্যরসের সামীপ্য আবিষ্কার ঘটেছে সাবলীলভাবেই কোন কষ্টকল্পনার আশ্রয় না নিয়ে। দ্বিজ মাধব দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন বলে মনে হয় না। তা হলে ভগবান কৃষ্ণের লীলার সঙ্গে মানবজীবন-ঘটনা একসূত্রে বেঁধে নিতে পারতেন না। কারণ 'কাম' আর 'প্রেমে' নিশ্চয়ই প্রভেদ আছে—লোহা আর সোনার মতোই তারা স্বরূপে পৃথক। এটাই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের দৃঢ় প্রত্যয়। দ্বিজ মাধব বৈষ্ণব কবিতার রসসৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও, আপন কাব্যে বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টির জন্য তাকে ব্যবহার করলেও বৈষ্ণবসুলভ ধর্ম-ব্যাখ্যার বন্ধনে আপন কাব্য-জিজ্ঞাসাকে আবৃত করেননি। মধ্যযুগে এ ঘটনা বিস্ময়কর। কবি মাধবের উপলব্ধিটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের সাদৃশ্য অনস্বীকার্য: 'বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে'।—['মনুষ্য' : 'পঞ্চভূত'] গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেম-ধর্মের এটি রবীন্দ্র-ভাষ্য। মাধবের কবিচিত্তে এই বোধের অঙ্কুর না থাকলে তাঁর কাব্যমধ্যে বিষ্ণুপদ ব্যবহারে তিনি সাহসী হতেন না।

মাধব কাহিনী-কাব্য রচনা করেছেন। ঘটনাপুঞ্জের শৃঙ্খলে, জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুসম্পদের আলোচনায়, সামাজিক রীতিনীতির ব্যাখ্যায় এর একটা বিশেষ রাজ্য আপনি নির্মিত হয়ে যায়। মানবচিত্তের সূক্ষ্ম বা গভীর অনুভূতির তারে যখন বেদনার ঝঙ্কার জাগে তখন তার সম্যক্ প্রকাশ সেকালের কাহিনী-কাব্যের সাধারণ কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে চায়। কবিরা তখনই পয়ার ছেড়ে ত্রিপদী একাবলীর আশ্রয় নেন। তখন 'লিরিক এলিমেণ্ট' এর মধ্যে প্রবেশ করে। বেহুলার ক্রন্দন তখন আকাশ স্পর্শ করে, চাঁদের অভ্রভেদী শির আরও কঠিন আরও ট্রাজিক মহিমার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। চণ্ডীমঙ্গলের কাব্যধারায় এ-সুযোগ কম। চরিত্র-ব্যক্তিত্বে বস্তুপরিবেশের সামান্যতাকে অতিক্রম করতে পারে এমন মানুষের অভাব এ-কাব্যে। এ-কাব্যের সব চরিত্রই সাধারণ পর্যায়ের। মুকুন্দরাম ফুল্লরার বসন্তকালীন বিরহ-বেদনাকে সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার মানসে ঋতু, ফুল, পক্ষী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে 'ওড' জাতীয় কয়েকটি গীতিধর্মী কবিতা রচনা করেছেন। দ্বিজ মাধব ঐ একই কারণে বিষ্ণুপদের আশ্রয় নিয়েছেন।

ধনপতি-ফুল্লরার প্রেমসম্পর্ক মূল কাহিনীতে অতি সাধারণ দাম্পত্য জীবনের প্রাত্যহিকের স্তরেই আবদ্ধ। বিষ্ণুপদগুলি তার পিছনের তারে যেন একটি অর্ধোচ্চারিত ধ্রুবপদকে বেঁধে রেখেছে। এর ছন্দ-স্পন্দে একটা সুদূরাভিসারের ব্যঞ্জনা মূর্ছিত হতে থাকে। তুচ্ছতার ধূলিমালিন্য ঢেকে গিয়ে প্রেমবোধের গভীরতার একটি স্পর্শ চিত্তকে আবিষ্ট করে তোলে। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক। ধনপতির আচমন, ভোজন প্রভৃতির বর্ণনার মাঝখানে বিষ্ণুপদে রাধিকার মিলনার্তি প্রকাশিত :

বন্ধু কানাই পরাণ ধন মোর। / যুগে যুগে না ছাড়িমু চরণ খানি তোর ॥ / জাতি দিলুঁ যৌবন দিলুঁ আর দিমু কি। / আর আছে শুধা প্রাণ তারে বোল দি ॥

আবার ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা কালে যাত্রার প্রস্তুতি, খুল্লনাকে প্রবোধ ও উপদেশ দান প্রভৃতির মাঝখানে বিষ্ণুপদে রাধার আসন্ন বিরহ বেদনার সুর :

যাইবারে ওরে শ্যাম কে দিব বাধা। / দৈবে মরিব আহ্মি অভাগিণী রাধা ॥

কিংবা গণকের গণনা, ভবিষ্যৎবাণী প্রভৃতির মধ্যে :

তোমার বদলে শ্যাম থুইয়া যাও বাঁশী। / তবে সে আসিবা হেন মনে বাসি /··· বাঁশীটি যতনে থুইমু / গন্ধ-চন্দন দিমু / হীরা-মণি-রত্নে জড়াইয়া। / যখনে তোমার তরে / মরমে বেদনা করে / নিবারিমু বাঁশী মুখে দিয়া ॥

প্রেমানুভূতির মিলন-বিরহের একটা পরিবেশ সৃষ্টিতে দ্বিজ মাধবের এই অভিনব পরীক্ষা সার্থক হয়েছে বলা চলে।

শ্রীমন্তকে কেন্দ্র করে খুল্লনার বাৎসল্য-বেদনার পটভূমিতে বালগোপালের শাশ্বত মূর্তিও সুপ্রযুক্ত এ-কাব্যে। পাঠশালায় পিতৃপরিচয়হীন বালক অপমানিত হয়ে যখন অভিমানে আত্মগোপন করল তখন তার খোঁজ না পেয়ে খুল্লনার :

কবরী আউলাইয়া বামার পড়ে পৃষ্ঠদেশে। / মুকুতা গাঁথনি যেন চক্ষুর জলে ভাসে ॥

সুন্দর চিত্রে জননী-হৃদয় চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত বিষ্ণুপদের সূত্রে খুল্লনার একক বেদনা চিরকালের বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে :

তোমরা কি মোর যাদব দেখিয়াছ। / চান্দ মুখের মধুর বাণী বাঁশীতে শুনিয়াছ ॥

কবি কিন্তু রসবোধের কঠিনতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে। বাল্যলীলার কবিতায় ব্যক্ত আশঙ্কা ততটা বস্তুভিত্তিক নয়। মাতৃহৃদয়ের অকারণ ব্যাকুলতাতেই এর জন্ম। কিন্তু বালক পুত্রের দুস্তর সাগরপথে যাত্রায় চিন্তা ও আশঙ্কার বাস্তব কারণ বিদ্যমান। যশোদার বাৎসল্যরসাত্মক পদ তাই এর মূল সুরটি ধরে রাখতে অক্ষম। কবি নিমাই সন্ন্যাসে শচীমাতার হৃদয়ার্তির মধ্যে এর সামীপ্য খুঁজেছেন :

রহাঅ রহাঅ নদীয়ার লোক / বৈরাগে চলিল দ্বিজমণি। / কেমন ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরাণী ॥

তবে বিষ্ণুপদগুলি সর্বত্রই যে সুপ্রযুক্ত এমন বলা যায় না। আর সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা প্রত্যাশিতও নয়। নৃপতি কর্তৃক বাণিজ্যযাত্রার জন্য আহূত হয়েছেন ধনপতি। কবি বিষ্ণুপদে বাঁশীর সুরে আহ্বান শুনে রাধার কাতরতার কথা বলেছেন। আবার কালকেতুর রাজ্যে যখন প্রেরিত হয়েছে গুজরাটের গুপ্তচর তখন কবি তাদের ছদ্মবেশের মধ্যে 'কালাগোরা'র রহস্যের অনুসন্ধান করেছেন। এগুলি অবশ্য ব্যর্থতার নিদর্শনরূপেই গণ্য।

বিষ্ণুপদের প্রয়োগরীতি এবং মূলত সাফল্যের নিরিখে দুটি সিদ্ধান্ত করা চলে [এক] কবি বৈষ্ণবযুগ প্রভাবের বশে বিষ্ণুপদ ব্যবহার করেছেন। [দুই] কিন্তু কবি ছিলেন সচেতন রূপস্রষ্টা। আখ্যানকাব্যের আঙ্গিককে বিপরীতধর্মী এবং সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়ের গীতিকবিতার সঙ্গে যুক্ত করে যে প্রত্যাশিত সুফল লাভ করা যায় নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টায় কবি মাধব তা প্রমাণ করেছেন। সেই উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুপদের ব্যবহার, কোন বিশেষ বৈষ্ণব-বিশ্বাসের জন্য নয়।

তিন

'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর একান্ত সংক্ষিপ্ততা। এই সংক্ষিপ্ততা অপ্রয়োজনকে বর্জনের পথে আসেনি।

মঙ্গলকাব্যগুলির আকৃতিগত অতিবিস্তৃতির অন্যতম কারণ সমাজ-ঘটনার প্রতিফলনের আধিক্য, কতগুলি বাঁধাধরা বর্ণনা ও ঘটনার প্রথানুসরণ। কাহিনীর সামান্যতম সূত্র ধরে কবিরা বিবাহ ও স্ত্রী-আচার, বারব্রত, খাদ্যতালিকা, জাতকর্ম ও প্রেতকর্ম প্রভৃতি সমাজব্যবস্থার ও পরিবার জীবনের নানা বাস্তব তথ্য পরিবেশন করে থাকেন। চৌতিশা, বারমাস্যা, কাঁচুলি নির্মাণ, দেববন্দনার অনাবশ্যক বিস্তারও কাব্যদেহকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। দ্বিজ মাধব যদি অনাবশ্যককে পরিহার করে সংক্ষিপ্ততা আনতেন তো প্রথাভঙ্গের শক্তিতে গৌরবান্বিত বিপ্লবী প্রতিভা হিসেবে তাঁকে সম্মান দেখানো যেত। তিনি তা করেননি। তাঁর কাব্য সংক্ষিপ্ত হলেও উপরি-উক্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণায় প্রায় কোথাও শৈথিল্য দেখাননি কবি। বরং চৌতিশা-বারমাস্যা-কাঁচুলি নির্মাণ-দেববন্দনায় তুলনামূলক বিস্তৃতিই চোখে পড়ে। অথচ আত্মপরিচয় দান করতে গিয়ে কবির সংক্ষিপ্ততাবোধ অকস্মাৎ উগ্র হয়ে উঠে তাঁর ব্যক্তিপরিচয় জানবার পথ রুদ্ধ করে দিল।

এই সংক্ষিপ্ততার কারণ মনে হয় নির্দিষ্ট পূর্বসূরীর অভাব। সম্ভবত খাদ্য তালিকা বা মেয়েলি আচার অথবা বারমাস্যা বিশেষ কোন মঙ্গলকাহিনী নিরপেক্ষভাবেই বিকশিত হচ্ছিল। তাই সব মঙ্গলকাব্যেই এদের উপস্থিতি। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন পূর্ব আদর্শ না থাকায় দ্বিজ মাধবকে নিজেই সেই আদর্শ গড়ে তুলতে হয়েছে, তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে পারেননি। মুকুন্দরামের বর্ণোজ্জ্বল সুঠাম প্রতিমা এই কাঠামোর ভিত্তিতেই নির্মিত।

অতি সংক্ষিপ্ততা দ্বিজ মাধবের কাব্যে মাঝে মাঝে ঘটনার উল্লেখমাত্রে পরিণত। যেমন ধর্মকেতুর মৃত্যুবর্ণনা ;

সিংহ দেখিয়া হৃষ্ট হইল বীরবর। / আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া গুণেতে যোড়ে শর ॥ /
সন্ধান-পুরিয়া বীর মারিবারে যায়ে।/ আস্ফালে এড়িল সিংহ নাহি পড়ে গায়ে ॥ /
ক্রোধ হইল সিংহ বাণ এড়াইয়া। / আঁচড়ের ঘায়ে প্রাণ নিলেক হরিয়া ॥

সমস্ত জিনিসটি মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। জলের দাগের মতোই মনের মধ্যে মিলিয়েও গেল। আবার কালকেতুর মাতার স্বামী-সহমরণের ঘটনা—

পুত্রের বচনে রামা বাহিরায় তৎকাল। / শোকে ব্যাকুল হ'য়া ভাঙ্গে চুত ডাল ॥ /
কি করিব কোথা যাইব স্থির নহে মতি। / আমিহ পুড়িয়া মরিম প্রভুর সঙ্গতি ॥ /
কংস নদীর তটে আছে বড় রম্য স্থল। / নানা কাষ্ঠ কুড়াইয়া জ্বালিল অনল ॥

শোকে ব্যাকুল নিদয়ার আমগাছের ডাল ভেঙে ফেলার ক্ষুদ্র চিত্রটি অপূর্ব হলেও সহমরণ ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমাদের মনে করুণরসের বেদনাটুকু মুদ্রিত করে দিতে পারে না। আবার কালকেতুর বন্দী হবার মতো নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনাও মাত্র দু-চার পঙ্‌ক্তিতে আকস্মিকভাবে শেষ করেছেন কবি—

রণ জিনি কালকেতু যায়ে নিজ ঘরে। / হেনকালে রাজসৈন্য আগুলিল দ্বারে ॥
গণ্ডী শর এড়ি বীর যায়ে শূন্য হাতে। / হেনকালে রাজ-সৈন্য আবরিল পথে ॥
পন্থ বান্ধি সেনাগণ করে নানা সন্ধি। / শূন্য হাতে কালকেতু হইয়া গেল বন্দী ॥

যে বীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, ঘরে ফিরবার পথে প্রায় বিনাকারণে তার হঠাৎ বন্দী হয়ে যাওয়া ঘটনার সংক্ষিপ্ততার জন্যই আমাদের বিশ্বাস জাগাতে পারে না।

এরূপ উদাহরণের সংখ্যা অনেক বাড়ানো যেতে পারে। শৈল্পিক পরিমিতি বোধ যেমন প্রশংসার তেমনি অকারণ সংক্ষিপ্তকরণ রসাভাবের কারণ। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত উদ্ধৃত করে ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বলেছেন, 'স্থায়ী ভাবসমূহ অতি সম্পন্ন হইলে রসতা প্রাপ্ত হয়।' উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, 'রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে—এই বাক্য রসাত্মক বাক্য নয় কেন? বিভাব ও স্থায়ী ভাব থাকা সত্ত্বেও দুইটি কারণে উক্ত বাক্য কাব্য হইতে পারে নাই। প্রথম কারণ—বাক্যটিতে স্থায়ীভাবের উল্লেখমাত্র আছে, উহার বহুলরূপে উপলব্ধি বা প্রকাশ হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ—বাক্যটিতে ব্যভিচারী ভাবের কিছুমাত্র প্রকাশ হয় নাই।' [কাব্যালোক।] এক্ষেত্রে এই 'বহুলরূপে উপলব্ধি ও প্রকাশ' ব্যাপারটির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি।

অবশ্য সর্বত্র অতিসংক্ষিপ্ততা এভাবে রসহানির কারণ হয়নি। কিন্তু দ্বিজ মাধব প্রায় সর্বত্রই সংক্ষিপ্ততার প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখিয়েছেন। চিত্র রচনার এই প্রবণতা মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-দীপ্ত ক্ষণিক চমৎকারিত্বের সৃষ্টিও করেছে। পূর্বেই ধর্মকেতুর মৃত্যু সংবাদ শুনে নিদয়ার 'শোকে ব্যাকুল হয়া ভাঙ্গে চুত ডালে'র তীব্র বেদনাগর্ভ চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনার কথা বলেছি। প্রতিবেশীর গৃহে বঁটি চাইতে

গেলে যখন সর্ণথ পুরানো ধার শোধের জন্য কালকেতুর নামে শপথ করতে বলল :

বঁটি বাড়াইয়া দিল করি দরাদরি। / সইয়ার শপথ লাগে যদি না দ্য কড়ি ॥ / ললাটে হানিয়া ঘাও ফুল্লরায়ে বোলে। / মুঞি মরিয়া যামু প্রভুর বদলে ॥

'ললাটে হানিয়া ঘাও' ছবিটির মধ্যে কবি অনেক কথা ব্যক্ত করেছেন। ফুল্লরার দারিদ্র্যজনিত দুর্ভাগ্যের কথা, স্বামীর কল্যাণ-কামনা যুগপৎ এখানে প্রকাশিত। বিস্তৃত বর্ণনা এদের আবেদনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না। প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণে বলা যায় যে অনেকখানি ভাব মরে গিয়ে যে একটুখানি কবি-ভাষার সৃষ্টি। এই চিত্ররচনায় তার সার্থক প্রমাণ মিলবে।[১]

আবার লহনা-খুল্লনার কলহান্তে লহনা :

খুলনারে মারি তবে আসনেতে বসি / পায়ে জল ঢালি দিল দুবলা ত দাসী ॥

সতীনকে প্রহারের পরে পরিশ্রান্ত লহনা আসনে বসেছে আর দাসী দুর্বলা তার পায়ে জল ঢেলে ক্লান্তি অপনোদন করছে—কবির এই সংক্ষিপ্ত চিত্র লহনার নিষ্ঠুরতাকে চমৎকার ব্যঞ্জিত করেছে। কিংবা লহনা যখন ক্ষুধার্ত খুল্লনাকে ভাত বেড়ে দিল :

অল্প অন্ন দিল তান পোড়া ছাই বহুল। / এক পাশে বাড়ি দিল পাকা কলার মূল।··· / ধুঁয়া পোড়া অন্ন দেখি লাড়ি চাড়ি চাহে। / ক্ষুধার কারণে রামা তাহা কিছু খায়ে ॥

পোড়া ভাতের সামনে খুল্লনার বসে থাকার চিত্রটি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে বিশেষ করে 'লাড়ি চাড়ি চাহে'-র উল্লেখে। এমনি সার্থক রসবহ ক্ষুদ্র চিত্রকল্প ইতস্তত অনেক ছড়িয়ে আছে। বর্ণনা বিস্তৃত হলে এদের রস ফেনিয়ে উঠত। কবি মাধব এখানে সচেতন শিল্পী-স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

চার

দ্বিজ মাধবের শৈল্পিক চেতনার কিছু পরিচয় পূর্বে দিয়েছি। গঠন-কৌশল সম্পর্কে অতন্দ্র দৃষ্টি সেকালের কাব্যে খুব সুলভ ছিল না। মাধব কিন্তু সমগ্র পালাটি সাজাবার ব্যাপারে স্পষ্ট সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থে সম্পাদক মহাশয় দুটি স্থানে সামান্য পরিবর্তন ব্যতীত পুথিতে প্রাপ্ত [সবগুলি পুথিতেই এ বিষয়ের ঐক্য দেখা যায়] পালা বিভাগ রক্ষা করেছেন। প্রতিটি পালায়ই কবি ঘটনার একটা বিশেষ উত্থান-পতনের ধারা বজায় রেখে চলেছেন। যেমন, মঙ্গলদৈত্যকে বধ করে দেবী কিভাবে মঙ্গলচণ্ডী নাম গ্রহণ করলেন দ্বিতীয় পালায় তাই বর্ণিত হয়েছে। আবার পঞ্চম পালায় স্বর্ণগোধিকা প্রসঙ্গ আলোচিত। কালকেতুর পিতার মৃত্যু ও কালকেতুর শিকার থেকে শুরু করে রাজ্যপ্রাপ্তি পর্যন্ত এ পালার বিস্তার। কবি কারণ ও ফলাফল সহ স্বর্ণগোধিকার প্রসঙ্গটির স্পষ্ট সীমা

১. প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহ—১ম খণ্ড, বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নির্দেশ করেছেন। আবার চতুর্দশ পালায় শ্রীমন্তের বাল্যলীলা বর্ণিত। তার জন্মের পর থেকে এর আরম্ভ এবং সিংহল যাত্রায় এর সমাপ্তি।

কাহিনী গঠনে অসতর্কতা এবং অবহেলা মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতিতে সর্বত্র প্রকট। সেই পরিবেশে দ্বিজ মাধবের এই কাব্যে রুচিপূর্ণ পালা বিভাগ তাঁর সচেতন গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ঘটনাগত সংযোগের অভাব সহজেই চোখে পড়ে। কতকগুলি ঘটনার টুকরো যেন সময়ের সূত্রে মাত্র বদ্ধ। দ্বিজ মাধবের গঠন-বোধ এই টুকরোগুলির মধ্যে অন্তত একটি স্থানে কার্যকারণের সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিল। ধনপতির নিকটে কবুতর খেলায় পরাজিত ও অপমানিত রাঘব দত্তের প্রতিশোধ-স্পৃহার ফল হিসেবেই খুল্লনার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনার জন্ম বলে এ কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। কার্যকারণ সম্পর্কের দিক থেকে এই চেষ্টা দুর্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু মাধব যে এই চেষ্টার দ্বারা চণ্ডীমঙ্গলের গঠনশিথিলতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন এটা কবির শিল্পবুদ্ধিরই পরিচায়ক।

পাঁচ

দ্বিজ মাধবের বাস্তবতা সমালোচক মাত্রেই উল্লেখ করেছেন। এই বাস্তববোধকে কেউ কেউ বস্তুভারাক্রান্ত বলেছেন, তুলনায় মুকুন্দরামের কাব্যের কৌতুকরসের সূত্রে সিদ্ধ বাস্তবতার জয় ঘোষণা করেছেন। মুকুন্দরামের সরসতা এবং অপক্ষপাতজনিত স্নিগ্ধ কৌতুক প্রশংসার সন্দেহ নেই। কিন্তু মাধবের কাব্যে বস্তুর ভারই আছে, রস নেই একথা স্বীকার্য নয়। সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যে সমাজজীবনের, বিচিত্র আচার-আচরণের খুঁটিনাটি বর্ণনায় বাস্তবতা সৃষ্টির সুযোগ প্রচুর। তার মধ্যে আবার চণ্ডীমঙ্গলে বিশেষ করে পরিবার জীবনের তরঙ্গোদ্বেলহীন সমতাল রোমাণ্টিক উচ্ছ্বাসের ও আকস্মিক সমুন্নতির সুযোগ দেয় না। কাজেই এ কাব্যধারা বাস্তব রসের রাজ্যভুক্ত। এ ক্ষেত্রে দ্বিজ মাধবের কৃতিত্ব হল :

১. পৌরাণিক কাহিনীর অতিব্যবহারে কাহিনী বা চরিত্রে বস্তু-অনুগ সঙ্গতির বা পারিবারিক সামান্যতার পরিবেশকে তিনি বিঘ্নিত করেননি। এদিক থেকে মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য অতি স্পষ্ট। মুকুন্দরাম আদর্শবাদ ও বাস্তববাদকে মেলাবার যে দুঃসাধ্য সাধনা করেছেন পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পারিবারিক ঘটনাকে সমন্বিত করে তাতে মাধব সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। মাধব আপনার কবি-ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বুঝে সে চেষ্টায়ই অগ্রসর হননি। অবশ্য আংশিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও অসাধ্য সাধনের তপস্যা মুকুন্দরামের গৌরবেরই পরিচায়ক।

২. ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অতি প্রভাবে বাস্তব জীবন রূপায়ণ মাধবের কাব্যে কোথাও আচ্ছন্ন হয়নি। ব্যাধজীবনের চিত্র-অঙ্কনে আদ্যন্ত সংগতি রক্ষায় মাধবের সাফল্য অবশ্য-লক্ষণীয়। মুকুন্দরাম কালকেতু-ফুল্লরার বিয়ের বর্ণনায় উচ্চবর্ণের আচার-

আচরণের প্রতিফলন দেখিয়েছেন। কালকেতুর বৃদ্ধ পিতাকে কাশীবাসী করিয়েছেন। মাধব হরিণের চামড়া ও তীর ধনুকের উপচারেই সন্তুষ্ট। ধর্মকেতুর মৃত্যু ও দাহ বর্ণনায় তার অমার্জিত কল্পনা ব্যাধজীবনের বস্তু পরিবেশকে লঙ্ঘনমাত্র করেনি।

বিবাহকালে এয়োদের ভারসাম্যহীন নির্লজ্জতা বহু মঙ্গলকাব্যেই ব্যঙ্গের বিষয়রূপে গৃহীত। বিজয় গুপ্ত এদের দৈহিক বিকৃতি নিয়ে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করেছেন। গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দিতে কার খোঁপা গরুতে খেয়ে নিয়েছিল এই কথা স্মরণ করে কবি উদ্দাম রঙ্গে মেতেছেন। মাধব ব্যাধ রমণীদের যে বর্ণনা দিয়েছেন :

ছলি খুলি পেলি আহি সাজে তার ঘরে। / মৃগ চর্ম পরিধান দুর্গন্ধ শরীরে ॥ / কোন কোন আহিয়ে ডোহার ছাল খায়ে। / বদন করিয়া রাঙ্গা ব্যাধের ঘরে যায়ে ॥ / হাসিয়া বিকল বীর আহিগণের সাজে। / বরণ করিতে আইল ছাপনার মাঝে ॥

এর মধ্যে ব্যঙ্গের অতিরঞ্জন নেই, অতি উচ্ছ্বসিত রঙ্গহাস্যের উল্লাস নেই। যদি হাস্যের কিছুমাত্র স্পর্শ এ বর্ণনায় থাকে তবে তা সহানুভূতিতে কোমল।

এই সহানুভূতির মূলধনে দ্বিজ মাধব জয়ী। এই সহানুভূতি ব্যাধরমণী থেকে শুরু করে ধনপতি সদাগর পর্যন্ত সমভাবে ব্যাপ্ত। রাঘব দত্তের পাপিষ্ঠতাকে সাজা দিতেও তার প্রাণ চায় না। তাই খুল্লনার অনুরোধে সেও কৌলিক মর্যাদাপ্রাপ্তি থেকে বাদ পড়ে না। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মার্জনায় ব্যাধ-জীবনযাত্রাকে কিছুটা পরিচ্ছন্ন করবার কোন বাসনাই তাই তিনি অনুভব করেননি।

কিন্তু দ্বিজ মাধবের বাস্তব দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রে। ভাঁড়ুর প্রতিও মাধব সহানুভূতি প্রদর্শনে দ্বিধা করেননি। ভাঁড়ু দত্তের সমস্ত অপকীর্তির পিছনে তার ব্যক্তিজীবনের এই একান্ত বাস্তব পরিচয় নিঃসন্দেহে মর্মস্পর্শী :

ভাঁড়ু দত্তে বোলে শুন তপন দত্তের মা। / ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব গা ॥ / কালুকার অন্ন যদি এক মুষ্টি পাম। / বেলান্তে নিশ্চিন্ত হইয়া দেয়ানেতে যাম ॥ / যেন মাত্র ভাঁড়ু দত্ত কৈল হেন বাণী। / ক্রোধ করিয়া তারে কহিছে রমণী ॥ / যেমত কথা কহ তুমি লোকে বোলে আউল। / কালু কৈলা উপবাস আজু কথা চাউল ॥ / তোমার ঘরে বসতি করিয়ে যেমন দুঃখে। / উদরে না চিনে অন্ন তাম্বুল পান মুখে ॥ / স্ত্রীর বচনে ভাঁড়ু ভাবে মনে মন। / আজুকার অন্ন আমার মিলিব কেমন ॥ / ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া। / ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া ॥ / কড়ি বুড়ি নাই ভাঁড়ুর বাক্যমাত্র সার। / ত্বরায় পাইল গিয়া নগর বাজার ॥

এই পশ্চাৎপট ভাঁড়ুর চরিত্রকে আমাদের হৃদয়ের কাছে এনেছে। তার শয়তানি অপকৌশল রক্তমাংসের মনুষ্যত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি।

কালকেতুর রাজ্যোদ্ধারের পরে ভাঁড়ুর শাস্তি ন্যায়ধর্মানুমোদিত হলেও কবির সহানুভূতির সর্বব্যাপকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগাতে পারে। কিন্তু কবির সহানুভূতি যদি

কাব্যের স্বাভাবিক পরিণতিতে বাধার সৃষ্টি করে তবে তার বাস্তবতা রক্ষিত হয় না। মাধব কেবল ভাঁড়ুর প্রচণ্ড শাস্তির পরে তার চরিত্রগত 'কমিক এফেক্ট'কে বাঁচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন :

লোকের সাক্ষাতে ভাঁড়ু বোলে মিথ্যা কথা। / গঙ্গাসাগরে গিয়া মুড়াইয়াছি মাথা॥

ভাঁড়ু দত্তের প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে হাটুরেদের কয়েকটি খণ্ডচিত্র অঙ্কনে মাধব বাস্তববোধের আশ্চর্য ও নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন। চাউল বিক্রেতা ধনা রূঢ় ব্যঙ্গে ভাঁড়ুর বাকিতে চাল কিনবার প্রস্তাবকে প্রথমে উড়িয়ে দিল, কিন্তু ভাঁড়ু আপনাকে রাজার চর বলে পরিচয় দিতে ভীত হয়ে তার হাত চেপে ধরল—'পরিহাস কৈলাম ভাই করি দরাদরি।' নুনের কারবারী কথার মারপ্যাঁচে তাকে নিজের উপকারী বলে গণ্য করে নুন দিল। আনাজের দোকানী কোন ঝগড়া-গোলমালে যেতে চায় না, নির্বিরোধ মানুষ, আপনার লোকসান করেও সে নীরবে ভাঁড়ুর দাবি পূর্ণ করল। তেলী পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে ভাঁড়ুর শয়তানী কৌশলকে ভয় করত ; দ্রুত তেল দিয়ে বলল 'ক্রোধ না কর ভাঁড়ু মোর দিকে চাহ।' নিজেকে রাজার করবিভাগের কর্তা বলে পরিচয় দেওয়ায় সুপারি বিক্রেতা ভয় পেল। কিন্তু মেছুনি ভাঁড়ুর হাত থেকে মাছ কেড়ে নিল, ভাঁড়ু কর দাবি করলে তীক্ষ্ণ ভৎসনার সুরে বলল :

ডোমনীয়ে বোলে ভাঁড়ু তুই তার কে। / করের লাগি ধরিবেক জোয়াতি হয় যে॥

ভাঁড়ুর প্রতি বলপ্রয়োগ করতেও সে দ্বিধা করল না। এত সামান্য বর্ণনায় কতকগুলি মানুষের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রতি এই ইঙ্গিতে, কবির রচনা-নৈপুণ্য ও বস্তুসিদ্ধ দৃষ্টিরই পরিচয় দেয়। মধ্যযুগের কাব্যে অনুরূপ অবস্থায় চরিত্রগুলি একাকার হয়ে যেত —কাউকেই অন্যের থেকে পৃথক করা যেত না।

দ্বিজ মাধবের কাব্যের দোষগুণের যে পরিচয় নেবার চেষ্টা করলাম তার বিশ্লেষণে কবির ব্যক্তিত্ব খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাঁর কাব্যের কতকগুলি প্রধান লক্ষণ পাই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে না পারায় আমাদের অতৃপ্তি ঘোচে না।

৫ ৫· মুকুন্দরাম / চণ্ডীমঙ্গল

এক

মুকুন্দরাম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু ক্ষমতা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন নন। প্রথাকে কেবল অনুসরণই করেননি, প্রথানুগত্যদ্বারা নির্জিত কবিসম্প্রদায়ের তিনি অন্যতম। সে যুগের কবিদের প্রথাবদ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না। অন্তত মূল কাঠামোর চারপাশে যে আবর্তিত হতেই হবে কবিকে, এর সাক্ষ্য বাংলা সাহিত্যে সারা মধ্যযুগ জুড়ে। কিন্তু তার মধ্যেও নানাভাবে নিজের পথ করে নেবার চেষ্টা একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়।

ভারতচন্দ্র যেমন মঙ্গলকাব্যের কাঠামোয় আপন জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপে কার্পণ্য করেননি, মুকুন্দরাম থেকে তা প্রত্যাশা করা যায় না। ১৮ শতকের

ব্যক্তি-বোধ মুকুন্দরামের কালে ছিল না, আর ভারতচন্দ্রের জাতের প্রতিভাও তাঁর নয়। ঐতিহ্যকে মুকুন্দ অনুসরণ করেছেন, অতিক্রম করতে চাননি। প্রথার মধ্যে থেকেই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এ-সংগ্রামে শক্তির অপচয়ই ঘটেছে। ঐতিহ্যের এই বাধাই তাঁর সার্থকতার প্রথম সীমা, অবশ্য প্রধান সীমা তাঁর কবিদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে।

বাংলা মঙ্গলকাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে মনসামঙ্গলের মতো কাহিনীর নিপুণ গ্রন্থন মিলবে না। আদ্যন্ত একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কেন্দ্রে গল্পটি আবর্তিত নয়। ঘটনাসজ্জায় অনুবৃত্তি আছে, পারম্পর্য নেই। কালকেতুর জীবনের যে বিবরণ তাকে কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সমন্বয় বলেই মনে হয়। প্রথমে বর্ণিত হয়েছে তার জীবনের প্রাত্যহিকতা—ভোজন, শিকার ইত্যাদি। তারপরে গোধিকা-বন্ধন ও চণ্ডীর কৃপা এবং ফলে রাজ্যস্থাপন। এ পর্যন্ত কাহিনী প্রায় গতিহীন। শিথিল নিদ্রালুতা তার সর্বদেহে। কোনো বিপরীত ঘটনার সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয়নি। গল্পের শেষে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ-বর্ণনায় কিছুটা ঘটনাগত দ্বন্দ্বের সুর বেজেছে। কিন্তু কালকেতু ও কলিঙ্গরাজের সংগ্রাম কাহিনীর একটি সামান্য অংশ মাত্র। সমগ্র কালকেতু উপাখ্যান প্রধানত গতিহীন সংঘাতহীন ঘটনার কতকগুলি টুকরো, কালানুবৃত্তিতে তার যোগসূত্র। এই খণ্ডসূত্রগুলি কোন অখণ্ড কার্যকারণসূত্রে বদ্ধ নয়।

আধুনিক কথা-সাহিত্যে আখ্যানের অখণ্ড সমগ্রতা হয়ত অপরিহার্য নয়। কিন্তু আখ্যানের এই অপ্রাধান্য একান্তই অধুনাতন ধারণা। গল্প গঠনের নিপুণ সমগ্রতা উনিশ শতক পর্যন্তও আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়েছে। আর আধুনিক আখ্যান-শৈথিল্যও ক্ষমতার অভাবজনিত নয়, সম্পূর্ণ সচেতন। আর তাতেও 'Unity of Impression'-এর সিদ্ধিই অভিপ্রেত, কিংবা জীবন জিজ্ঞাসার কোন কেন্দ্রীয় বোধ অবিচলিত।

আখ্যানের প্রধান আকর্ষণ দুটি। [এক] আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত একক সমগ্রতায় বদ্ধ একটি কাহিনী। [দুই] একটি কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের বীজে কাহিনীটির সর্বদেহের বিকাশ। গভীরে এই দুটি লক্ষণের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। আখ্যানের একক সমগ্রতা কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের ঐক্যেই নির্ভরশীল।

কালকেতুর উপাখ্যানে এর অভাব সহজেই লক্ষণীয়। মুকুন্দরাম এ-অভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এবং এই ক্ষতিপূরণের কিছু চেষ্টাও তিনি করেছিলেন—এমন প্রমাণ মেলে। কালকেতুর নিস্তরঙ্গ কাহিনীতে তরঙ্গোদ্বেলতা আনবার জন্য একটা দীর্ঘ অংশ জুড়ে পশুদের নানা কথাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মূল কাহিনীর দ্বন্দ্বের অভাব কালকেতু ও পশুদের সংঘাত-সংগ্রামের ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে মেটাতে চেয়েছেন। পশুরাজের নিকট পশুগণের গমন, পশুগণের প্রার্থনা, সিংহের যুদ্ধ-সজ্জা, পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ, পশুরাজের যুদ্ধে গমন, পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ, পশুদিগের রণে ভঙ্গ, পশুগণের রোদন, চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন—প্রভৃতি নামাঙ্কিত বর্ণনায় খণ্ডে খণ্ডে তা বিস্তৃত। দ্বিজ মাধবের কাব্য কালকেতুর মৃগয়া এবং

দেবীর নিকট পশুদের বিলাপ ও দেবীর আশ্বাস দানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়ই তৃপ্ত। মুকুন্দরামের চেষ্টা গল্পটির মূল চরিত্রে পরিবর্তন তো আনতে পারেইনি, গাঢ়বদ্ধ মানবরসের রাজ্য থেকে উপকথার খেয়ালী কল্পনায় পথভ্রষ্ট হয়েছে।

ধনপতির উপাখ্যানেও একই ত্রুটি। গল্পের কোন কেন্দ্র নেই, এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের যোগসূত্র কেবল এর পাত্রপাত্রীরাই। ধনপতির খুল্লনাকে বিবাহ, ধনপতির গৌড়-প্রবাস ও খুল্লনা-লহনার কলহ এবং খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা, ধনপতির সিংহল গমন, শ্রীমন্তের বাল্যলীলা ও শ্রীমন্তের সিংহল অভিযান। লহনা ও খুল্লনার কলহে কিংবা শ্রীমন্তকে কেন্দ্র করে চণ্ডীর সৈন্যদের সঙ্গে সিংহলরাজের সংগ্রাম কিংবা রাজা বিক্রমকেশরীর সঙ্গে একই কারণে আবার সংগ্রাম ছাড়া দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন কেন্দ্র কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রিত করেনি। ধনপতি উপাখ্যানে ঘটনাসজ্জায় পূর্ববর্তী দ্বিজ মাধবের সঙ্গে এমন কিছু পার্থক্য মুকুন্দরামের নেই। মাঝে মাঝে পুরাণ-কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার যুক্ত করে কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধির চেষ্টায়ই মুকুন্দরামের নবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস। মূল কাহিনীর সঙ্গে এদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা যেমন নেই তেমনি বক্র তাৎপর্যও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে এ যুগের পাঠকদের পক্ষ থেকে, বড় কবি হয়েও এমনি দুর্বল কাহিনীধারা অনুসরণের কি প্রয়োজন ছিল মুকুন্দরামের? এ কি কেবল অন্ধ কবি-ক্ষমতার কাব্য বিচারের অক্ষমতা? প্রাচীন সাহিত্যের পাঠকের সঞ্চয়ে এর উত্তর অনেকটা প্রস্তুতই। চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গল কিংবা ধর্মঠাকুরের কাহিনী, সাহিত্যধারা হিসাবে এদের তো প্রতিষ্ঠা নয়। এরা ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মনসার ভক্ত মনসার কাহিনীই লিখবেন, বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার চেষ্টামাত্র করবেন না, কারণ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বোধ নয় ধর্মসাধনাযুক্ত প্রথানুসরণই তাঁর মজ্জাগত। মুকুন্দরাম কেন চণ্ডীমঙ্গল লিখলেন তাঁর কারণ ধর্মবিশ্বাসে, সাহিত্যিক বিচার-বোধে নয়। কিন্তু এ যুক্তির গোড়ায় একটা বড় ফাঁক আছে। মুকুন্দরামের যুগে মঙ্গল দেবতাদের মাহাত্ম্যকীর্তন একটা সাহিত্যধারায় মাত্র পর্যবসিত হয়। চৈতন্য-প্রভাবে চণ্ডী-মনসার ক্ষমতায় বিশ্বাস তখন ক্ষয়িত। অন্তত এই অনার্যকুলসম্ভূত দেব-দেবীর উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি পাবার যে প্রাথমিক উৎসাহে বিজয় গুপ্ত-নারায়ণদেবের মঙ্গলকাব্য লিখিত তা তখন আরও সুদূর স্মৃতিতে। এ কেবল পশ্চাদ্‌ভূমির ইতিহাস বিশ্লেষণ নয়, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে প্রমাণিত। প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথাই বলা যাক। কাব্যশেষে স্বয়ং চণ্ডীর মুখ দিয়ে কবি কথা বলিয়েছেন :

> কলির চরিত্র যত বিষম গণন। / ইহাতে ঔষধ কিছু আছয়ে কারণ ॥ / কলিকাল-গরলে ঔষধ নারায়ণ। / বদনে করিলে পান না দেখে শমন ॥ / ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়। / জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয় ॥

অর্থাৎ তাঁর কালে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ফলশ্রুতিতেও হরিভক্তি। কাজেই চণ্ডীমঙ্গল লিখতে কবিকে চণ্ডী উপাসক কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সীমাভুক্ত হতে হয়নি।

মঙ্গলকাব্য চৈতন্যোত্তর পর্বে একটা সাহিত্যিক 'pattern' বা কাব্যাকৃতিতে পরিণত। কাজেই মুকুন্দরামের মতো বড় কবি কেন এ জাতীয় একটি কাব্যাদর্শের অনুসরণ করলেন এ প্রশ্ন তোলা খুব অসঙ্গত নয়; বিশেষ করে তাঁর পক্ষে চণ্ডী বা কোন বিশেষ ধারানুসরণ যখন বাধ্যতামূলক ছিল না।

মুকুন্দরামের বৈষ্ণব-মানসিকতা প্রশ্নাতীত। তাই এ কথা মনে করা যেতে পারে বৈষ্ণবপদের অনুসরণে তিনিও একজন মহাজন পদাবলীকর্তা হয়ে উঠলেন না কেন? এর উত্তর তাঁর কবিপ্রতিভার স্বরূপের মধ্যেই রয়েছে। বস্তুভারহীন, তথ্যোত্তীর্ণ অনুভূতিসর্বস্বতা বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ। হৃদয়ের গভীরতম রহস্যলোকে, আশা-নিরাশা, সংশয়-সন্দেহ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এক কুহেলি-আচ্ছন্ন মনোরাজ্যেই বৈষ্ণবপদের নিত্য অভিসার। তাঁর কবিদৃষ্টি রহস্যলোক ভেদে অসমর্থ, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম উর্মি মুখরতা তাঁর বোধকে স্পর্শ করে না। মুকুন্দরামে অনুভূতির সর্বস্বতা তো নয়ই, প্রাধান্যও নেই। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণযোগ্য: 'মুকুন্দরাম রোমান্টিক কবি ছিলেন না, জীবনের সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ ভাব-ব্যঞ্জনা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের কবি এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন। কাজেই বৈষ্ণব কবির অতীন্দ্রিয়, ভাব বিভোর কল্পনা তাঁহার মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না।' বোধ হয় এই একই কারণে মনসামঙ্গলের কাব্যধারাও তাঁর কবিচিত্তের আশ্রয় হয়ে ওঠেনি। মনসামঙ্গলের কাব্যকল্পনায় এমন একটি বলিষ্ঠ আদর্শবাদ আছে, সর্বত্যাগী কিন্তু জীবনরসপুষ্ট এমন একটি সংগ্রামী চরিত্রের কল্পনা আছে যা প্রত্যক্ষবাস্তবতায় দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা হয়ে ধরা দেবার নয়। বিশেষ করে বেহুলা চরিত্রের মধ্যে মৃত্যুস্রোতে ভাসমান জীবনকে দুহাতে আঁকড়ে ধরবার যে রোমান্টিক কামনা ব্যঞ্জিত হয়েছে মুকুন্দরামের প্রতিভার স্বরূপেই তার থেকে পার্থক্য।

মুকুন্দরামের বাস্তববাদী বিশিষ্টতারও পরিচয় এখানে মিলবে। বাস্তববাদী দৃষ্টিতে কল্পনার প্রাধান্য স্বীকৃত হয় না। কিন্তু কল্পনার দৈন্যও তার সাধারণ লক্ষণ নয়। বস্তুবাদী কবির কল্পনা বস্তুবোধের কেন্দ্রেই আবর্তিত। বস্তুভেদী বা বস্তু-অতীত লোকে তার প্রয়াণ নয়। কিন্তু কল্পনার দৈন্যে এই বস্তুবাদী দৃষ্টি কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সামান্যতার সীমায় সমাহিত হয়ে যায় না। এ যুগের নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বাস্তবতাও অভিজ্ঞতায় সীমায় বদ্ধ, কল্পনায় দীন। তাই ক্ষমতার প্রাচুর্যও প্রথম শ্রেণীর গৌরবে তাঁকে সমুন্নীত করতে পারেনি। মুকুন্দরাম সম্পর্কে অনেকাংশে এ কথা বলা চলে:

'Realism in literature is an attitude which purports to depict life and to reproduce nature, in all aspects, as faithfully as po sible,'—স্বভাবতই এখানে কল্পনার লীলার সুযোগ কম। কিন্তু যদি সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখি 'realism which reflects detachment' ব্যক্তি-চিত্তের কামনা-

বাসনা-বর্ণালীর আলোকপাতে বস্তুরূপ সেখানে আবৃত হবে না, তবে কবি-কল্পনার মূলোচ্ছেদ অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত হবে না। শ্রেষ্ঠ বস্তুবাদীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কল্পনার সাহায্যেই বস্তু-বিশ্বের ব্যাপক ও গভীর সত্যকে আয়ত্ত করবেন। কিন্তু তাঁদের কবিদৃষ্টির বিশিষ্টতায় কল্পনার বিষয়ও বস্তুরূপে সত্য হয়ে ধরা দেবে, আত্মচিন্তার আরোপে কবিচেতনার বাহন মাত্র হবে না।

মুকুন্দরামের 'detachment'-এর পরিচয় কিছু কিছু তাঁর কাব্যে আছে। এই আত্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিবলেই তাঁর কবিচিত্ত আপন ব্যক্তিজীবনের দীর্ঘ বেদনাকে উত্তীর্ণ হয়েছিল, পশুকুলের মধ্যে এই দুঃখবেদনার প্রতিফলনকে সরিয়ে নিয়ে কৌতুক করতে পেরেছিল। 'নিউগি চৌধুরী নই না রাখি তালুক'। দক্ষযজ্ঞে বিপর্যস্ত ব্রাহ্মণদের উপবীত-প্রদর্শনেও কৌতুক অনুভব করেছে। মুকুন্দরামের এই কৌতুকে কবিমনের জীবন ও জগৎপরিবেশ থেকে ঊর্ধ্বায়নের স্পর্শ লেগেছে।

তা ছাড়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রাজ্য থেকে বাংলার সামাজিক মানুষের কতকগুলি 'টাইপ' সৃষ্টিতে কবির বস্তু-দৃষ্টি সীমিত অর্থে সার্থক। কিন্তু কল্পনার দৈন্যজাত ব্যর্থতাও এ কাব্য-অঙ্গে নানাভাবে প্রকট।

দুই

একদিকে কল্পনা-দৈন্য অন্যদিকে প্রথানির্দিষ্ট সীমার দুর্লঙ্ঘ্য কঠোরতা। মুকুন্দরামের ধনপতি-উপাখ্যানে খুল্লনা-ধনপতির অস্পষ্ট পূর্বরাগ-বিবাহ-বিরহ ও পুনর্মিলনকে কেন্দ্র করে একটি প্রেম-কথা-রচনার আভাস মিলছে। পারাবত ক্রীড়ার কথা দ্বিজ মাধবেও আছে, কিন্তু মুকুন্দরামে ধনপতির কপোত লক্ষপতির গৃহচূড়ে উড়ে বসেনি, খুল্লনার অঞ্চল আশ্রয় করেছে। ধনপতির কথায় :

কে তুমি পায়রা লয়ে যাও হে সুন্দরি। / পারাবত লয়ে মোর প্রাণ কর চুরি॥

যে দ্ব্যর্থকতা তাতে বক্তার প্রণয়-নিবেদনের সুর বেজেছে। বিশেষ করে খুল্লনার পরিহাসরসিকতায় পূর্বরাগ সঞ্চারের ইঙ্গিত প্রায় স্পষ্ট। তা ছাড়া 'বসন্ত আগমনে খুল্লনার খেদ', 'শারী-শুক-প্রতি খুল্লনা', 'তরুলতার প্রতি খুল্লনা,' 'ভ্রমরের প্রতি খুল্লনা', 'কোকিলের প্রতি খুল্লনা' কিংবা 'খুল্লনার বিরহ-বেদনা' অংশে প্রকৃতির পরিবেশে বিরহিণী নারীর বেদনা অনেকখানি উৎসারিত। বেদনায় ক্রন্দনে ইন্দ্রিয়ানুগ প্রত্যক্ষতা থাকলেও বৈষ্ণব কবিতার কথাই এরা স্মরণ করিয়ে দেয়। মঙ্গলকাব্যের কাঠামোয় প্রেমকাহিনী চিত্রণের সুযোগ অল্প। মুকুন্দরামে তাই বীজ আছে, বিকাশ নেই। মৈমনসিংহ গীতিকায় মুক্তহৃদয়ের যে লীলা খুল্লনা তার ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু তৃপ্ত করে না।

রোমান্টিক প্রণয়-চেতনার আকস্মিক মুক্ত দীপ্তিতে নয়, নিত্যপ্রবহমান পরিবার-ধর্মের কথায়ই মুকুন্দরামের পারদর্শিতা। এই পরিবারধর্ম থেকে কাহিনী যেখানেই উঁচু সুরে মনোবীণাকে বেঁধে দিতে চেয়েছে তার সেখানেই ছিঁড়ে গেছে। তাঁর

বাস্তব-দৃষ্টির স্বরূপ-নির্ণয়ে যে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সীমার কথা বলেছি বর্তমান প্রসঙ্গে মূল কারণ হিসেবে তাই উল্লেখ্য। তাঁর কাব্যে গুটি তিনেক যুদ্ধের বর্ণনা আছে। মধ্যযুগের বাংলা দেশে যুদ্ধবিগ্রহ হয়ত বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল, কিন্তু কবির চিত্তকে তা স্পর্শ করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। যুদ্ধ বর্ণনায় মামুলি একঘেয়েমি তো আছেই, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎসারিত কিছু বীররস এবং ডাকিনী-যোগিনী সহযোগে কিছু বীভৎস রস সৃষ্টির চেষ্টাও আছে। রামায়ণ-মহাভারতের সিদ্ধির কথা ছেড়ে দিলেও কোন কোন ধর্মমঙ্গলের যে সীমাবদ্ধ সার্থকতা যুদ্ধবর্ণনায় এক রুদ্র-ভয়ানক স্বাদের সৃষ্টি করতে পেরেছে মুকুন্দরামে তার চিহ্নমাত্র পাওয়া যাবে না। অপর পক্ষে যুদ্ধ-জাতীয় বিপর্যয়কে লক্ষ্য করে ভারতচন্দ্রের যে বক্র মন্তব্য ও উল্লাস অথবা গম্ভীর গভীর পরিবেশ সৃষ্টির সার্থকতা মুকুন্দরামে তারও অভাব। যুদ্ধ-ঘটনায় যে কবির প্রাণের উদ্বোধন ঘটেনি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পুনরুক্তিতে। শ্রীমন্তকে রক্ষা করবার জন্য সিংহল রাজসৈন্যের বিরুদ্ধে চণ্ডীর সংগ্রামের একটা হুবহু সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মিলবে উজানী-রাজ বিক্রমকেশরীর সঙ্গে চণ্ডীর দেব-সেনার সংগ্রামে। আর প্রতিটি যুদ্ধই শেষপর্যন্ত মৃত সেনাদির পুনরুজ্জীবনে সর্বজনীন আনন্দে পরিসমাপ্ত। অর্থাৎ এ যুদ্ধে যুদ্ধত্ব নেই, কেবলই দৈবী মায়া, কেবলই তাঁর লীলা।

কবির কাব্যে পুরাণ-কাহিনীর সার-সংকলন ঘটেছে অনেকবার। পৌরাণিক সংস্কার তাঁর চিত্তে মোটামুটি দৃঢ় ছিল। এমনকি তাঁর অভিজ্ঞতাজাত বাস্তব দৃষ্টির বিকাশে এই সংস্কার নানা বাধার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে ব্যাধ সমাজের চিত্র অঙ্কনে এই সংস্কার যে তাঁকে বহুবার বাস্তবতাচ্যুত করেছে দ্বিজ মাধবের তুলনায়, এ-বিচার সমালোচকেরা করেছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'বরং কোন কোন স্থলে দ্বিজ মাধবের সহিত তুলনায় মুকুন্দরাম অধিকতর আদর্শবাদী; বাস্তব ঘটনাকে তিনি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-সাধনার আদর্শে পরিমার্জিত করিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধবে কালকেতুর বিবাহ-ব্যাপারে বরের পিতা সোজাসুজি কন্যার পিতার নিকট গিয়া তাহার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে ও ব্যাধ সুলভ সরলতার সহিত পণ নির্ধারণ করিয়াছে। মুকুন্দরামে কিন্তু এই সমস্ত দরদস্তুর ঘটকের মাধ্যমে সংঘটিত হইয়াছে, উচ্চ বর্ণের রীতি-নীতি তিনি নির্বিচারে নীচ বর্ণে আরোপ করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবে ধর্মকেতুর মৃত্যু ঘটিয়াছে সচরাচর বন্য পশু-শিকারে নিযুক্ত ব্যাধের যেরূপ ভাবে ঘটিয়া থাকে—সিংহের আক্রমণে; অবশ্য নিদয়া উচ্চবর্ণ সুলভ হিন্দু আদর্শ অনুসরণে স্বামীর চিতায় পুড়িতে সহমরণে গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিপুষ্ট মুকুন্দরাম কিন্তু এরূপ প্রাকৃত মৃত্যুতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজ কাব্যের আভিজাত্য বজায় রাখিতে ধর্মকেতু-নিদয়াকে বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করাইয়া কাশী পাঠাইয়াছেন। জাতকর্ম বা বিবাহের আচার অনুষ্ঠানেও তিনি ব্যাধ পরিবারে ভদ্র ঘরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর, ব্রাহ্মণ্য শাসনের নিখুঁত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন।' [কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ভূমিকা]

পৌরাণিক সংস্কারের প্রতি প্রীতিই তাঁকে কাব্য-কাহিনীতে নানা পুরাণকাহিনীর সার-সংকলনে প্ররোচিত করেছে। পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের আধিক্যে তিনি কালকেতু ও ফুল্লরার জবানীতেও নানা পুরাণকাহিনীর উদাহরণ-উপমার উল্লেখে দ্বিধামাত্র করেননি। অনার্য সংস্কৃতির এই নরনারীর জিহ্বাগ্রে সীতা-নির্বাসন, বালী-সুগ্রীব দ্বন্দ্ব, পরশুরামের মাতৃহত্যা, সাবিত্রী-সত্যবান-যমরাজ সংবাদ এত সাবলীল এবং অনায়াসসাধ্য যে এদের চরিত্রাঙ্কণে কবিচিত্তের অভিপ্রায় ব্যাহত হয়েছে। ধনপতি উপাখ্যানেও অজস্র পুরাণকাহিনীর উল্লেখ আছে ; শিবিরাজার দানধর্ম, গঙ্গার উৎপত্তি ও সগরবংশের উদ্ধার বিবরণ, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথা ও পুরীর বিবরণ, কংস রাজার জন্ম, সীতার জীবনী ও সেতুবন্ধের কথা অবশ্য খুব অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট নয়। ধনপতি এবং শ্রীমন্তের সিংহলে বাণিজ্যযাত্রায় তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে তীর্থ-মাহাত্ম্য জ্ঞাপক পুরাণকাহিনী বর্ণনা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও একেবারে ঔচিত্যহীন সূত্রহীন নয়।

কিন্তু এই কাহিনীগুলি কোন বিশিষ্ট রসসৌন্দর্য সৃষ্টিতে সার্থক হয়নি। পুরাণ-ঘটনার সমৃদ্ধ এবং বর্ণাঢ্য জীবন-চিত্র মুকুন্দরামের ভাষায় বিদ্ধ হবার নয়। জীবন-চর্যার প্রাত্যহিক সামান্যতার মধ্যে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-বিকাশে ঘটনাগত বিবরণের উপর কৌতুকহাস্যের যে বিচ্ছুরণ অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রের গভীরে যে নব আলোকপাত, সেই অসামান্যতা সৃষ্টিতেই মুকুন্দরামের কৃতিত্ব। পৌরাণিক ঘটনার রাজ্যে কর্মযজ্ঞের যে ঘনঘটা জীবনের যে মহাসঙ্গীত উদ্গীত তার প্রবল গম্ভীর ও সমুন্নীত সুরলহরী মুকুন্দ-রামের আয়ত্ত ছিল না।

আসলে এইসব ব্যর্থতার মধ্যে কবির পরিচয় নেই। তিনি পরিবারতন্ত্রের কবি। বাঙালির গৃহজীবনের শ্লথ-গতি দৈনন্দিনের চিত্রাঙ্কণেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কাহিনীর নানা অলঙ্করণ ও প্রথাবদ্ধতার মধ্য থেকে কবিসৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। সম্ভবত আপন অভিজ্ঞতাজাত যে বাস্তবতার সৃষ্টিতে কবির সার্থকতা তারই উপযুক্ত আধার হিসেবে পারিবারিক জীবনচিত্রণকে তিনি বেছে নিয়েছেন। আর এদিক থেকে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীধারা কবিকে যথোচিত সুযোগ করে দিয়েছে। মুকুন্দরামের কবিদৃষ্টির এবং সৃষ্টিক্ষমতার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে একথা বলা যায় যে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতেই তাঁর আপন রচনাশক্তি প্রদর্শনের অধিক সম্ভাবনা। মনসামঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গলে পরিবার জীবনের কথা আছে, কিন্তু কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ একটা আদর্শবাদের সংগ্রামে অথবা বহুবিস্তৃত যুদ্ধঘটনার বর্ণনায়। অবশ্য মঙ্গলকাব্যমাত্রেই সমাজ ও পরিবার জীবনের যে ছবি প্রাপ্তব্য তা থেকে মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল কাব্যধারাও বঞ্চিত নয়। বিবিধ পূজার্চনা, মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ, সাধ, নবজাতক শিশুকে কেন্দ্র করে নানা স্ত্রী-আচারের বর্ণনা সর্বত্রই আছে। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্য এই প্রথাবদ্ধতা-নিরপেক্ষভাবেই পারিবারিক জীবনলীলার কাহিনী হিসাবে গ্রাহ্য। এবং তারই সূত্র ধরে আছে সমাজজীবনের নানা কৌতুককর

অসঙ্গতিতে সার্থক কটাক্ষপাত।

কালকেতু-ফুল্লরার ব্যাধজীবন, ভোজন-বিচিত্রতা, নিত্য-দারিদ্র্য, শিকার-কৌশল, সপত্নী-ভীতি, অর্থ প্রাপ্তির আকস্মিক সৌভাগ্য এমনি নানা খণ্ডচিত্রের বর্ণনায় এদের চরিত্র প্রাণ পেয়েছে। যদিও এরা কোন অখণ্ড পারিবারিক সমস্যার কেন্দ্রে বদ্ধ নয়। এরই পাশে মুরারি শীলের শাঠ্য এবং ভাঁড়ু দত্তের হীন স্বার্থপরতা ও কপট মৈত্রীর অন্তরালে সর্বনাশা শত্রুতা একটি বাস্তব সামাজিক পটভূমিকায় কালকেতু-ফুল্লরার জীবন-চিত্রকে স্থাপিত করেছে। কিন্তু যেমন পারিবারিক তেমনি সামাজিক চিত্রেও কোন কেন্দ্রীয় সমাজ-সমস্যার আভাস নেই। ধনপতির কাহিনীতে পরিবার-ধর্ম অনেক নিবিড়। লহনা-খুল্লনার সপত্নী-সম্বন্ধ [বিশেষ করে দুর্বলা ও লীলাবতীর ভূমিকাসহ] যেমন আমাদের কৌতুক আকর্ষণ করে, তেমনি খুল্লনার যৌবন-বেদনা এবং লহনার অপগতযৌবনের ব্যর্থতার জ্বালার মধ্যেকার বৈপরীত্য লক্ষ্য করবার। একদিকে পুত্রবতী নারীর সদা শঙ্কাময় গৌরব অপরদিকে পুত্র-হীনার গতিহীন কর্মহীন জীবনভার। বৈশিষ্ট্যহীন নিত্যকার ঘটনা এগুলি। এর চারপাশে সামাজিক মানুষের দু-একটি টুকরো ছবি আছে। খুল্লনার সতীত্বের বিবিধ পরীক্ষার যে বর্ণনা তা পৌরাণিক আদর্শানুগ এবং কাহিনীর মূল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এর মধ্যে বণিক প্রধানদের সভামর্যাদা নিয়ে বিতর্কের অংশই কেবল কৌতুকরসসিঞ্চনে স্বাদু।

মুকুন্দরামের কৃতিত্ব এই সামান্য আয়োজনকে রসাবেদনে অসামান্য করে তোলার মধ্যে। বাচনভঙ্গিতে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কৌতুক ও কটাক্ষের আলিম্পনায় এবং সর্বোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে নিপুণতা এবং ক্বচিৎ গভীর দক্ষতা প্রদর্শনে তিনি পরবর্তী বাংলা গার্হস্থ্য উপন্যাসগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেন।

তিন

মুকুন্দরামের সৃষ্টির যে অংশ যুগান্তরেও স্থায়িত্বলাভের উপযোগী তা হল এর চরিত্রগুলি। চরিত্রগুলির দিকে তাকালেই সর্বপ্রথম যে বিশিষ্টতা প্রতিভাত হয়, [১] দুটি কাহিনীর কোনটিতেই কোন প্রধান চরিত্র নেই। নায়কের যে ভূমিকা •কাব্যমধ্যে কালকেতু বা ধনপতি কেউই সে দাবি পূর্ণ করে না। আসলে দুটি কাহিনীতেই কতকগুলি অপ্রধান চরিত্রের ভিড়। কালকেতুখণ্ডে ফুল্লরা, ভাঁড়ু ও মুরারি শীলই আলোচনার যোগ্য বিশিষ্টতা পেয়েছে। চণ্ডী যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিত্ব পেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ধনপতি খণ্ডে ধনপতি, খুল্লনা-লহনা, দুর্বলারই কিছু বিশিষ্টতা আছে। শ্রীমন্ত চরিত্রের ভূমিকা অস্পষ্ট। [২] চরিত্রগুলির ভূমিকা খুব বিস্তৃত নয়, মূল যে বৃত্তিগুলির সমন্বয়ে এদের গঠন তার মধ্যে বৈচিত্র্য কিংবা জটিলতা কম। একটি দুটি মানবিক বৃত্তিই এদের চরিত্র-ভিত্তি। এদের চরিত্রগুলিকে, তাই আমরা টাইপ চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। রাউণ্ড চরিত্রের একক ব্যক্তিত্ব ও বহুবৃত্তির

জটিলতা এদের মধ্যে নেই। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নিয়েও স্বীকার করা উচিত যে এদের ভূমিকার ঔজ্জ্বল্য অসামান্য। এরা জীবন্ত তো বটেই, জীবনের কিছু কিছু জিজ্ঞাসাও এদের কোন কোন চরিত্রের মধ্য থেকে উচ্চারিত। [৩] টাইপ চরিত্রের সাধারণ ধর্মানুযায়ী এরা সকলেই স্থিতি-প্রাণ বা স্ট্যাটিক। ঘটনাগত পরিবর্তন কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, খুল্লনার জীবন ও ভাগ্যে ঘটেছিল। কিন্তু তাদের চরিত্রগত কোন পরিবর্তনের চিত্র এ কাব্যে ধরা পড়েনি।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি পাত্রের মুখে বলিয়েছেন, 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোনো কাজের নহে।' [নরনারী : পঞ্চভূত] ধনপতি ও শ্রীমন্তের সক্রিয়তা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে, খুল্লনার চরিত্রও একই প্রসঙ্গে বিচার্য। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ফুল্লরা কালকেতুর তুলনায় এমন কিছু অধিক 'নড়িয়া বেড়ায়' না। আর কালকেতুরও বিকৃত বৃহৎ স্থাণুত্ব সৃষ্টিক্ষমতার ব্যর্থতার ফল নয়, চরিত্র-সৃষ্টির এক বিশিষ্ট আদর্শেরই নিদর্শন।

কালকেতু ও ফুল্লরা অন্ত্যজ ব্যাধ শ্রেণীর মানব-মানবীর প্রতিনিধি। এই জাতীয় মানবের জীবন ও মনের বিশিষ্টতার পরিচয় মিলছে রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতায় :

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা— / নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা, / নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর, / নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর / উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত / সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত / অকাতরে ; পরিতাপ জর্জর পরানে / বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে, / ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায় / বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় / নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লসি— —[বসুন্ধরা]

সভ্যতার অগ্রগতিতে আমাদের মানসিক জটিলতা বহুগুণে বেড়ে গেছে। চিন্তা, বিচার-বিশ্লেষণ, কামনা-বাসনা, প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। কিন্তু এই অন্ত্যজ সমাজে চিন্তা ও মননের প্রাধান্য ঘটেনি। মনের ভূমিকা এখানে সামান্যই, দেহবুদ্ধিই এ শ্রেণীর জীবনবোধের সীমা। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় মানুষকে গাছের সঙ্গে উপমিত করেছেন। 'ঐ একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শাল পাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে ওটি আমার ভৃত্য, নাম নারায়ণ সিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত, উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠাল গাছটির মতো।...এই জীবধাত্রী শস্য-শালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গ-সংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ-বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আস্তা গাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণ সিংটি

তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণ সিং।' —['মন' : পঞ্চভূত]

স্বভাবতই এই জাতীয় চরিত্র, আমাদের মন-প্রধান জীবন-চর্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, বেশ খানিকটা স্থাণু বলেই মনে হয়। কালকেতুর জড়ত্ব এই ধরনের। তাই তা কবির সৃষ্টি-ক্ষমতার ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে না, এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার বিশিষ্টতার সংবাদ দেয়।

কালকেতু বীর এবং শিক্ষাসংস্কারহীন বর্বর। এই বর্বরতা তার বীরত্বেরও বিশেষণ। কালকেতুর যুদ্ধজয় প্রায়ই অস্ত্রপ্রয়োগের নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখে না। মুষ্ট্যাঘাতে সিংহব্যাঘ্রকে পরাজিত ও নিহত করাতেই তার কৃতিত্ব। কলিঙ্গ-সেনার সঙ্গে যুদ্ধেও সে দীর্ঘকাল সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকেনি, ধনুঃশর পরিত্যাগ করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পশুসুলভ এই যুদ্ধরীতি, অথবা ভোজনপ্রণালী তার চিত্তবৃত্তির আদিম ও অপরিণত গঠনেরই পরিচয় দেয়। দারিদ্র্যের জন্য সে নিত্য হাহাকার করে না, কিন্তু ভোজ্যদ্রব্যের স্বল্পতা তার দেহকে পীড়িত করে। অর্থ-সম্পদের প্রতি তার লোলুপতা না থাকলেও লোভ আছে। শিকারে যেদিন কিছুই জোটে না দেহের চিন্তাই তাকে বিব্রত এবং চিন্তিতও করে তোলে। কিন্তু মনের এই সামান্য ক্রিয়াশীলতা দেহসীমায়ই যেন সীমিত, কাজেই আদৌ অসঙ্গত নয়। কালকেতু তার ব্যাধজীবনের পরিবেশে চতুর না হলেও নির্বোধ নয়। প্রয়োজনবোধে মুরারি শীলের ধূর্ততাকেও সে প্রতিরোধ করতে জানে। কিন্তু এ বুদ্ধির প্রসার বেশি নয়। সম্পদদায়িনী দেবীর প্রতি তার সন্দেহ বালসুলভ অপরিণত বুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। এই অপরিণত বুদ্ধিই ধার ও ভারের পার্থক্য বোঝে না, সাত রাজার ধন এক মাণিক্য-খচিত অঙ্গুরীর তুলনায় সাত ঘড়া ধনই বেশি কাম্য মনে করে। আপন বুদ্ধির সামান্যতার জন্যই আত্মবিশ্বাস নেই তার, তাই যুদ্ধ-জয়ের পরেই ধান্যশালায় পলায়ন তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

ব্যাধজীবনের অরণ্য পরিবেশে সে জীবন্ত; কিন্তু রাজ্য পরিচালনার বুদ্ধি ও মেধাপ্রধান বৃত্তিতে সে ম্রিয়মাণ। রাজা কালকেতুর কোন চিত্রই পাঠকদের চোখে ধরা পড়ে না। সে যেন রূপশক্তিহীন একটা অস্তিত্বমাত্র।

দুটি মাত্র স্থানে এ চরিত্র-নির্মাণে কবিদৃষ্টি ঔচিত্যভ্রষ্ট হয়েছে। ছদ্মবেশী চণ্ডীকে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত করবার মানসে পুরাণাদির উল্লেখ কালকেতুর পক্ষে যেমন অসঙ্গত, তেমনি অস্বাভাবিক কলিঙ্গরাজের প্রশ্নের জবাবে বক্রচতুর বাক্যে আপন চণ্ডীভক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করা।

ফুল্লরার ভূমিকা খুবই সংক্ষিপ্ত। কালকেতুর চরিত্র-কল্পনার পিছনে যে ভাব-বৃত্ত ফুল্লরায়ও তারই প্রকাশ ঘটেছে—সেই চিন্তাহীন জিজ্ঞাসাহীন জীবন বহন। ফুল্লরার বারমাস্যা নিয়ে নানা আলোচনা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় বলেছেন যে এ বিবরণে আর যা হোক দুঃখ নেই। দুঃখের কাঁদুনি দীর্ঘ-বিতানিত ছন্দে বর্ণনা করার মানসিকতা ফুল্লরার

নয়। কারণ বারমাসী বর্ণনার পূর্ব-মুহূর্তেই সে অনাহার থেকে বাঁচবার জন্য প্রতিবেশির কাছ থেকে অম্লানবদনে চাল ধার চাইতে দ্বিধা করেনি। ফুল্লরা চরিত্রের বিশিষ্টতা সপত্নীভীতিজনিত বাগবিস্তারের এই অশিক্ষিতপটুত্বে এবং এই কৌশলও ব্যর্থ হওয়ায় কালকেতুর কাছে ছুটে যাওয়ার ব্যাকুলতায়। এ ছাড়া মাণিক্য অঙ্গুরী গ্রহণে স্বামীকে নিষেধ করা, টাকার ঘড়া কোলে করে ঘরে বসে থাকা, কালকেতুকে অকারণেই ধান্যশালায় লুকিয়ে পড়ার পরামর্শ দেওয়া—এই ঘটনার সামান্য টুকরোগুলিই ফুল্লরার বৈশিষ্ট্যহীন চরিত্রকে মাঝে মাঝে চকিত রমণীয়তায় উজ্জ্বল করে তুলেছে।

ভাঁড়ু দত্ত এবং মুরারি শীল একান্তভাবেই সামাজিক টাইপ। মুরারি শীলের শাঠ্য ও কপটতা ভাঁড়ু দত্তে villainy-তে পরিণত হয়েছে। এই চরিত্র দুটি অঙ্কনে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা আছে। এদের ভূমিকার ঔজ্জ্বল্য আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। তবে এদের চরিত্রের মৌল-উপাদানগুলি আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতার বিষয়—তাই এরা বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

ধনপতি আখ্যানের দুর্বলা ঠিক ভিলেন জাতীয় নয়। তার দ্বিমুখী নীতি যথেষ্ট কৌতুকাত্মক হলেও মূল আকর্ষণ যে লহনার প্রতিই ছিল কাব্যাংশে তার প্রমাণ আছে। খুল্লনার প্রতি মৌখিক সদ্ভাব ধনপতির আগমনের পরে ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা চিন্তা করেই প্রদর্শিত হত। কিন্তু এই স্বার্থপর হীনমনা দাসীশ্রেণীর নারীও যখন শিশু শ্রীমন্তকে ঘিরে একটি বাৎসল্যসিঞ্চিত আনন্দরসোজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে :

দুর্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত। / আনন্দে পুলকে শিশু নাচে গায় গীত ॥

তখন এক নব আলোকপাতে দুর্বলা কিছু নতুন আলোক পায়।

খুল্লনা চরিত্রের প্রতি কবির সহানুভূতি সর্বাধিক। কাব্যের বিস্তৃততম অংশ জুড়ে তার অবস্থান। তার কুমারী হৃদয়ে অস্পষ্ট প্রণয়-সঞ্চারের ইঙ্গিত থেকে পুত্র-পরিজন পরিবৃত হয়ে ধরাধাম পরিত্যাগ করার দীর্ঘ-কাহিনীতে বিচিত্র ভূমিকায় তার স্থিতি তাকে নানাদিক থেকে চিনবার সুযোগ করে দেয়। খুল্লনায় রোমান্টিক প্রেমের বিকশিত চিত্র নেই। কেন নেই, আগেই আলোচনা করেছি। বরং রোমান্টিক প্রেমের নায়িকা যে হতে পারত তাকে সপত্নীর সঙ্গে কলহরত নয় যুদ্ধরত যখন দেখি তখন ঘটনার হাস্যকর অসঙ্গতিতে গোপনে একটু পীড়িত না হয়েও পারি না। খুল্লনার প্রেম তাকে বেহুলায় পরিণত করেনি, কানাড়ার বীর্যদান করেনি। পারিবারিক নিত্যতার তুচ্ছ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিকের মধ্যেই স্বাভাবিক স্থিতি দিয়েছে। এমনকি অগ্নিপরীক্ষার মাহাত্ম্যাদিও যেন তার পক্ষে অতিকথন, রূপকথার কল্পরাজ্যের কাহিনী বলেই প্রতিভাত। তবে শ্রীমন্তের প্রতি বাৎসল্যে সে বাঙালি নারীর পরিপূর্ণ মর্যাদা নিয়েই আত্মস্থ। খুল্লনায় তাই বিশিষ্টতা নেই কিন্তু প্রাণরসেরও হানি ঘটেনি কোথাও।

লহনার বিশিষ্টতা তার অপগত যৌবন এবং সন্তানহীন একাকীত্বের গোপন জ্বালাময় বেদনার অনুভবে। লহনার ব্যবহার যতটা প্রমাণ করে অতটা নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রগত নয়। কিন্তু আপন যৌবনলাবণ্যের অবসানেই স্বামী কর্তৃক অন্য পত্নী গ্রহণের অপমান তার অন্তর-চেতনায় যে বিষ-জ্বালার সঞ্চয় ঘটিয়েছিল তারই ফলে খুল্লনা নির্যাতিত। কিন্তু এই নির্যাতনই একমাত্র সত্য নয়। নির্যাতনের পরে সাদর অভ্যর্থনা কেবলই কপটতা নয়; চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের অলৌকিকতার কথা বাদ দিলে, এর গভীরে লহনা-চিত্তের কোন সমর্থনই ছিল না এমন মনে হয় না। লক্ষণীয় পুত্রবতী খুল্লনার বাৎসল্য-উৎসবে দুর্বলার প্রবেশ ঘটেছিল, লহনা সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, অথচ সপত্নীপুত্রের প্রতি চিরাচরিত বিদ্বেষ তার ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি। পুত্রবতীর প্রতি বন্ধ্যা সপত্নীর আক্রোশে সে খুল্লনার প্রতি ক্রুদ্ধ ও বক্র কটাক্ষপাতে কার্পণ্য করে নি। স্নেহবুভুক্ষু এই সন্তানহীনা মাতার একটু গোপন স্নেহের ইঙ্গিত করলে কবির এই চরিত্র-চিত্র সবিশেষ অভিনবত্ব পেত।

ধনপতি সদাগর নামেই সদাগর। চাঁদসদাগরের জ্ঞাতি হবার উপযুক্ত চরিত্র-বীর্য তাতে অনুপস্থিত। তার চরিত্রের মূল উপকরণের সঙ্গে চাঁদ চরিত্রের অনুকরণ-জাত কিছু লক্ষণের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে, কিন্তু এ মিশ্রণ অদ্বয় হয়ে ওঠেনি। ধনপতির চরিত্রগত শৈথিল্য ও লঘু ইন্দ্রিয়পরতা নানা ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে আছে। এর সঙ্গে চাঁদের বজ্রকঠিন বীর্য ও দৃঢ়তার সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়।

গৃহে বন্ধ্যা স্ত্রী লহনার যৌবন প্রায় অপগত। তাই প্রথম দর্শনমাত্র খুল্লনার প্রতি প্রণয় নিবেদনে সে দ্বিধামাত্র করেনি। এবং নানাভাবে লহনার সম্মতি আদায়ও, করে নিয়েছে। নববিবাহের পরে কর্তব্য কর্মে অবহেলা প্রদর্শন, গৌড়ে রাজকার্যে যেতে আপত্তি, লহনার গুরুতর অপরাধ সত্বেও তাকে কোনরূপ শাস্তি দিতে অসামর্থ্য, অর্থ দিয়ে খুল্লনার পরীক্ষা বন্ধের চেষ্টা সব কিছুই ধনপতির চিত্ত-তারল্যের পরিচয় বহন করে।

ধনপতি অকস্মাৎ নারীদেবতার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করেছিল চাঁদসদাগরেরই অনুসরণে, কিন্তু তার চরিত্রের মধ্যে এর ক্ষীণমাত্র পূর্বাভাস চোখে পড়েনি। তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ ঘটনা সুসঙ্গতও নয়।

৫. ৬. ভারতচন্দ্র / অন্নদামঙ্গল

প্রথম প্রস্তাব [লেখা ১৯৫৩ সাল]

এক

আঠারো শতকের মাঝামাঝি। বর্গীর হাঙ্গামার শেষ রেশটুকু বাতাস থেকে তখনও মিলিয়ে যায়নি। পলাশীর যুদ্ধের ভূমিকা তখন তৈরি হচ্ছে আলীনগর কলকাতায় আর রাজধানী মুর্শিদাবাদে। রাজসভায় প্রবেশ করলেন ভারতচন্দ্র—হাতে সদ্যসমাপ্ত কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর'। কৃষ্ণনগরের গাছের আড়াল আবডাল থেকে সেদিন মুহুর্মুহুঃ

কোকিলের বসন্ত-কূজন ভেসে আসছিল কিনা জানা যায় না, জানা যায় না সেদিন রাজপথের পাশে অজস্র অশোকপুঞ্জ যৌবনরাগে জলে উঠেছিল কিনা। কিন্তু এটা বোঝা যায় যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন গোপাল ভাঁড়ের রসিকতায় মশগুল। তাঁর সরস বাক্যবাণে শতচ্ছিন্ন রাজসভা ফেটে পড়ছে অটহাস্যে। অন্যমনস্কভাবেই হাত বাড়িয়ে কাব্যগ্রন্থটি গ্রহণ করলেন কৃষ্ণচন্দ্র, কবির দিকে তাকালেন একবার, ঈষৎ হেলল মহারাজের কিরীট-খচিত মস্তক—নির্ভুল স্বীকৃতির চিহ্ন। তারপর গোপালের সর্বশেষ মন্তব্যের কী একটা জবাব দিতে গিয়ে ঠিক তেমনি অন্যমনস্কতার সঙ্গে কাব্য-খানি সরিয়ে রাখলেন তাঁর আসনের একপাশে।

—মহারাজ, করছেন কি? সব রস যে গড়িয়ে গেল! চমকে উঠলেন কৃষ্ণচন্দ্র। গোপালের রসিকতা মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। কবির কণ্ঠ যেন খানিকটা গলানো আর্তনাদ। তাঁর ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গ হাসির বাঁকা রেখাটুকু কেউ দেখতে পেল কিনা জানি না। সে হাসিতে কি বেদনা ছিল?

ক্ষণিক স্তব্ধতা। তারপর আবার অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মহারাজ, 'গোপাল, কবি আজ তোমাকেও হারিয়ে দিল।' ভারত দাঁড়িয়ে রইলেন।

'বিদ্যাসুন্দর' রচনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমনি একটা কিংবদন্তি; যা হয়ত সত্য নয়, কিন্তু সত্য তার হওয়া উচিত ছিল।

এই-ই কবি ভারতচন্দ্র; তাঁর কাব্য অন্নদামঙ্গল,—আর তাঁর পরিবেশ বেদনা-বিদীর্ণ বাংলাদেশ। বর্তমান আলোচনার সংকীর্ণ পরিসরে এই কথাটাই একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

দুই

আর্য-সমালোচনায় এ ভঙ্গি হয়ত অচল, কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছত্রে ছত্রে ভারতের যে কবি-ব্যক্তিত্ব আমার চোখের সামনে জীবন্ত তাকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করতে আমি পারি না।

প্রাচীন আর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র আয়োজনের মধ্যে এই-ই সবে কবি-ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হবার চেষ্টায় আর্ত হয়ে উঠেছে; এমনকি মুকুন্দরামের মতো প্রতিভাবান কবির কাব্যেও যে কবি-মানুষের এই পরিচয়—ব্যক্তি-পরিচয় মেলে না, এ-প্রত্যয় বোধহয় নিঃসন্দেহ। বিজয় গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গলে আরাধ্যা দেবীর বন্দনা করতে গিয়ে যে কথাটি বলেছেন, সমগ্র প্রাচীন আর মধ্যযুগের বাঙালি কবিকুলের তা অন্তরের বিশ্বাস :

আমি বটি যন্ত্র মাগো যন্ত্রী বট তুমি।/ যা বলে বাজাও যন্ত্র তা বলিব আমি॥

এ কেবলই মামুলী দেবী-বন্দনার কথা নয়, কবি-ব্যক্তিত্বের বিলোপসাধনের কথা। আর কেবল সচেতনভাবে আপন কবি-শক্তিতে বিশ্বাস করবার ব্যাপারেই এই দ্বিধা আর অস্বীকৃতি নয়, এই দ্বন্দ্ব তাদের সৃষ্টিকর্মের অন্তরে অন্তরে অনুস্যূত। বিজয় গুপ্তের

মনসার ভাসান, কবিকঙ্কণের চণ্ডী কিম্বা ঘনরামের ধর্মমঙ্গল—কাব্য হিসেবে এদের দোষ-গুণ যাই থাক না কেন, এদের মধ্যে কি এদের স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায়? খুঁজে পাওয়া যায় কি কৃত্তিবাসকে আর কাশীরাম দাসকে তাঁদের বহুখ্যাত সুবিস্তৃত কাব্যের মধ্যে?

এ জিনিসটা নতুন যুগের সাহিত্য-ধর্ম। প্রাচীন আর মধ্যযুগের সাহিত্যের সঙ্গে এখানেই আধুনিক সাহিত্যের মূল পার্থক্য। মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল রাবণ চরিত্রেই মধুসূদনের আত্মপ্রতিফলন ঘটেনি, সমগ্র কাব্যবস্তু আর কাব্যকলায় সেই বিরাট মানুষটি তরুণ গরুড়-সম মূর্ত হয়ে আছেন। কেবল মধুসূদনের নয়, কাব্যকর্মে কবি-ব্যক্তিত্বের এই স্ফুরণের উদাহরণ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সারা ইতিহাসটা জুড়েই ছড়িয়ে আছে।

নবযুগের অব্যবহিত আগের পর্বে পুরনো এক কবির কাব্যে এর প্রকাশ বিস্ময়কর। সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে যেন এক বিরাট কবিপ্রাণ রাজসভার আদর্শে আপন মানস-সৃষ্টিকে আপনিই খণ্ডিত করেছে, বিচ্ছিন্ন করেছে, বিকৃত করেছে। এ খণ্ডন, এ বিকৃতি কবির সচেতন মন করেনি, বিশেষ পরিবেশে বিশেষ যুগপ্রেক্ষিতে এ ঘটনার সূত্রধারণ করেছে তাঁর ব্যক্তিসত্তার সমগ্র গভীরতা—আর এই আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ঘটেছে তাঁর সিনিসিজমে; কবি ভারতের ঠোঁটের ঐ বিকৃত হাসি, কণ্ঠের ঐ তীব্র আর্তনাদ আর বিদ্যাসুন্দরের গড়িয়ে যাওয়া আদিরসের স্রোতে কবির বেদনার্ত-রসিকতা প্রত্যক্ষ হয়ে আছে অন্নদামঙ্গল কাব্যে।

তাই সাহিত্য-বিচারের কোন আদালতে ভারতচন্দ্রকে বেত্রাঘাতের সুপারিশ যেমন অবান্তর, তেমনি তাঁকে যুগ-স্রষ্টা বলে আত্মশ্লাঘার প্রকাশটাও নেহাৎই অন্ধ-ভক্তির গদগদ-ভাষণ।

কবির কবি-জীবন আলোচনায় বসে তাঁকে ভালো কিংবা মন্দ নিঃসংশয়ে একটা কিছু চূড়ান্ত রায় দেবার জিদটা ছাড়া চাই অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক স্তরে প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার যে বেণীবন্ধন রচিত হয়েছে তার দিকে পিছন ফিরে কোন যান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা বা মেনে নেওয়াকে অস্বীকার করতে হবে, কেননা তা অনৈতিহাসিক। আর সাহিত্য বা সাহিত্য-সমালোচনা কোনটাই কলে তৈরি হয় না।

তিন

'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'—অন্নদামঙ্গল। রাষ্ট্রনৈতিক সংকট-সংঘর্ষ ও বিপ্লব-মুখী অবস্থায় নিছক কাব্য-সৌন্দর্যের দেবালয়েও আগুন লেগেছে। একে কবি-চেতনার অর্ধস্ফুট বাক্য হিসেবে গ্রহণ করাই সংগত। তবে এই চেতনাকে আধুনিক কবির উচ্চকণ্ঠ ও সচেতন ঘোষণার সঙ্গে এক করে দেখলে ভুল হবে:

I come down
From the burning roof
All over the burning town.— লুই আরাগঁ।

ভারতচন্দ্রের এ-চেতনা মিশ্র ও পরোক্ষ—তবে রামপ্রসাদের মতো আত্মকেন্দ্রিকতায় তা নিঃশেষিত নয়।

বর্গীর আক্রমণের বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই—তা আজ ইতিহাসগত হয়েছে। চার চারবার তাদের অত্যাচারের নৃশংসতা পশ্চিম বাংলার একটা বৃহৎ অংশকে কেমন করে শ্মশানে পরিণত করে তা সর্বজনবিদিত। আর মুর্শিদাবাদের রাজতক্ত নিয়ে গুপ্তহত্যা, রক্তপাত আর রাষ্ট্রবিপ্লব তো ছিলই, ছিল বিদেশি বেনিয়াদের সঙ্গে সংঘর্ষ, ছিল রাত্রের অন্ধকারে ষড়যন্ত্রের ফেনিল হলাহল।

গ্রামীণ বাংলার সমাজে ভাঙন ধরেছে, বাংলার বাণিজ্য আর শিল্প পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, অর্থনীতির মূল কাঠামোর আর শ্রেণীবিন্যাসে সংকটটা তখন পৌঁছেছে চরমে। রাজনীতি আর অর্থনীতিতে একটা মৌল পরিবর্তন অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনায় থর থর করে কাঁপছে। আর ইংরেজ-বিজয়ের পূর্বমুহূর্তের বাংলা দেশের ঐতিহাসিক নিয়তি সেই আগমন-সম্ভাবনাকে নীলকণ্ঠের বেদনায় ধারণ করেছে।

পুরনো মূল্যবোধের ভিত্তি ভঙ্গুর, ধর্মের একাধিপত্য আজ অপচিত, নীতিবোধ এবং জীবনের গভীর অনুধ্যান অবসিত।

প্রাচীনের বিদায়-বেদনা আর নতুনের গর্ভযন্ত্রণার এই মুহূর্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সমাজ, শিল্প-সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সম্পদ। ধ্বংসই এর প্রত্যক্ষ রূপ, নতুন সৃষ্টির ভ্রূণ কোথায় তা জানা যায় না। সে যুগের রাষ্ট্রবিদেরা তা জানেন নি, সে যুগের কবিদের চোখে এর সমগ্র পরিচয় নেই; তাই রামপ্রসাদের শাক্তপদের আত্মকেন্দ্রিক ষড়রিপুদমনে, কিংবা তাঁর বিদ্যাসুন্দরের নগ্ন রিরংসায়, দ্বিজ ভবানীর রামায়ণের অনাবশ্যক অশ্লীলতায়, জগৎরাম আর রঘুনন্দনের আন্তরিকতাহীন কারুকর্মে —এই যুগপ্রবৃত্তির খণ্ডিত-প্রকাশ।

কিন্তু একমাত্র ভারতচন্দ্রই এই আংশিকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর একক কবি-দৃষ্টিই সে যুগের ধ্বংসের সর্বব্যাপকতা, মূল্যমানের মৌল পরিবর্তন-সূচনা ও অনাগত সৃষ্টি-ভ্রূণের সম্ভাবনাকে বিদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই কবিচেতনা ও দৈনন্দিন জীবন-চেতনার সুস্পষ্ট চিন্তা যে আদৌ সমন্বিত হয়নি, তাও অবশ্য মনে রাখার।

ভারতচন্দ্রের কবি-ব্যক্তিত্বে এরই প্রকাশ।

চার

ভারতচন্দ্র সভাকবি।

এ কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়। এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী, কবি-কল্পনা আর

কলাকৌশলের অনেক পশ্চাৎভূমির সত্য ঐ একটি ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। পণ্ডিত সমালোচকদের মহলে 'সাহিত্য কাদের জন্য ?'—এ প্রশ্নটা যেমন পবিত্র সাহিত্য-সূত্র হিসেবে আপত্তিকর, তেমনি বাইরে থেকে আরোপিত রাজনৈতিক প্রচার-কৌশলের একটা অঙ্গ—তাই পরিত্যাজ্য। কিন্তু এই জিদটা ছেড়ে দিলেই দেখা যাবে যে সমগ্র কবি-মানসের পরিণতি-সংঘটনে আর তাঁর সৃষ্টির মূল রস প্রেরণায় ও প্রকাশভঙ্গির চারুত্ব-সম্পাদনে এটা একটা মৌল প্রশ্ন। আদি ও মধ্যযুগে আমাদের দেশে সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে যেসব প্রেরণা-ভিত্তি ছিল সেগুলি হয়,—মসনদ, মন্দির, মঠ, মাঠ ও মেয়ে-মহল—অর্থাৎ রাজসভা [মসনদ], ধর্ম-সংস্থা [মঠ ও মন্দির] আর জনসাধারণ [মাঠ ও মেয়েমহল]। অবশ্য আমাদের সাহিত্য বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরেই যে এদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখাগুলি প্রাচীরের মতো অলঙ্ঘনীয় ছিল তেমনটি মনে না করাই ঠিক। বহুস্থানেই তাদের একাধিক প্রেরণা-ভিত্তি কাছাকাছি এসেছে আবার ক্বচিৎ বা একেবারে সমন্বিতই হয়েছে। সাহিত্যের চরিত্রে এই ঘটনাটির প্রতিফলন যে বাইরে থেকে আরোপিত মাত্র নয়, তার মূল থেকে উৎসারিত —এ কথা উদাহরণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত না করলেও আজ আর অপ্রমাণিত থাকবে না।

'কাদের জন্য লিখি ?'—এ প্রশ্নটার সঙ্গে তাই জড়িয়ে আছে প্রেরণাভিত্তির কথা, কবি-চিত্তের শ্রেণী-আসক্তির কথা। ব্যাপারটি জটিল আর কবি মনের গভীরতম স্তরে কখনও জানায় কখনও না-জানায় এর প্রক্রিয়া চলে—তাই সহজ করে সোজা কথায় বলতে দ্বিধা জন্মাতে পারে, কিন্তু কথাটা বহু-পরীক্ষিত সত্য।

ভারতচন্দ্র সভাকবি। একথা বললেই এমনি অনেকগুলি প্রশ্ন উত্তর দাবি করে, আর না বললে একটা প্রধান জিজ্ঞাসাই অনুচ্চারিত থেকে যায়।

কৃষ্ণনগরের রাজসভা আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা দেশের একটা বড় জমিদারি দরবার। এর খুঁটিনাটি না হলেও মর্মগত প্রেরণার পরিচয় দরকার। উনিশ শতকের নতুন ইংরেজি কানুন চালু হবার আগে বাংলাদেশের রাজা-প্রজার সম্বন্ধটি ছিল একটু অভিনব। শোষণের ব্যবস্থায় ফাঁক ছিল না ঠিকই, কিন্তু সীমারেখাটি নিশ্ছিদ্র বেড়াজাল হয়ে পড়েনি। রাজসভার বাইরে আর ভেতরে যাতায়াতের পথ তাই রুদ্ধ ছিল না একেবারে। কৃত্তিবাসের রাজসভার কাব্য তাই জনজীবন থেকে গ্রহণে যেমন সমৃদ্ধ, জনজীবনের অন্তরে, আনন্দলোকে তেমনি তার প্রতিষ্ঠা। আঠারো শতক থেকেই রাজা-প্রজার এ সম্বন্ধে ফাটল ধরতে থাকে, আর সেই ফাটলে কুড়ুল চালিয়ে একে দু-ভাগ করে দেয় বিদেশি সরকার। কৃষ্ণনগরের এই নতুন রাজসভা জনজীবন থেকে বহুদূরে—একদিকে ক্ষীয়মাণ মোগল-দরবারী বিলাস-ব্যসনের কৃত্রিম অনুকরণে, আর অপরদিকে গতানুগতিক শাক্ত-বৈষ্ণব-দ্বন্দ্বের মিথ্যা শাস্ত্রীয় আস্ফালনে এ দূরত্ব দুর্লঙ্ঘ্য-প্রায়। ভারতচন্দ্রের কাব্য-গঠনের এই পরিবেশ কেবলমাত্র প্রভাব হিসেবেই দেখা দেয় নি, তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বকে তৈরি করেছে।

অন্নদামঙ্গলের শিব-পার্বতী কাহিনী তো বাংলার মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে থাকা গল্প থেকে মঙ্গলকাব্যের সূত্র ধরে বাংলা কাব্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভা এই বহু-প্রচলিত ধারায় যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধন করেছে তা গবেষণা করে আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে না। দরিদ্র দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ শিব-পার্বতীর কাহিনী তার জীবন-মাধুর্য হারিয়েছে অনেক পরিমাণে শাক্ত আর বৈষ্ণব মতের দ্বন্দ্বে; তন্ত্রের আস্ফালনকে সাহিত্যভাত করতে গিয়ে কবি-প্রাণের অনেকটা অপচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসুন্দরের বিশেষ রসধারায় রাজসভার বিশেষ দাবি মিটেছে। অবশ্য রাজসভার রুচি দাবি করল আর কবি তা মিটিয়ে ফেলতে কাব্য রচনা করে বসলেন—ব্যাপারটি ঠিক এমনি করে ঘটেনি, ঘটে না। তাহলে এ-কাব্য একটা সস্তা ফরমায়েসি বস্তুতে পরিণত হত। কবির মর্মগত-বেদনা ধরা পড়ত না এখানে। ঐ দাবি আর তা মেটাবার প্রবৃত্তি এই দুটোই যে ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এটা বুঝে নিতে হবে।

তৃতীয়ত, ভারতচন্দ্রের সিনিক চটুল ও পরিহাসপ্রবণ—বলা যায় ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ছড়িয়ে আছে সমগ্র কাব্যটির পরিকল্পনায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে আর গঠন-নৈপুণ্যে। এর সঙ্গে সে যুগের রাজসভার প্রতিবেশের সম্পর্কটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

চতুর্থত, প্রকাশ-ভঙ্গির নাগর-বৈদগ্ধ্য, মার্জিত-নৈপুণ্য, সংস্কৃত শিল্পকলাকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করার মধ্য দিয়ে একটি ব্যক্তিক কবি-ভাষার সৃষ্টি—এ তো রাজকবির পক্ষেই সম্ভব। ভারতচন্দ্রের এই ভাষা-সৌধকে তাঁর সমগ্র প্রতিভা থেকে পৃথক করে দেখাটা কিছু নয়। এ-পর্বের অন্যান্য ভারত-অনুকারকদের রচনায় এ বৈশিষ্ট্যটি সমগ্র কবি-ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক—কেননা তা আরোপিত, কিন্তু ভারতচন্দ্রে আপন কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই এর উৎসারণ।

এ-গুলিকে যেভাবে পৃথক করে দেখালাম, আসলে অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় কিন্তু তা পৃথক হয়ে নেই; এসব মিলেই ভারতের কবিত্ব—অন্তত তার একটা প্রধান দিক আর এর পশ্চাৎপটে গোপাল ভাঁড়ের অট্টহাস্যের সরব-ঘোষণা আর বিলাস-কলার নূপুর-নিক্কণ।

পাঁচ

জয়দেব সম্বন্ধে একটি সনেটে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন :

> ললিত লবঙ্গলতা দুলায় পবনে; / বর্ণে গন্ধে মাখামাখি বসন্তে অনঙ্গে। / নূপুর-ঝঙ্কারে আর গীতের তরঙ্গে, / ইন্দ্রিয় অবশ হয় তব কুঞ্জবনে॥ / উন্মদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে, / রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে। / রণক্ষত চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে, / পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে॥ / পাণির চাতুরী হল নীবীর মোচন। / বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন॥ / আদিরসে দেশ ভাসে

অজয়ে জোয়ার। / ডাকো কল্কি ম্লেচ্ছ আসে করে করবাল, / ধূমকেতু কেতু সম উজ্জ্বল করাল, / বঙ্গভূমি পদে দলে তুরস্ক সোয়ার !

মুসলমান-সৈন্যের বঙ্গ বিজয় আর জয়দেবের আদিরসাত্মক কান্ত-কোমল পদাবলীর মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কারকে নিশ্চয়ই কেউ বীরবলী রসিকতা বলে উড়িয়ে দেবেন না। দেশবিদেশের ইতিহাসের একটি গূঢ় তাৎপর্য কাব্যরূপে বিধৃত এখানে।

মুসলমান জয় আর ইংরেজ বিজয়; ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নেই, কিন্তু পুরনোর নবরূপে আসা-যাওয়া আছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যালোচনায় সব চাইতে চাঞ্চল্য এসেছে এই আদিরসের প্রশ্নে। কেউ কেউ নৈতিকতার আদালতে তাঁকে বেত্রাঘাতের রায় দিয়েছেন—তা আগেই বলেছি। কেউ কেউ আবার এই সমালোচনাকে কিছুটা খৃষ্টীয় মোরালিটি-প্রবর্তিত রুচিবাগীশতা নাম দিয়ে অশ্লীলতাকে শ্লীল বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আবার অনেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় অশ্লীলতার নিদর্শন-প্রাচুর্য দেখিয়ে সাফাই গেয়েছেন। ব্যাপারটি জরুরী—আলোচনা-বিতর্কের বহু ধারায় তাই প্রমাণিত হচ্ছে। তবে কবি-কৃতিত্বের বিচারে বসে অমন রায় দেবার প্রবৃত্তিটা না ছাড়লে নয়।

শ্লীল বা অশ্লীল, রুচি বা নীতির তত্ত্বমূলক আলাপ নিয়ে আমরা ব্যস্ত নই; আর ওসব ব্যাপারের কোন সর্বসম্মত মাপকাঠি দাঁড় করানো গিয়েছে কিনা তাও জানা নেই, তবে বাংলা সাহিত্যের ধারার নিদর্শন তুলে এটা প্রমাণ করা চলে না যে ভারতচন্দ্র নরনারীর যৌন সম্বন্ধের একটা সুস্থ স্বাভাবিক ছবি এঁকেছেন। নরনারীর দেহ-মিলন বাংলা কাব্যে একটা দুর্লভ বস্তু নয় ঠিকই, কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার যা চিত্র তা জীবনের সর্বব্যাপকতায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অপরিহার্য। অপরপক্ষে ভারতচন্দ্র বিদ্যা ও সুন্দরের মিলনের যে চিত্র এঁকেছেন তার বাকভঙ্গিতে, তার বিপরীত বিহারে কী এক রিরংসার ভাব ফুটে ওঠেনি? শ্লীলতার বিচার না করেই বলা যায় যে যৌন-সম্বন্ধের এ চিত্র বাংলা কাব্যের ধারায় ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত হয়ে আসেনি। বর্তমান কাব্যে এ একেবারে অপরিহার্য ছিল। এ প্রবৃত্তিটা যুগের। রামপ্রসাদের বিদ্যা-সুন্দরে, দ্বিজভবানীর অনুবাদ রামায়ণে, জীবন মৈত্রের মনসার ভাসানে এবং ও-যুগের বহু বাংলা কাব্যে এর প্রমাণ স্পষ্ট—ভারতচন্দ্রে তারই শিল্প-কৌশলের চরম স্ফূর্তি পেয়েছে।

একটা সঠিক ধ্বংসের মুখে দাঁড়ানো-জীবনে, সর্বক্ষেত্রের ব্যাপক মূল্য পরিবর্তনের মধ্যে এমনি একটা প্রবণতা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে রাজসভার ক্ষীয়মাণ মোগলাই বিলাস-ব্যসন ভারতচন্দ্রে এই মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় তারই ব্যঞ্জনা॥

চার

ভারতচন্দ্রের কাব্যের আরাধ্যা দেবীটি হলেন অন্নদা। এ রূপ-কল্পনার তাৎপর্য বোঝার

জন্য দুটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করব। বর্গীর তাণ্ডবে গঙ্গার পশ্চিম দিকের চাষীরা জোত-জমি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়, ফলে বহুশত বিঘা জমিতে ফলন বছরের পর বছর বন্ধ থাকে। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনিয়ে আসে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একটা বিস্ময়কর কৃতিত্ব। ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছেন এত অল্প সময়ে কি করে তিনি নবাব সরকারের দেনার বিরাট অঙ্কটা পরিশোধ করে আপন রাজকোষও পূর্ণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের বিস্ময়ের কোন কারণ নেই ; প্রজাদের কাছ থেকে রাজা-জমিদারদের আদায়ের ইতিহাসটা তাঁরা জানেন না এমন নয় ; আর এ-ঘটনা কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যেই ঘটেনি ঘটেছে সারা দেশ জুড়ে। বর্গীর আক্রমণে হৃত-সর্বস্ব নবাব সরকার জমিদারদের উপরে যে বোঝা চাপিয়ে দিলেন কি করে জমিদারদের সেই সঙ্কট প্রজাদের ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসে তা সহজেই অনুমেয়।

কাজেই অন্নের জন্য হাহাকার সারা দেশ জুড়ে না হোক, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে বেদনা-বিদীর্ণ কাহিনীর জন্ম দিয়েছিল, রাজসভার কবি তা ধরে রেখেছেন তাঁর কাব্যে। শিবের 'হা অন্ন হা অন্ন' বলে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনীর প্রেরণায় যে অন্য কিছু নেই তা বলা যায় জোর দিয়ে। অন্নদা-পরিকল্পনার উদ্ভবও ওখানেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই দেবীটির এখানেই আবির্ভাব ঘটল।

ভারতচন্দ্রের দুটি পঙ্‌ক্তির কথা বলি :

অন্নপূর্ণা যার ঘরে / সে কাঁদে অন্নের তরে / এ বড় মায়ার পরমাদ।

এই উক্তিতে শিবরূপী বাংলার কৃষক জনতার সত্যকার পরিচয় আছে, অন্নস্রষ্টার অন্নাভাবের বেদনা আছে, পৌরাণিক কাহিনীর পাতলা আবরণে সে সত্য ঢাকা পড়ে না। আর :

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট মানুষের এই জীবন-প্রার্থনা সে-যুগের কবির কাব্যে যে এমন অপূর্ব সুরে বেজেছে তা বিস্ময়কর ও শ্রদ্ধার যোগ্য। এই পঙ্‌ক্তির বিদ্যুৎ-আলোয় চকিতে ভারত-কবির যে মূর্তি চোখে পড়ে তা রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত চূড়াকে অতিক্রম করে উঁচু হয়ে আছে, ব্যথার সমুদ্র থেকে তাঁর সদ্যোত্থিত হস্ত স্বর্গের আশ্বাসের দিকে প্রসারিত, মুখে অক্ষয় কবি-বাণী :

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

জীবনের প্রতি এই শ্রদ্ধা—মানুষের এই মূল্যবোধ, আদি আর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মের আবরণ ঠেলে দেখা দিতে পারেনি। মানবতা সেখানে মনসার পায়ে বাম হস্তে হলেও দুটো পুজোর ফুল ফেলে দিয়েছে। মানবতার এই জাড্য মোচিত হল আমাদের নবযুগের কাব্যে। কিন্তু নবযুগে পাশ্চাত্যপ্রভাব সম্ভাবিত হবার আগেই জাতির অন্তরে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল ভারতচন্দ্রে তার তাপমাত্রা পড়া যেতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে বর্ধিত জাতীয় রেনেসাঁর মহা মহীরুহের ভ্রূণরূপে ভারতচন্দ্রের মানবতাকে হয়ত অনেকে দেখতে চাইবেন না, এর মাঝখানে একটি

বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পার্থক্য স্বীকার করেও। কিন্তু এদেশ ইংরেজ বিজয় না হলেও জাতির জীবন-বিবর্তনের অনিবার্য ফল হিসেবে যে রেনেসাঁ ঘটত তার একটা অস্পষ্ট পূর্ব ইঙ্গিত যে ভারতচন্দ্রের মানবতাবোধে প্রকাশিত এটা মনে করা চলে। এই মানবতা প্রকাশিত দেবদেবীর মানবীকরণের যে প্রক্রিয়া বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে চলে আসছে তার সম্পূর্ণায়নে এবং ধর্মের প্রভাবকে কাব্যের অন্তর থেকে সরিয়ে এনে পটভূমিকায় দাঁড় করানোয়।

সাত

অন্নদামঙ্গলের কাহিনীতে প্রেমের তিনটি রূপকে পাশাপাশি তুলে ধরেছেন কবি—শিব দুর্গা, বিদ্যা-সুন্দর এবং দুই স্ত্রীসহ ভবানন্দ মজুমদারের চিত্রে। সহজেই বোঝা যায় কবি-প্রাণের উল্লাস নির্বাধ হয়ে উঠেছে বিদ্যা ও সুন্দরের মুক্ত প্রেমের বর্ণনায়। গান্ধর্ব বিবাহের ব্যাপারটা কেবলই সমাজকে চোখঠারা, কেবল 'হেসে হেসে সমাজ-সৌধের ভিতে সুড়ঙ্গ' কাটার বাইরের আবরণ।

তরুণীর বৃদ্ধ স্বামী কিন্তু তাঁর প্রাণের সমর্থন পায়নি! এমনকি দেবাদিদেব হয়েও কবির ব্যঙ্গের হাত থেকে রেহাই পান নি শিব। বুভুক্ষু মানুষের বেদনা কবির কাব্যে ভাষা পেলেও দারিদ্র্যকে তিনি কখনও শ্রদ্ধা দেখাননি। এর নাম দেওয়া যেতে পারে ভারতের ঐশ্বর্যবাদ। জীবনের যা-কিছু পার্থিব মাধুর্য দু'হাতে আকণ্ঠ পান করতে চেয়েছেন কবি,—উর্বশীকে আলিঙ্গন করেছেন ডান হাতের সুধা-পাত্রের লোভে, বামহাতের বিষভাণ্ড দেখে ভয়ে পিছিয়ে যাননি। এই বিষামৃতের সমন্বিত জ্বালা ও মাধুর্যের আস্বাদন-ক্ষমতাকে বিসর্জন দিলে ভারতচন্দ্রকে চেনা যাবে না।

ঐশ্বর্যের কবি ভারতচন্দ্র বৃদ্ধ ও দরিদ্র উমাপতিকে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণাস্ত্রে বিদ্ধ করলেও, সতীর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেমের যে ঐশ্বর্য-মূর্তি তিনি দেখলেন তার সামনে বার্ধক্য-চিন্তা আর দারিদ্র্য-বিতৃষ্ণা লোপ পেল—বেদনাহত শিবের সে রুদ্র-বিরহী মূর্তি কবির সমগ্র চেতনাকে নাড়া দিল,—তাই অগ্নিগিরির লাভাস্রোতের মতো কাব্যস্রোত মুক্তি পেল তাঁর লেখনীতে :

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। / ববম্বম্ ববম্বম্ শিঙা ঘোর বাজে॥

কিন্তু একাধিক বিবাহের জীবন স্পষ্টত তাঁর কাছে ধিক্কৃত হয়েছে। ভবানন্দ মজুমদারকে নিয়ে তাঁর দুই স্ত্রীর কদর্য কোন্দল আর ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস নির্ভুল তুলিকায় এঁকেছেন কবি। তাঁর ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ সুরটি এখানে একেবারেই ভুল করবার নয়। আর এই বিদ্রূপই তীব্রতম হয়ে উঠল যখন কাব্যকাহিনীর আবরণ ভেদ করে কবির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হল :

এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর। / দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥

সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যারম্ভে নৃপতি-বন্দনার একটি কথা মনে পড়ে যায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

স্বয়ং চন্দ্রের চেয়েও ভাগ্যবান, কারণ তাঁর 'সিতাসিত দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়'। ভারতচন্দ্রের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের একটা তীর স্বয়ং তাঁর পোষ্টার বিরুদ্ধে উদ্যত।

কিন্তু তাঁর তূণে সঞ্চিত অপর তীরগুলি কেবল লক্ষ্যভ্রষ্টই হয়নি, অপচিত হয়েছে— তাঁর কবি সত্তাকেই বিদ্ধ করেছে। দায়িত্বহীন ব্যঙ্গের একটা জীবন-গভীরতা-বিরোধী সুর সারা কাব্যটিকে আন্তরিকতাহীন করে তুলেছে। অনেকসময় এ-পর্যন্ত মনে হয়েছে যে এ বর্ণনা কি কেবলই কারুপ্রতিমা, না এর জীবন স্পন্দিত হচ্ছে পীনস্তনী বক্ষের অভ্যন্তরে। প্রমথ চৌধুরীর সনেটের এই জিজ্ঞাসা :

> প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করে। / আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি, / এনেছি তারার মত জ্যোতির্ময় মণি, / রত্ন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়িবার তরে।/ স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে, / পরায়েছি শ্যামশাটী মরকতে বুনি, / রক্ত-বিন্দু পারা দুটি সুলোহিত চুনি / বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে / প্রজ্জ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন, / প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ, / মুকুতা-নির্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন, / সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ / অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন,— / না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জন।

কি ভারতচন্দ্র-কবি-আত্মাকেও কোনদিন সংক্ষুব্ধ করে তুলেছিল ?

কিন্তু এই জিজ্ঞাসা থেকেও কবি ভারতচন্দ্র বড়।

প্রাক্-রেনেসাঁ বাংলার সাহিত্য-গতির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন ভারতচন্দ্র— এক চোখে তাঁর মানব-সন্তানকে দুধে-ভাতে বাঁচিয়ে রাখবার বেদনাময় আকাঙ্ক্ষা, অপর চোখে পার্থিব সব সৌন্দর্য সব ঐশ্বর্য ভোগের বহ্নিমান কামনার ধিকি ধিকি জ্বালা ; ঠোঁটের কোণে তাঁর বিদ্রূপের হাসি— বিদ্রূপ সমাজকে, নৃপতিকে—সর্বাপেক্ষা অধিক আপনাকে, আর শিল্পীর অহঙ্কারে উচ্চশির তাঁর কৃষ্ণনগর যেন—বাংলার সব রাজপ্রাসাদ থেকে উচ্চতর।

৫·৬ ভারতচন্দ্র / অন্নদামঙ্গল

দ্বিতীয় প্রস্তাব / লেখা ১৯৬৭

বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায় একজন—আজ রুচি ও রীতির যুগান্তরেও একথা প্রায় সকলেই মেনে থাকেন। পুরনো সাহিত্যে এরূপ ব্যক্তিত্ববান শিল্পী খুবই দুর্লভ, তাঁর বড়ো সমালোচকেরাও একথা বলেন। গত দুশ বছর ধরে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা এবং তীব্র ভৎর্সনা, ভাষাশিল্পের শিরোপা এবং রুচি-হীনতার ধিক্কার যুগপৎ তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। তাঁর শক্তিকেই সবাই অভিনন্দিত করেছেন, সৃষ্টিকে নয়। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। নিম্নোক্ত সূত্রগুলির মধ্য দিয়ে আমরা তার উত্তর খুঁজেছি।

এক. কবির সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

কবি ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম ভারতচন্দ্রের জীবন-কথা সংগ্রহ করে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন ১৮৫৫ সালে। একমাস পরে তা 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী গবেষকেরা এর কোন কোন তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং আলোচনা করেছেন। কিন্তু এখনও এ-বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনাই আমাদের অবলম্বন। তাঁর অনুসরণে ভারতচন্দ্রের জীবন-কথা সংক্ষেপে বিবৃত হলো।

১৭১২ সালে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো গবেষকের মতে তাঁর জন্মকাল ১৭০৫-১০ এর মধ্যে। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূরশুট পরগণার ভূস্বামী ছিলেন। বাস করতেন পেঁড়ো গ্রামে। কবি ছিলেন পিতামাতার কনিষ্ঠ পুত্র। বর্ধমানরাজের সঙ্গে বিবাদ করে নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর অধিকার হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। তাই বাল্যকালে একদা-ধনী পিতার পুত্র ভারত মামাদের আশ্রয়ে বড় হন। প্রথমে তিনি মন দিলেন সংস্কৃতবিদ্যাচর্চায়। কিছুকালের মধ্যে পারদর্শীও হয়ে উঠলেন। কিন্তু তখনকার অর্থকরী বিদ্যা ছিল পার্সি, সংস্কৃত নয়। ভারত পার্সি না শিখে সংস্কৃত শেখায়, বাবা-দাদারা সবাই খুব রেগে গেলেন। তাঁদের বিরক্তির আরও একটি কারণ ছিল—বাড়ির অনুমতি না নিয়েই মামারবাড়ির পাশের গ্রামে বিয়ে করা। এই অবস্থায় ভারত মামাবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন দেবানন্দপুরে। প্রথমে উঠলেন এক আত্মীয় হীরারাম রায়ের কাছে। পরে আশ্রয় জুটল পার্সিনবীশ রামচন্দ্র মুনসীর বাড়িতে। পার্সি শিক্ষা হলো ভালোভাবেই। দেবানন্দপুরে বাসকালেই তাঁর প্রথম কাব্যরচনা—'সত্যপীরের ব্রতকথা'। কবি নিজের লেখাপড়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

> ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক। / অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক। / পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী ॥

অন্যত্র মিলেছে তাঁর একটি ঈষৎ গর্বিত উক্তি :

> পড়িয়াছি যেইমত লিখিবারে পারি। / কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥

পার্সি শিক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরে এলেন ভারত। অভিভাবকদের আর ক্ষোভের কারণ রইল না। দাদারা তাঁকে এবার পারিবারিক সম্পত্তির মোক্তার করে বর্ধমান-রাজের সভায় পাঠালেন। বাড়ি থেকে নিয়মিত সময়ে রাজকোষে খাজনা জমা না পড়ায় ভারতকে কারাগারে যেতে হলো। কতককাল কারাবাসের দুঃখ ভোগ করে, কারাধ্যক্ষের সাহায্যে গোপনে পালালেন তিনি। অনেক কষ্টে লুকিয়ে বর্ধমান থেকে বহুদূরে কটকে মারাঠাদের অধিকারে গিয়ে হাজির হলেন। এরপরে তিনি পুরীতে শঙ্করমঠে আশ্রয় নিলেন এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করতে লাগলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠ এবং ভক্তদের সংস্পর্শের ফলে তিনি ভক্ত বৈষ্ণব হয়ে উঠলেন, 'মুনি গোঁসাই

নামে পরিচিত হলেন। একদল বৈষ্ণবের সঙ্গে তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারতও যাত্রা করলেন বৃন্দাবনের দিকে। পথে পড়ল খানাকুল। তাঁর ভায়রা থাকতেন সেখানে। এক আসরে যখন এই নবীন গোঁসাইটি ভাবমগ্ন হয়ে মনোহরশাহী কীর্তন শুনছিলেন, ভায়রা এসে তাঁকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। কবির সন্ন্যাস-জীবন এখানেই শেষ হলো।

ভারত কিন্তু পিতৃগৃহে আর ফিরতে চাইলেন না। স্ত্রীকেও সেখানে পাঠালেন না। তিনি কাজকর্ম খুঁজতে লাগলেন।

প্রথমে আশ্রয় পেলেন ফরাসডাঙায় ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে। ইন্দ্রনারায়ণের মাধ্যমেই তিনি পরিচিত হলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে এবং অল্পকালের মধ্যে গুণপনা দেখিয়ে রাজার সভাসদ হয়ে উঠলেন। মাসিক বেতন হল চল্লিশ টাকা। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকাকালীন তিনি 'রসমঞ্জরী' এবং 'অন্নদামঙ্গল' ['বিদ্যাসুন্দর ' এবং 'মানসিংহ' অংশদুটি সহ] কাব্য দুটি রচনা করেন। সম্ভবত অন্নদামঙ্গল কাব্য লেখা শেষ হবার আগেই কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মূলাজোড় গ্রামটি ইজারা দেন।[১] বাড়ি তৈরির জন্য দিলেন আরও একশ টাকা। কবি গঙ্গাতীরে মনোমত বাড়ি করলেন। গৃহদেবতাদি স্থাপন করলেন। পিত্রালয় থেকে পত্নীকে আনলেন, কবির প্রথম পুত্রের জন্ম হলো। তাঁর বাবাও এসে এখানে বাস করতে লাগলেন। কিছুকাল কবির অন্নবস্ত্র বাসস্থান পারিবারিক সুখশান্তির অভাব রইল না।

কিন্তু তা অল্প দিনের জন্য। কারণ বর্গীর আক্রমণের ভয়ে বর্ধমানের রাজপরিবার মূলাজোড়ের কাছে এসে সাময়িক বসতি স্থাপন করলেন। তারা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করে গ্রামটি পত্তনি নিলেন এবং কর্মচারী রামচন্দ্র নাগকে পত্তনিদার নিযুক্ত করলেন। কবি গোড়া থেকেই এই পত্তনি দেবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রতিপালক কৃষ্ণচন্দ্রকে তিনি স্বমতে আনতে পারেন নি। পত্তনিদার রামচন্দ্র নাগ কবির উপরে নানাবিধ অত্যাচার করতে থাকেন। অতিষ্ঠ হয়ে ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' নামক এক সংস্কৃত কবিতা লিখে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে আবেদন করলেন :

'সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি।'

কৃষ্ণচন্দ্র বিপন্ন কবিকে স্বস্তি দেবার জন্য গুস্তে গ্রামে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন কিন্তু গ্রামবাসীদের অনুরোধে তাঁর যাওয়া হলো না। তিনি শেষ পর্যন্ত মূলাজোড়েই থেকে গেলেন। ১৭৬০ সালে বহুমূত্র রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

---

১ ১৭৫২ সালে অন্নদামঙ্গল লেখা হয়। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি মূলাজোড়ের বাড়িতে পত্তনিদার রামচন্দ্র নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ঐ গ্রাম পত্তনিদারের হাতে আসে বর্গীর হামলাকালে অর্থাৎ ১৭৫০ এর মধ্যে।

দুই. রচনাবলী

এক : সত্যপীরের ব্রতকথা ১নং। দেবানন্দপুরে হীরারাম রায়ের নির্দেশে রচিত।

দুই : সত্যপীরের ব্রতকথা ২ নং। দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুনশীর নির্দেশে রচিত। রচনাকাল ১৭৩৭ / ৩৮ সাল। সম্ভবত প্রথম ব্রতকথাটি আগে লেখা। তবে খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে। দ্বিতীয়টিতে তিনি পারসি শিখেছেন, এইরূপ বলা হয়েছে। মনে হয় আগে লেখা ব্রত কথাটির উপরে সম্মশেখা পারসির রঙ লাগানোই দ্বিতীয়টি রচনার উদ্দেশ্য।

তিন : অন্নদামঙ্গল। [বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ অংশ সহ]। ১৭৫২ সালে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে লেখা ।

চার : রসমঞ্জরী। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে লেখা। ঈশ্বর গুপ্তের মতে অন্নদামঙ্গলের পরে এবং অনেক আধুনিক গবেষকের মতে আগে লেখা।

পাঁচ : নাগাষ্টক। মূলাজোড়ে বাসকালে লেখা। কবিতায় বলা হয়েছে, তাঁর বয়স চল্লিশ এবং তিনি যশ লাভ করেছেন। অন্নদামঙ্গলের পরে, কিন্তু ঐ বছরই ১৭৫২ এর শেষভাগে, কিংবা ৫৩ এর প্রথম দিকে লেখা হতে পারে।

ছয় : খণ্ড কবিতাগুলি। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকাকালীন বিভিন্ন সময়ে লেখা।

সাত : গঙ্গাষ্টক। সম্ভবত মূলাজোড়ে গঙ্গাতীরে বাসকালে লেখা

আট : চণ্ডীনাটক। অসম্পূর্ণ। মূলাজোড়ে বাসের উল্লেখ আছে এবং আছে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশস্তি।

চৌরপঞ্চাশৎ ভারতচন্দ্রের রচনা নয় বলেই গবেষকদের সিদ্ধান্ত।

তিন. শিল্পী-ব্যক্তিত্ব।

শিল্পীর জীবন এবং সৃষ্টি এই দুটি প্রান্তকে সংবদ্ধ করে যে সেতুটি তাকে বলা যাক কবির অন্তর্জীবন বা শিল্পীব্যক্তিত্ব। কবির ভেতরের এই স্রষ্টামন বাইরের তথ্যঘটিত জীবনের সঙ্গে কখনও সমান্তরালে চলে, কখনও তির্যক সম্পর্কে বদ্ধ থাকে। আবার মাঝে মাঝে এরা বিপরীতমুখী হয়েও দেখা দেয় অর্থাৎ কবির বাস্তব ও প্রত্যক্ষ-জীবনের ভাবনা ও কর্ম তার অন্তর্জীবন দ্বারা প্রতিনিয়ত খণ্ডিত ও বিপর্যস্ত হতে পারে।

ভারতচন্দ্রের পূর্বোক্ত জীবনকথার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব কাজ। তবে একদিকে তাঁর জীবনের এই স্বল্পতথ্য অন্যদিকে তাঁর রচনা-বলীর আভ্যন্তর সাক্ষ্য—এদের বিশ্লেষণ করে একটা মোটারকম ছবি মাত্র দাঁড় করানো যেতে পারে।

ভারতচন্দ্রের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ ছিল। মধ্যযুগে বাঙালির অভিজ্ঞতা অতিপরিচিত সমতলে বয়ে যেত। কিছু কিছু সাময়িক হাঙ্গামা বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের স্পর্শ কোথাও কখনও লাগলেও তাতে স্থায়িত্ব বা গভীরতা থাকত না। সেকালের অধিকাংশ বাঙালি কবিই প্রথাসিদ্ধ সরলতায় প্রাত্যহিক অস্তিত্ব বজায় রেখে

চলতেন। দু-একজনের ভাগ্যে কিছু কিছু পারিবারিক অশান্তি ঘটেছে, তাতেই তাঁরা যথেষ্ট বিচলিত হয়েছেন, যেমন ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী। বিখ্যাত মুকুন্দরামের আত্মকথনে একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে গ্রাম ছেড়ে উদ্বাস্তু হবার কাহিনী মিলছে। তারপরে দীর্ঘ উত্তরজীবনের শান্তপ্রবাহ ও ধীর লয় তাঁকে পারিপার্শ্বিক ও ভাগ্যের সঙ্গে সহজ সামঞ্জস্যে, প্রথার কাছে প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পনের পথে নিয়ে গিয়েছে; তবুও প্রথমজীবনের ঐ তরঙ্গিত অভিজ্ঞতা তাঁর কবিচিত্তের অন্তরে সঞ্চিত থেকেছে, এবং কাব্যমধ্যে কোথাও বা তার কিছু প্রতিফলন ঘটেছে।

আসলে মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে যথার্থ উত্তেজিত জীবন কাটিয়েছিলেন আলাওল। সে-বিষয়ে আমি অন্যত্র লিখেছি, "প্রথমত, জীবনের বহু বিচিত্র ও উদ্দাম অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন। হার্মাদ জলদস্যুদের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে, রাজবন্দীর দুঃসহ দুর্দশা, অশ্বারোহী সৈনিকের পেশা থেকে ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, আলাওল যে-রাজসভার কবি ছিলেন এবং যেসব মন্ত্রী-সেনাপতিদের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন তাঁরা মুকুন্দরামের পোষ্টার মতো গ্রাম্য ভূস্বামী মাত্র ছিলেন না। রোসাঙ্গের রাজসভা, স্বাধীন নরপতির খাঁটি রাজসভা ছিল। রাজনৈতিক আলোচনা এবং কর্মতৎপরতাই এ-সভায় প্রধান কর্তব্যরূপে অনুশীলিত হয়। আলাওল যে সে-সব কিছু থেকে বিরত হয়ে কাব্যসাধনায় নিমগ্ন থকেতেন না এমন প্রমাণ মিলছে। সম্ভবত রাজকীয় ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে তিনি কারারুদ্ধ হন।—তৃতীয়ত, আলাওলের ধমনীতে মুসলমান ধর্মসংস্কৃতির প্রবাহ, যার পায়ের তলায় 'বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন' যার এক হাতে কোরান, অপর হাতে তরবারি—ধর্মের জন্য বিশ্বজয়ের তীব্র প্রেরণা। এই গতিবেগ, এই প্রবল বিজীগিষা ধর্মীয় বিশ্বাসের সূত্রে আলাওলের চিত্তধর্মে অনুপ্রবিষ্ট এবং শিল্পকর্মে অভিব্যক্ত। প্রধান কাব্য পদ্মাবতীর বিশিষ্টতা তাঁর ব্যক্তিত্বের পাত্র থেকে উৎসারিত। মঙ্গলকাব্যের জীবনচিত্রণে যে শিথিল পারিবার-মুখিতা, গার্হস্থ্য দৈনন্দিনের যে নিস্তরঙ্গ পারাবতবৃত্তি, যে কোমল ইন্দ্রিয়ালুতা তা থেকে আলাওল আমাদের যেন অকস্মাৎ 'শ্যেনসম ছিন্ন করে' উর্ধ্বে নিয়ে যান, প্রচণ্ডের মুখোমুখি করে দেন অতি উল্লসিত বেদুইন-বৃত্তির সঙ্গে, ক্ষণকালের জন্য পরিচয় করিয়ে দেন।'[১]

কতকটা আলাওলের সদৃশ অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্য ছিল ভারতচন্দ্রের জীবনে। কিন্তু পার্থক্যও ছিল গুরুতর। উত্তেজনা ও চড়াই-উৎরাই যথেষ্টই ছিল কিন্তু উদ্দামতা ছিল না, যদিও ছিল ব্যক্তিত্বের একটা তীক্ষ্ণ জোর। বাল্যকাল থেকেই ভারত পরিবারচ্যুত, শুধু দূরবর্তীই নয়—গৃহের মমতাবঞ্চিতও। বাবা-দাদার অমতে তাঁর সংস্কৃত পড়া এবং বিয়ে করা। শেষ পর্যন্ত তাদের ক্রোধ উপশমের জন্য পারসি শেখাও হলো। কিন্তু যাদের উপদেশে পারসি শিখলেন তাঁদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ধরা পড়ল তাঁকে বর্ধমান রাজের দরবারে মোক্তার করে সম্পত্তি তদারকির কাজে পাঠানোয়। কনিষ্ঠ ভাই বাকি

১ দ্রষ্টব্য আমার লেখা 'কবি মুকুন্দরাম' গ্রন্থ।

খাজনার দায়ে অনায়াসে জেলে যেতে পারেন, জ্যেষ্ঠেরা তখন নিরাপদ দূরত্বে নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। পারিবারিক স্নেহের এরূপ পুরস্কারই তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল।

জেল ভোগের শাস্তি [বর্ধমানে কয়েদিদের বিবিধ সাজার বিবরণ আছে 'বিদ্যাসুন্দরে] জেলপালানো [সম্ভবত মালিনী হীরাকে যেভাবে ধৃতি পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিল প্রহরী—সেরূপ কোন পন্থায়], গোপনে বর্ধমান থেকে কটক পর্যন্ত দীর্ঘপথ পেরোবার আতঙ্ক তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পুষ্ট করেছিল এবং চিত্তকে জীবন ও সংসার সম্বন্ধে বিরূপ করেছিল। জেলে অপরাধী কয়েদী ও কারারক্ষীদের সহবাস রাজসভায় [বর্ধমানে এবং পরে কৃষ্ণনগরে] সভাসদ কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয়, মারাঠি সেনা-শিবিরের সংসর্গ, পুরীতে বৈষ্ণবদের নৈকট্য তাঁকে নানাশ্রেণীর মানুষদের সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলেছে। এরা কেউ ভক্ত, তাত্ত্বিক-পণ্ডিত; অন্নদামঙ্গলের পূর্বখণ্ডের ব্যাসদেবের মতো সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব, কেউ ঘুষখোর জেলরক্ষক, কেউবা কঠোরস্বভাব বর্গীযোদ্ধা, ধ্বংসের মত্ততায় যারা, শিবের ভূতপ্রেতদের মতোই উদ্দাম, আর দুই রাজসভার প্রচুর কর্মচারী—চতুর চটুল সুবিধাবাদী চক্রান্তকারী ও খোসামুদে এরা সবাই [বিদ্যাসুন্দরে নারীদের পতিনিন্দায় রাজকর্মচারীদের ব্যঙ্গচিত্র দ্রষ্টব্য, ব্যতিক্রম সভাকবি] তাঁর মন ভরে রেখেছে, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব নামক ব্যাপারটার প্রতি শ্রদ্ধা বড়ো অবশিষ্ট থাকে নি। মারাঠি, ওড়িয়া, ফরাসডাঙার ফরাসি এবং ওলন্দাজদের [গোন্দলপাড়ায় ওলন্দাজ সরকারের দেওয়ানের আশ্রয়ে বাসকালে] সঙ্গেও তাঁর কিছু সংস্পর্শ ঘটেছিল। এবং বঙ্গদেশের বাইরে কটক থেকে পুরী পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ফলে সেকালের বৈচিত্র্যহীন বাঙালি জীবনের আদর্শে ও আদলে তাঁর বিশ্বাস ভিতর থেকে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। আবার সহজ সাধারণ প্রাণবন্ত, বিচিত্র আবেগে চঞ্চল ও অকৃত্রিম গ্রামীণ মানুষদের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের অভাবও তাঁর রচনায় প্রতিফলিত।

ভারতচন্দ্র কতকগুলি বড়োলোকের আশ্রয় ও আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান তিনজন। রামচন্দ্র মুনসী তাঁকে পারসি পড়িয়েছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁকে কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ তাঁকে দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠা, দিয়েছেন কাব্য লেখার সুযোগ, তিনিই কবিকে গৃহাদি নির্মাণ করিয়ে পারিবারিক জীবনে ফিরিয়ে আনেন। ভারতচন্দ্রও সাধ্যমত এই সব আনুকূল্যের ঋণশোধের চেষ্টা করেছেন। তিনি রামচন্দ্র মুনসীর উচ্ছ্বসিত স্তুতি করেছেন সত্যপীরের ব্রতকথায়। ইন্দ্রনারায়ণের মোসাহেবী করেছেন গোন্দলপাড়া থেকে ফরাসডাঙ্গায় নিত্য যাতায়াত করে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অমর করে রেখেছেন নানা কাব্যে বিস্তৃত প্রশংসা করে। তাছাড়া রাজার ছোটবড় সব খেয়ালে তাল দিয়েছেন, তাঁর খুশিমত কবিতা-কৌতুক রচনা করেছেন যখন তখন [তার একটা ভগ্নাংশের খোঁজ মিলেছে ঈশ্বর গুপ্তের চেষ্টায়] এমন কি রাজার পোষা ধেড়েকে

নিয়েও ছড়া বানিয়েছেন। অথচ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর কোনো আপত্তি না শুনে বর্ধমানের রাজাদের পত্তনি দিয়েছেন মূলাজোড় গ্রাম, যেটি আগেই ইজারা দেওয়া হয়েছিল ভারতকে। এটা ভূস্বামীদের শ্রেণীগত বোঝাপড়ার প্রশ্ন—কবি এবং পোষ্যদের এ সব ক্ষেত্রে বলবার কী বা থাকতে পারে ; রাজা তাদের আনুকূল্য করে প্রসাদ বিতরণ করবেন, উপদেশ শুনবেন কেন ?

আর একটি ধনী পরিবারের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের তিনবার সংস্পর্শ ঘটেছিল। বর্ধমানের রাজারা তাঁর বাবার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল, তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল এবং প্রতিষ্ঠিত জীবনে কর্মচারী রামচন্দ্র নাগকে লাগিয়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ভারতচন্দ্রের মতো উচ্চশিক্ষিত, তত্ত্বজ্ঞ এবং বহুদর্শী পণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিকে [এবং কতকটা আত্মম্ভরী বলে নিজের গুণবিষয়ে সচেতন] ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আশ্রয় ভিক্ষা করে, অর্থানুকূল্য লাভ করে; কৃপার ভিখারী হয়ে খোসামুদে মোসাহেবের জীবন কাটাতে হয়েছে। এর যন্ত্রণাবোধ তাঁকে অন্তরে বিদ্ধ করেছে এবং তাঁর কাব্যকে তিক্ত ও বক্র করে তুলেছে।

তবুও ভারতচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়েই গড়ে উঠেছিল। সত্যপীরের ব্রতকথা বাদ দিলে বাকি সবগুলিই এই সময়ে লেখা। মহারাজের অর্থানুকূল্যে তাঁর অভাব নিশ্চয়ই ঘুচেছিল—কারণ সেকালে মাসিক চল্লিশ টাকার দাম কম ছিল না। তবুও কৃষ্ণনগর বাসকালেও প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন গৃহহীন। স্ত্রী পিতৃগৃহে। নিজ পিত্রালয়ের সঙ্গে বহু আগেই সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছেন কবি। ভবঘুরে ভারত আশ্রয় পেলেও, এখনও মূলোৎপাটিত। শিকড় গজাবার সুযোগ এলো চল্লিশ বছর বয়সে। মাত্র তখন তিনি নিজের গৃহ পেলেন এবং যথার্থ পরিবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বাঙালির পরিবারধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট আবেগ-ভাবোচ্ছ্বাসগুলি ভারতচন্দ্রের অপরিচিতই শুধু থাকে নি, তিক্ত বিরূপতার সৃষ্টি করেছে, চিত্তকে আক্রমণে শাণিত করে তুলেছে। একমাত্র যে প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক, বরং বাঙালির গার্হস্থ্য পরিবেশে যা মুহ্যমান সেই তীব্র কাম-প্রেম বৃত্তি বা প্যাসন ভারতচন্দ্রের কাব্যে সর্বদা সোল্লাসে প্রতিবিম্বিত।

ভারতচন্দ্রের শিল্পীব্যক্তিত্বে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও প্রতিভার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে যুগের বিশিষ্টতা। সে কারণেই তার কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া প্রাসঙ্গিক মনে করি। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের শাসন কালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থায় কোনো নূতন দুর্যোগ দেখা দেয় নি। সমাজজীবন পুরানো ছন্দে চলছিল, বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে এ দেশের যোগাযোগ সহজ হওয়ায় বা সর্ব-ভারতীয় ঐক্যবদ্ধ শাসন ক্ষমতার অধীনে আসায় বাঙালির জীবন ও ভাবনায় কিন্তু নব দিগন্ত উন্মোচিত হয় নি। কিন্তু সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাদেশ ঔরঙ্গজেবের শাসনাধীন এল। পঞ্চাশ বছর বিস্তৃত তাঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক শোষণে জীর্ণ হয়ে পড়ল। এ আমলে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ

আজিমউস্‌সান এবং আরও অনেকে—প্রায় প্রতিটি সুবাদারই—বাংলা দেশকে নির্মম-ভাবে দোহন করে কোটি কোটি টাকা সম্রাটের কোষে পাঠাতেন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধি করতেন। করভারে গোটা দেশ পীড়িত, তার উপরে সম্রাটের আদর্শ অনুসরণ করে হিন্দুদের উপরে অতিরিক্ত অত্যাচার চালাতে শাসকেরা উৎসাহই অনুভব করত। মাঝে মাঝে দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছে। আরও ছিল মগ-পর্তুগীজদের হানাদারি। মোগল সুবাদারেরা অনেকেই ছিল অসচ্চরিত্র, অর্থলোলুপ বিলাসী ও কামুক। এর প্রভাব অমাত্যবর্গের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অভিজাত সম্প্রদায়, ভূস্বামীরা ঐ ধরনের জীবনা-দর্শের অনুসরণ করে ধন্য হতে চেয়েছিল। একটা দূষিত, পৌরুষহীন লালসা-শৈথিল্য সারা দেশে প্রকট হয়ে উঠল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।

আঠারো শতকেও এ অবস্থা সমানে চলতে থাকে। মুর্শিদকুলি বা আলিবর্দি যোগ্য শাসক হলেও দেশের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেন নি। মুর্শিদকুলির হিন্দুবিদ্বেষে এবং ভূস্বামী ও প্রজাদের পীড়ন করে অর্থসংগ্রহ দেশে হাহাকার তুলেছিল। আলিবর্দির সময়ে বর্গীয় হাঙ্গামায় গঙ্গার পশ্চিম পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছে। শস্যক্ষেত্র ও জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে নিদারুণ অন্নাভাব। বিবেচক শাসক আলিবর্দিও বর্গীদের বাধা দেবার প্রয়োজনে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাকে করভারে জর্জর না করে পারেন নি। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ল। বাংলার সুবাদারেরা কার্যত স্বাধীন। দরবার, হারেম এবং অমাত্যদের আবাসস্থল ষড়যন্ত্র ও স্বার্থচিন্তার কেন্দ্রে পরিণত হলো।

এই অবস্থায় ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে দেশের প্রকৃত ক্ষমতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে গেল। এই শতাব্দীর শেষার্ধে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ লুঠের স্বর্গরূপে বাংলাকে ব্যবহার করেছে। প্রভূত অর্থ নানা ভাবে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়েছে। দারিদ্র্য অনাচার অরাজকতা পৌঁছেছে চরমে। অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ হবার আগে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে অনুভূত হয় নি।

মোট কথা সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রায় সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাঙালির জীবন বিবিধ অব্যবস্থা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক দৈন্য ও নিষ্ঠুর শোষণ, বোম্বেটে বর্গীর হানাদারি ও দুর্ভিক্ষ, রুচিহীনতা ও মোগলাই বিলাসকলা অভিজাতবর্গের জীবন থেকে ক্ষরিত হয়ে গোটা সমাজকে বিষিয়ে দিচ্ছিল। ষোড়শ শতাব্দী ও সপ্তদশের প্রথমভাগ জুড়ে যে বৈষ্ণবী ভক্তিতে জাতির জীবন ছিল উল্লসিত,—এ পর্বে তার ক্রমিক অবসান ঘটেছে। চৈতন্যপন্থী আন্দোলনের প্রগতিশীল প্রাণশক্তি এখন নিঃশেষিত। নিশ্চিত বিশ্বাসের স্থলে এসেছে সংশয়। পুরাতন ধর্মকেন্দ্রিক মূল্যবোধগুলি অর্থহীন হয়ে ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে পড়ছিল। সর্বব্যাপী অবক্ষয় মধ্যযুগের অবসান সূচিত করছিল।

ভারতচন্দ্র যুগক্রান্তি সম্বন্ধে সম্ভবত অনেকখানি সচেতন হতে পেরেছিলেন। গ্রামীণ ভদ্রলোকের সাধারণ জীবন যাপন করলে কালের কিছু খণ্ডিত ফল মাত্র ভোগ করতেন। আকবরী ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনকালে যেমন বিপর্যস্ত হয়েছিলেন গ্রামবাসী মুকুন্দরাম, যুগের বোধ ছিল তাঁর মন থেকে বহুদূরে। ভারতচন্দ্র জীবনের একটা বড় অংশ অভিজাত ভূস্বামীদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। যুগের তরঙ্গাঘাত বর্ধমান কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে, বিদেশি বণিকদের দেওয়ান কুঠিতে বর্গীদের ডেরায় প্রবল ভাবে অনুভূত হতো। ফলে যতটা পুরোপুরি কালকে আত্মসাৎ করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, অনেকের ভাগ্যেই তা জোটে নি। তা ছাড়া কালের সঙ্কট এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পৌনঃপুনিক বিপর্যয় দুইয়ে মিলে একটা সুরই বেজে উঠেছে, যেন তাঁর নিজের মধ্যেই যুগের আয়না। এ কারণেও সময়ের অন্তরে প্রবেশের দরজা তিনি পেয়েছিলেন। অবশ্য যুগকে চেনবার জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল তাঁর মনীষায়, প্রতিভায়।

যুগের অবক্ষয়ী প্রভাবে ভারতচন্দ্রের রচনা অন্তঃসারশূন্য এবং কৃত্রিম প্রসাধনবহুল হয়ে উঠেছে, এরূপ অতিসরলীকৃত সিদ্ধান্তের পক্ষে আমি নই। কারণ যুগ এক্ষেত্রে একটা বড় মাপের প্রতিভা তথা একটি জটিল সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সে প্রতিফলন সূক্ষ্ম এবং বক্র হতে বাধ্য। এটুকু মাত্র বলা সম্ভব যে ভারতচন্দ্রে অবক্ষয়ী মনোভাব একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং ভাঙনের মত্ত মহোৎসবে ধরা পড়েছে। তাঁর লেখার চড়া প্রসাধন অন্তরের মূল্যহীন শূন্যতা ঢাকতে চেয়েছে এ কথা প্রমাণ করা দুরূহ, এ জাতীয় লক্ষণ ক্রান্তিকালীন অন্ধকারের নিশ্চিত নিদর্শনও নয়। ভারতচন্দ্র পুরাতন জীর্ণ আদর্শগুলি ভেঙেছেন, প্রথাগুলিকে ব্যঙ্গ বা অবহেলা করেছেন, রীতি পদ্ধতিগুলির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন প্রয়োগের বৈপরীত্যে। কিন্তু বড় শিল্পী যখন ভাঙেন, কিছু গড়বার জন্যই। সেখানে তিনি যুগের ক্ষয়ের সীমা ছড়িয়ে যান। ভারতচন্দ্রে সে-সাধনা আছে, সিদ্ধি কতটা তা বিচার করে দেখতে হবে।

ভারতচন্দ্রের 'চণ্ডী নাটকে' মহিষাসুর ভোগবাদের প্রশস্তি করেছিল :

> ছোড়্ দে উপাস্ যোগ্ / মানহুঁ আনন্দ ভোগ··· / ছোড়্ দেও যোগ ভোগ মোক্ষ এহি লোগ্ মে।

নাটকের সে বিপ্রতীপ চরিত্র হলেও তাতে শব্দ-ঝংকারে কবির কামনাও অনুরণিত। আরও প্রত্যক্ষ যদিও 'বাসনা বর্ণন' কবিতা। কবি সরাসরি কুবেরের ধন পেতে চেয়েছেন :

> আশ্ নাই আরো চাই / ইন্দ্রের ঐশ্বর্য পাই / ক্ষুধামাত্র সুধা খাই / যমে করি ফাঁসনা।

ধন চাই, চাই বহুল ও বিচিত্র ভোগ—উল্লসিত কামনার চরিতার্থতা, যৌবনের সুখ [বিদ্যাসুন্দরে কবিচিত্তের এত বর্ণবহু ময়ূর-নৃত্য তা না হলে প্রকাশ পেত না], চাই পরিপাটি গৃহ, সন্তান, দেশব্যাপী যশ। [কুতবাটি গঙ্গা ভজন-পরিপাটি

"যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপিচ বস্ত্রং' ইত্যাদি। 'নাগাষ্টকং' দ্রষ্টব্য]। ধর্মপালনেও উৎসাহ আছে, দেবপ্রতিষ্ঠা দোলদুর্গোৎসব—সম্পন্ন ভদ্রলোকের ভক্তি ব্যাকুলতাহীন সাড়ম্বর অনুষ্ঠান 'দশভুজাধাতুরচিতা শিবা; শালগ্রামা হরি হরি বধূমূর্তিরতুলা ইত্যাদি। 'নাগাষ্টকং দ্রষ্টব্য]। এবং সংস্কৃতে 'গঙ্গাষ্টক' রচনা নিজের পাণ্ডিত্য ও কবি-ক্ষমতা প্রদর্শন। বলা যেতে পারে কোনো মঙ্গলকাব্যের সুরেই ভোগবিমুখ সন্ন্যাসের জয়গান নেই। কিন্তু সেখানে মধ্যযুগের সাধারণ মানুষের সহজ ও অভ্যস্ত কামনা মাত্র আছে, তার মধ্যে বড় চিৎকার নেই। ভারতচন্দ্রে ভোগেচ্ছা দর্পিত ও সোচ্চার,—ব্যক্তিগত ব্যাকুলতা। বাসনা অচরিতার্থতার তীক্ষ্ণ বোধকে কখনও নিরুচ্ছ্বাস কৌতুকে ধরে রাখা :

ভারত সন্তাপে জ্বলে……আ আরে বাসনা।

অথবা করায়ত্ত প্রাপ্তি সফল না হবার স্বল্পস্পন্দিত বিষাদ :

সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি।

বিলাসী ধনীদের সংস্পর্শ এই বাসনা-প্রাচুর্যের একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভারতচন্দ্রে এই প্রবণতা ভোগ নয়, ভোগের দর্শন, বিলাসিতা নয়—বিলাসকলার শবৈশ্বর্যময়ী প্রতিমা। এই তীব্র মর্ত্যমমতার মধ্যে জীবনচেতনা হিসাবে যে আধুনিকতার দ্যোতনা, কবি তা কোথায় পেলেন? নিশ্চয়ই মধ্যযুগীয় সম্ভোগমজ্জিত ভূস্বামীদের কাছ থেকে নয়।

ভারতচন্দ্রের রচনায় কাম-প্রেম সম্বন্ধে একটি সচেতন ভাবনা আছে। আধুনিক সংস্কার থেকে কাম ও প্রেম দুটি পৃথক বোধ হলেও সেকালে বৈষ্ণবদের ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিতে ছাড়া অন্য সর্বত্র এদের এক করে দেখা হয়েছে।[১] ভারতচন্দ্র এদের এক করেই দেখেছেন। তাঁর রচনায় কোনারূপ দার্শনিকতা প্রকাশের চেষ্টা না থাকলেও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলি বিশ্লেষণ করলে একটি বিশিষ্ট জীবনবোধের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত হল।

১. শিবের তপোভঙ্গ করে মদন ভস্ম হয়েছিল, কিন্তু দগ্ধ পঞ্চশরের প্রভাব থেকে রক্ষা পেলেন না স্বয়ং স্মরহর।

২. কুবের অনুচর বসুন্ধর অন্নদাপূজার জন্য ফুল তুলতে গিয়েছিল। দেবী-পূজা ভুলে, চয়িত ফুলমাল্যে বসুন্ধর পত্নীসহ রতিরঙ্গে মত্ত হলো।

সেই ফুলে শয্যা করি / সেই ফুলে মালা পরি / রতিরসে দুজনে রহিল।

এ বিষয়ে বসুন্ধরের প্রেমমিলনোৎকণ্ঠার প্রতিটি বাক্য দেবারাধনাকে সদর্পে অস্বীকার করেছে। তা থেকে স্বল্পাংশ তোলা হল :

অন্নপূর্ণা কি করবে / অষ্টমী কি সুখ দিবে / যে সুখ পাইবে রতিসুখে। /
দেবাসুরে সুধালাগি / সিন্ধু মথি দুঃখভাগী / সে সুধা সঘনে পেও মুখে ॥

এর ফলে অবশ্য বসুন্ধর-দম্পতিকে অভিশপ্ত হতে হল। কিন্তু তারা যেন তা অনিবার্য

১ বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা লোহা ও সোনার মতো কাম ও প্রেমকে স্বরূপগত বিলক্ষণ বলতে চেয়েছেন।

জেনেও প্রতিস্পর্ধী হয়েছিল।

৩. বসন্ত অষ্টমীতে পুষ্পিত কাননে দুই পত্নী চন্দ্রিনী-পদ্মিনীকে নিয়ে প্রেমভোগ-মগ্ন নলকূবরের কাছে দেবী অন্নদা পূজা প্রার্থনা করেছিলেন। নলকূবর উত্তরে বলল :

অতি মত্ত মদে না গনে আপদে / কহে কুবেরের বেটা। / এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে / কার পূজা করে কেটা ॥ / এ সুখযামিনী / এ নব কামিনী এ আমি নব যুবক / ॥ এ রস ছাড়িয়া / পূজায় বসিয়া / ধ্যানে রব যেন বক ॥

পত্নীদ্বয় সহ নলকূবরকেও অভিশপ্ত হয়ে মর্তাবতরণ করতে হল।

৪. বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি জুড়ে প্রণয়ী-যুগলের সোল্লাস মিলনের বিচিত্র কথা। সম্ভোগসমৃদ্ধ যৌবনধর্ম পালনের পুণ্যেই তাদের যেন চিরস্বর্গবাস, ['বিদ্যাসুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুকী হয়ে কৈলাসশিখরে উত্তরিলা।'] তাদের অন্য ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন কাব্যমধ্যে মেলে না।

৫. প্রৌঢ় ভবানন্দের দুই পত্নী সম্ভোগের কৌতুকমিশ্র বিবরণ।

৬. 'রসমঞ্জরী'তে রসতত্ত্বের সূত্র ছাপিয়ে উঠেছে সম্ভোগ ও কাম-কৌতুকের বিচিত্র চিত্র-রচনা।

৭. ক্ষুদ্র কবিতাবলীতে বসন্ত-বর্ষা-হাওয়া বর্ণনার ধ্রুবপদেও সেই এক প্রিয়মিলনের তীব্র কামনা।

৮. এমনকি প্রথম কবিতা সত্যপীরের ব্রতকথার চন্দ্রকলাও স্বামীর মৃত্যুতে যে ভাষায় কেঁদেছে তাতে কামবাসনার কথাই প্রকাশিত :

এ নব যৌবন নিশি / হয়ে তার পূর্ণশশী / কোথা আছ অহর্নিশি / প্রেমাধীনী ফেলে হে। / যৌবনে প্রভুর কাল / মদন দাহন জ্বাল / কোকিল কোকিলা কাল / রাখ পদতলে হে ॥

৯. বিদ্যাসুন্দরে নারীদের পতিনিন্দার পেছনে প্রধানত দেহধর্মের অতৃপ্তিজনিত বিকার। ব্যতিক্রম কবি-পত্নীর কথা। কারণ দরিদ্র হলেও তিনি 'কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু।'

এই প্রবণতাকে অনেকে ভারতচন্দ্রের রুচিবিকার বলে বিশেষিত করেছেন। ভারতচন্দ্র কিন্তু একে জীবনের উৎস, আনন্দ এবং অপ্রতিবিধেয় নিয়তি বলে অনুভব করেছেন কাম-প্রেমকে। কামকে ধ্বংস করা যায় না :

মরিল মদন / তবু পঞ্চানন / মোহিত তাহার বাণে। / বিকল হইয়া / নারী তলাসিয়া / ফিরেন সকল স্থানে ॥

'মুনি গোঁসাই' এর ভেক ছেড়ে ফেলতে হয়, মনোহরশাহী কীর্তন আসরের ভক্তিমোহ থেকে উঠে আসতে হয়। এই কামের দেবতাটির আহ্বান ভারতচন্দ্র শুনেছিলেন 'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের।' এই কামই মৃত্যুর কারণ তবু অনিবার্য [বসুন্ধরা

নলকুবের-সুন্দর], কামই পূজা [সুন্দরের কালীপূজা কিংবা চৌরপঞ্চাশতের শ্লোকে যুগপৎ বিদ্যা ও কালী স্মরণে তাদের সমরূপ প্রাপ্তি] এবং প্রকৃতি-জগত এর পটভূমি রচনায়ই ব্যাপৃত [হাওয়া বসন্ত বর্ষা বর্ণনা]। যৌবনের বর্ণনায় কবি বলেছেন :

যুবা সূর্য বলবান্ / যুবা চন্দ্র দ্যুতিমান্ / যুবা বিনা সংসারের ভার অন্যে বহে না। / কিবা নর কিবা অন্য / যৌবনে সকলে ধন্য / যৌবন হইলে নষ্ট দেখি দেহ রহে না ॥

আবার—

যৌবন মরম না জানে যেবা / তপ জপ জ্ঞান দান যে কিছু। / পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা ॥ / সকলি যৌবন ধনের পিছু।

ভারতচন্দ্রের এই দেহবাদে যে গাঢ় ইহলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে মধ্যযুগের পাত্রে তাকে ধরে রাখা যায় না। এই আধুনিক জীবনচেতনা – পরিবার-ধর্ম-অতিক্রমী তীব্র দেহধর্মী যৌবনমত্ত প্রেম পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসুন্দরে এবং সেই বিদ্যাসুন্দরই কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। সর্ববন্ধনমুক্ত, একান্ত ব্যক্তিগত, দেবভাবনাবিবিক্ত প্যাসনের এই লীলা, বিধি-অবিধি, হিত-অহিত বিবেচনাহীন এই হৃদয়-বিস্ফার অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি কোথায় পেলেন ? আরবি-পারসি লৌকিক প্রণয় কাব্যের কিছু প্রভাব কবিচিত্তে হয়তো কাজ করেছে। তবে অন্য একটি সম্ভাবনার কথাও মনে আসে।

কৃষ্ণনগর রাজদবারে যোগ দেবার আগে ভারতচন্দ্র গোন্দলপাড়ায় ওলন্দাজ সরকারের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে কিছুকাল বাস করেন। ফরাসডাঙার ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে এইসময়ে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। পরবর্তীকালেও মাঝে মাঝেই তিনি ফরাসডাঙ্গায় যেতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি ও ওলন্দাজ বাসিন্দাদের সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ কিছু পরোক্ষ অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এই পরিচয় ও অভিজ্ঞতার স্বরূপ নির্ণয় করা আজ দুরূহ। কিন্তু য়ুরোপীয় এই দুই বণিক সম্প্রদায় [ওলন্দাজদের মধ্যে ধর্ম প্রচারকও অনেক ছিলেন] তাত্ত্বিক শিক্ষাবিদ্ বা সংস্কৃতি-কর্মী না হলেও য়ুরোপীয় যে জীবনযাত্রা অনুশীলন করতেন তাতে নব্যমানবতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও মুক্ত প্রেমের সহজ স্থান ছিল। এই মূল্যবোধগুলি তাদের কাছে নিঃশ্বাসের মতো স্বাভাবিক। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম চেতনার অধিকারী, বহু অভিজ্ঞতালব্ধ ভারত-চন্দ্রের কাছে তার কোনো কোনো তাৎপর্য অনুভূত হওয়া অসম্ভব নয়। ইংরেজদের সঙ্গে বিবিধ সূত্রে যোগাযোগ, তাদের শিক্ষাবিস্তার সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে একটা সচেতন আন্দোলন হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীতে যে মানবমূল্যগুলি বাংলা রেনেসাঁর ভিত্তি তৈরি করেছিল আরও পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে সেগুলিই ভারতচন্দ্রের রচনায় স্পষ্টভাবে প্রবেশ করতে চেয়েছে অপর দুটি য়ুরোপীয় জাতির স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে – এরূপ সিদ্ধান্ত ফেলে দেবার মত নয়।

ভার. অন্নদামঙ্গল কাব্যবিচার ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ

ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে একটি আখ্যানকাব্য লিখেছিলেন। এটিই তাঁর প্রধান রচনা।

মঙ্গলকাব্যের দুটি দিক। মঙ্গল হিসাবে একটা বিশেষ আঙ্গিক ও কতগুলি বিধিবিধানের অনুসরণ; আবার সব মঙ্গলই আখ্যান কাব্য বলে তার রীতি-নীতি স্বাদের আনুগত্য। ভারতচন্দ্র এই দুই বিষয়েই মৌখিক আনুকূল্য জানিয়েছেন, কিন্তু মূলত অনুসারী হননি। মঙ্গলকাব্যের ফর্মুলাগুলি ভারতচন্দ্র মেনে চলেছেন। বহু দেবদেবীর বন্দনা করেছন গ্রন্থারম্ভে, আত্মজীবনী বলেছেন; নারীদের পতিনিন্দা; গৃহিনীর রন্ধনকলা, নায়িকার বারমাস্যা, চৌত্রিশ অক্ষরমিলিয়ে দেবীস্তুতি, দেবখণ্ড মর্ত-খণ্ডের কথা, অভিশাপ দিয়ে দেবতাকে পৃথিবীতে প্রেরণ, আরাধ্য দেবতার পূজা-প্রচার প্রভৃতি আয়োজনের ত্রুটি রাখেন নি কিছু। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের যে কেন্দ্রীয় বিষয় অর্থাৎ দেবতার শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দান তাও পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। অন্নদা ভক্তকে প্রসাদদানে এবং বিরোধীর সর্বনাশ-সাধনে নানাবিধ তাৎপরতা দেখিয়েছেন। কাব্যমধ্যে দেবীভক্তিমূলক গীতসংযোজনও আছে। কাজেই মঙ্গলকাব্যের সমাপ্তি পর্যায়ের কবি হিসেবে তাঁকে বিচার করার সুযোগ কবি নিজেই করে দিয়েছেন। উক্ত দৃষ্টিকোণে তাঁর কাব্যমূল্য বিচারের চেষ্টাও অনেকে করেছেন এবং সঙ্গত কারণেই কবি তাতে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর ভক্তিকে অধিকাংশ সমালোচকই আন্তরিক মনে করেন নি। মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের পরিবার-জীবন ও গ্রামীণ সমাজ যেরূপ অনায়াস বিশ্বস্ততায় ফুটে ওঠে অন্নদামঙ্গলে তার পরিচয় বিশেষ নেই। মঙ্গলকাব্যে সহজ বাস্তবতা ও মানবিক ভাবাবেগ তথা উচ্ছ্বাসানুভূতিগুলি ধর্মের আবরণ সত্ত্বেও যেমন সরলভাবে চিত্রিত হয় এই কাব্যে তার সদৃশ কিছু পাওয়া যায় না। কবির এই ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ কি?

আসলে বাধ্য হয়ে মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকটি তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে, তার বহিরঙ্গ রূপরীতির প্রতি অনুগত থাকতে হয়েছে। কারণ:

১. বাংলায় মৌলিক কাব্য-রচনার অন্য কোনো রীতি তাঁর জানা ছিল না।

২. প্রতিপালক কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর সভাসদেরা কাব্যের মুখ্যপাঠক; অষ্টমঙ্গলার আসরে আগত বিশিষ্ট নাগরিকেরাই তাঁর শ্রোতা ও বিচারক। তারা মঙ্গল গান শুনতে এসেছিল, নতুন মঙ্গল গান হলেই মৌলিকতার চূড়ান্ত হলো মনে করত।

এই ফ্রেমের বাইরে যাবার সুযোগ বা উপায় ভারতচন্দ্রের ছিল না; অথচ তিনি আঙ্গিক-সচেতন কবি, বিশিষ্ট জীবনভাবনার অধিকারী। মঙ্গলকাব্যের ভাব ও রীতির সঙ্গে তাঁর মনের কোনো আত্মীয়তা নেই। এটা কবির স্বাধীন মনের শৃঙ্খল বিশেষ। প্রায়ই তা রচনাকে পীড়িত করেছে, কচিৎ এই শিকল বাজিয়েই কিছু সুর তুলেছেন—অবশ্যই তার স্বাদ আলাদা।

যেমন পদ্মমুখীর রন্ধনের শুষ্ক তালিকা-চয়ন সেকালের যে কোনো সাধারণ কবির

লেখা হতে পারত। এয়োদের নামের ফর্দ শব্দ ও ধ্বনি নিয়ে আছে কিছু অলস ও অবান্তর খেলা। চৌতিশার স্তবে ব্যাকরণ ও শাস্ত্রঘটিত পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী। আর মঙ্গলকাব্য-সুলভ দেবীমাহাত্ম্যের চরম বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে বিদ্যাসুন্দরে। বিদ্যার শয্যাগৃহে যাবার সুড়ঙ্গটি সুন্দর কালীপ্রতিমা দিয়ে ঢেকে রাখত।[1] গোটা মধ্যযুগের সমাজাদর্শের ভিতে কাটা এই সুড়ঙ্গ আবৃত করার কাজে আরাধ্যা দেবীকে নিযুক্ত করা হয়েছে, মঙ্গলকাব্যের দেবীমাহাত্ম্যের প্রতি এই কটাক্ষের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। আবার নারীগণের পতিনিন্দার মতো অতি স্থূল গ্রাম্যতাকে তিনি রাজসভাসদদের প্রতি ব্যঙ্গের কাজে লাগিয়েছেন। কবির ব্যক্তিগত রাগদ্বেষও এক্ষেত্রে কিছুটা সক্রিয় থাকতে পারে।

মোটকথা মঙ্গলকাব্যের দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন বিশিষ্টতা ও ভারতচন্দ্রের কবিতা পরস্পরকে আহত করেছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্য আসলে আখ্যান কাব্য। নানা দেশে নানা সময়ে এই শ্রেণীর কাব্য লেখা হয়েছে। আখ্যানকাব্যের স্বাদ অন্নদামঙ্গল সার্থক ভাবে যোগাতে পেরেছে কি ? সে ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্রের পক্ষে রায় দেওয়া যায় না। আখ্যান কাব্যের ন্যূনতম সাফল্য হলো কাহিনী ও চরিত্রসৃজনে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু উচ্চতর সাফল্য যে কত বিচিত্র হতে পারে তার পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন। আখ্যানকাব্যের বড় কবি কাহিনীকে চমকপ্রদ ও নাট্য-তরঙ্গিত করে তোলেন, আকস্মিক রস সংযোজনের জন্য তিনি সরল বিশ্বাসযোগ্যতা ও বহিরঙ্গ স্বাভাবিকতা বর্জনও করেন। আখ্যান কাব্য কাব্য বলেই বর্ণনাকে গুরুত্ব দিয়ে শাখাবিস্তার করা হয় ঘটনার কেন্দ্র থেকে নানা দিকে, বা সে উদ্দেশ্যে নানা পরিস্থিতি তৈরিও করে নেওয়া হয়। অন্নদামঙ্গলের ক্ষেত্রে এর কোন্ মানদণ্ড অনুসরণ করব ?

অন্নদামঙ্গলে কাহিনী আছে মোট পাঁচটি। ১. শিব পার্বতী উপাখ্যান। ২. ব্যাসবৃত্তান্ত। ৩ হরিহোড় উপাখ্যান। ৪. ভবানন্দের উপাখ্যান। ৫. বিদ্যাসুন্দর।

এর মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের একেবারে নিঃসম্পর্ক গল্পটি ভবানন্দ কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন কি আরাধ্যা দেবীও ভিন্ন, অন্য প্রসঙ্গগুলিতে অন্নপূর্ণা, এখানে কালিকা। অপর চারটি কাহিনীর মধ্যে ক্ষীণসূত্রে একটি সম্বন্ধ রক্ষিত হয়েছে—তাতে ঐক্যবদ্ধ গল্পের স্বাদ আসে না।

তিন এবং চার সংখ্যক কাহিনী দুটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। ভবানন্দের কথা সামান্যত [প্রতাপাদিত্য অংশ] প্রচলিত ইতিহাস থেকে সঙ্কলিত। স্বাধীনভাবে গল্পগঠনে ভারতচন্দ্র যে আদৌ নিপুণ ছিলেন না এখানে তার নিশ্চিত নিদর্শন। হরি-হোড়ের ঘটনাগুলি একেবারে সরল রৈখিক। বিপরীত শক্তির সংঘাতে বা ঘটনা-বৈচিত্র্যে কোথাও কাহিনী বৃত্তায়িত হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। হরিহোড় অতি-

১ দেবীকৃপায় আকস্মিক সুড়ঙ্গ উৎপন্ন হল রামপ্রসাদ এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, দেবী প্রতিমা দিয়ে সুড়ঙ্গ ঢাকার বন্দোবস্ত পর্যন্ত এগোন নি।

দরিদ্র, অকারণে দেবীকৃপা লাভ করে ধনী হয়েছে এবং দেবীর কোপে অকারণেই তার পতন ঘটেছে। কলহপরায়ণ গৃহ থেকে দেবীর আশীর্বাদ সংহরণ করে নেওয়া—ব্রতকথা সুলভ এরূপ পরিস্থিতি-সৃষ্টিতে উদ্ভাবনী শক্তির চিহ্ন নেই। বিপদাপন্ন হওয়ায় ভবানন্দের কাহিনীতে একটি মাত্র অংশে অল্পকালের জন্য একটা দ্বন্দ্বাত্মক ভাব এসেছিল, কিন্তু যথার্থ নাট্যসুলভ সংঘাতের চেয়ে ভৌতিক উৎপাতের বর্ণনায়ই কবির বেশি উৎসাহ থাকায় কাহিনী মোটেই জমে ওঠেনি। এ কাহিনীও ঘটনাবিরল এবং নাট্যকৌতূহলহীন থেকে গিয়েছে।

এ কাহিনীতে নায়ক ভবানন্দের চরিত্রের কোনো সামগ্রিক রূপ জীবন্ত হয়ে ওঠে না। নানা কার্যে তাকে রত দেখতে পাই। নানা তীর্থে সে ভ্রমণশীল, বিপদে মানসিংহের সাহায্যকারী, পরমভক্ত, তার দৌলতেই দিল্লীতে হিন্দুধর্মের গৌরব-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সব মিলে তার চরিত্রের কোনো সুনির্দিষ্ট ভাবকেন্দ্র আবিষ্কার করা যায় না। দুটি বাক্যে প্রতাপাদিত্য পৌরুষ মহিমায় ঝলসে উঠলেও, মানসিংহের কোনো বিশিষ্টতা নেই।

প্রথম দুটি উপাখ্যান পুরাণাদি থেকে সঙ্কলিত। ঘটনাগ্রন্থনে মৌলিক প্রসঙ্গ প্রবিষ্ট করার সুযোগ বা উৎসাহ কোনোটিই তাঁর ছিল না। শিব-পার্বতী উপাখ্যানটিও একান্ত সরল রেখায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রথামাফিক এগিয়েছে। সতীর দেহত্যাগ দক্ষযজ্ঞধ্বংস, শিবের তপস্যা, পার্বতীর সঙ্গে বিবাহ—এ পর্যন্ত ঘটনাখণ্ডগুলি কার্যকারণ যুক্ত। তারপরে শিবের দারিদ্র্য, শিবদুর্গার কলহ, শিবের ভিক্ষা, অন্নপূর্ণারূপে দেবীর আত্মপ্রকাশ—এদের মধ্যেও একটি স্বতন্ত্র ক্রম অনুসরণ করা যায়। কিন্তু সাধারণের ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত বলে এ ক্ষেত্রে ভারতের গল্পগঠনের দায় ছিল না। শিব বা অন্নপূর্ণার চরিত্র বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেলেও কবি মনস্থির করার প্রয়োজন বোধ করেন নি সমগ্রত এদের কি জাতীয় ব্যক্তিত্ব দান করবেন,—এদের মানব বা দেবতা কোন্ রূপে অঙ্কিত করবেন। যে কোনো মঙ্গলকাব্যে এরা যথেষ্ট অলৌকিক ক্ষমতার আবরণেও ক্রোধে প্রীতিতে কামে চক্রান্তে একান্তই মানবধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ভারতচন্দ্রের শিব পার্বতী কখনও দরিদ্র দম্পতি, কখনও দেবমহিমায় স্থাপিত, কখনও তত্ত্বলোকের পটভূমি স্পষ্ট।

ব্যাস কাহিনীটিতে শিব ও অন্নদার চরিত্রের যে অংশ প্রকাশিত সে বিষয়েও ঐ একই সিদ্ধান্ত করা চলে। তবে স্বয়ং ব্যাসের ন্যায় একটি প্রধান চরিত্র কবির মনোহরণ করেছিল মনে হয়।

এই চারিটি কাহিনীর মধ্যে ঘটনাসংস্থান ও বর্ণনায় বা চরিত্রে, চিত্রে ভারতচন্দ্র একটা নিজস্ব পরিকল্পনামাফিক এগিয়েছেন, এরূপ মনে করার কারণ আছে। একথা ঠিক গোটা কাব্যে মামুলী কাহিনী-কথনেও কবির সুমার্জিত মসৃণ ভাষারীতি সর্বত্র লক্ষণীয়। তা ছাড়া সামান্যতম সুযোগেও তিনি তন্ত্রপুরাণাদিতে পাণ্ডিত্যের প্রভূত প্রমাণ দিয়েছেন পাঠকদের। কিন্তু তা পাণ্ডিত্যই। এবং ঐ পরিশীলতা ভাষাভঙ্গী

তথা কাহিনী—সূত্রের আকারে ব্যবহৃত। মাঝে মাঝে কতকগুলি বিশেষ স্থানে, ঘটনা-সন্ধিতে, চিত্ররচনায় চরিত্রভঙ্গীতে হঠাৎ এক এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। ছন্দে এসেছে উদ্দামতা, ভাষা হয়ে উঠেছে কল্লোলিত, ব্যঙ্গ হয়েছে তীব্র, কৌতুক শতধারে বর্ধিত, বীভৎসতা করেছে মুখব্যাদান, প্রলয় হয়েছে আসন্ন। কখনও এই অংশগুলি কাহিনীর প্রয়োজনকে অনেক দূরে ছাপিয়ে গিয়েছে, নির্দিষ্ট ফ্রেম ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। এরূপ কতকগুলি নিদর্শন উল্লখিত হল :

১. দশমহাবিদ্যার চিত্র-বিন্যাসে শিবের বিস্মিত ও বিব্রত ভাবটি নাট্যচাতুর্যের সঙ্গে প্রকাশিত। যেমন :

দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া। / পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ॥

অথবা, দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত। / ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত ॥

বর্ণনাগুলির মধ্যে কালী-তারা-ছিন্নমস্তার স্বভাব-ভীষণ রূপ এবং ভৈরবীর কোমলতায় ভীষণতার আরোপ কবিচিত্তকে উত্তেজিত করেছে, অপরপক্ষে মহালক্ষ্মী ভুবনেশ্বরীর ঐশ্বর্য মাধুর্যময় রূপ কবির হাতে একেবারেই বিবর্ণ।

২. শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা এবং দক্ষযজ্ঞবিনাশের চিত্রে ভৌতিক উল্লাস, ধ্বংসের উন্মাদনা শব্দ ব্যবহারের বিস্ময়কর নৈপুণ্যে এবং নব ছন্দপ্রযোগের ক্ষমতায় পাঠকের সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

৩. রতিবিলাপ। অনেকেই এ কান্নায় যথেষ্ট বেদনা না থাকায় আপত্তি করেছেন। কবি হৃদয়হীন বিলাপের একটা ঢঙ্, কান্নার একটা ক্যারিকেচারের ছবিই আঁকতে চেয়েছেন। কোনো কোনো বিলাপ যে বিলাপ নয়, যাত্রার আসরের অভিনয়ের মতো, সে বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সচেতন থাকা সম্ভব মনে হয়।

৪. শিবের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে সিদ্ধি-ঘোটনের বিস্তৃত বর্ণনা। সিদ্ধি নেশাতুর শিবের চিত্রাঙ্কনে এলায়িত ছন্দ ও শব্দযোজনার নৈপুণ্য।

৫. ভিক্ষান্বেষী শিবকে ঘিরে বালকদের রঙ্গকৌতুক। বাইরে থেকে কোনো বাজীকর পাড়ায় এলে ছেলেদের মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয় তার প্রগলভ প্রকাশ এই অংশে লক্ষণীয়।

৬ অন্নপূর্ণাপ্রদত্ত ভোজ্যে শিবের বালকসুলভ আনন্দের ভাবটি কবি অনুকার শব্দের যোজনায় জীবন্ত করে তুলেছেন :

পায়স পয়োধি সপসপিয়া। / পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া ॥ / চুকু চুকু চুকু চুম্ব চুষিয়া। / কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া ॥ / লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া। / চুমুকে চক চক পেয় পিয়া ॥

সুখাদ্য ভোজনে বালকের উল্লাস শিবের নৃত্যে ধরে রেখেছেন কবি। তার জটাফণী গঙ্গাধারা বাঘছাল ডমরু গালবাদ্য শিঙ্গারব এই আনন্দ-অবশতার উপাদান হয়ে ওঠার চিত্রটি বিপরীতের সমন্বয়ে অভিনবত্ব লাভ করেছে।

৭. মানসিংহ খণ্ডে তার সৈন্যদলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তার বর্ণনায় কবি বাস্তব ঝঞ্ঝা-বর্ষণের রূপটিকে একদিকে শব্দবদ্ধ করেছেন, অন্য দিকে বিপদের মধ্যেও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শরসন্ধানে বিরত হন নি :

ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে। / ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে ॥ / কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায়রে গোঁসাই। / এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই ॥ / বৎসর পনর ষোল বয়স আমার। / ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার ॥ / হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া। / অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া ॥

৮. মানসিংহ-প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-বর্ণনায় দুই একটি চিত্রাভাস থাকলেও প্রধানত শ্রবণনির্ভরতা আশ্রয় করেছেন কবি।

৯. দিল্লীতে ভৌতিক উপদ্রবের বিস্তৃত বর্ণনায় কবি খুব বেশি উল্লাস বোধ করেছেন ; ভাষা-ব্যবহারে, ছন্দের নৃত্যে, শব্দার্থভেদী চাপা হাস্যে তা সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে।

১০. স্বামীর অধিকার নিয়ে পদ্মমুখী-চন্দ্রমুখীর প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব। মুকুন্দরামের খুল্লনা-লহনার সপত্নীবিদ্বেষ দুটি চরিত্রের মনস্তত্ত্বে এবং যাবতীয় কার্য ও ভাবনায় প্রতিফলিত। সেখানে বাস্তব জীবনবোধকে সহজ রীতিতে ধরে রেখেছিলেন কবি-ঔপন্যাসিকের উপযোগী ক্ষমতা নিয়ে।[১] ভারতচন্দ্র কিন্তু বিশেষ করে দেহমিলনকামী নায়ক এবং অধিকারেচ্ছু নায়িকাদ্বয়ের বক্র ভাষা, বুদ্ধিমার্জিত কলহের প্রতি ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন।

১১. দেবতা কত বিচিত্রভঙ্গীতে মানুষকে ছলনা করে থাকেন, ভক্তের হৃদয় ব্যাকুলতার একটা উল্লেখ্য উপাদানরূপে তাকে মধ্যযুগের কবিরা ব্যবহার করতেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রে এই বিষয়টির একটু বিশেষ ধরনের প্রয়োগ লক্ষ্য করি, এবং ভক্তিবোধের প্রেরণায় তা সৃষ্টি হয় নি। তিনটি ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গটি এসেছে এবং রচনাগুণে চার-পাশের গল্পকথনকে তা ছাড়িয়ে উঠেছে :

ক. কন্যার ছদ্মবেশে হারিহোড়কে দেবীর ছলনা
খ. ব্রাহ্মণ বধূরূপে দেবীর ঈশ্বরী পাটনীকে ছলনা
গ. অন্নদার জরতী বেশে ব্যাস ছলন।

চরিত্রের বক্রতা হিসেবে এই অংশগুলি উল্লেখযোগ্য। কৌতুক কৌতূহল, ভাষার চাতুর্য, বোঝা-না-বোঝার মায়ালোক সৃষ্টি, প্রত্যাশা ও অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বজাত কিছু আকস্মিকতা, শব্দের অর্থদ্বৈধ এদের শিল্পোৎকর্ষ দান করেছে। মনে হয় ভাগ্য-প্রতারিত কবি বারবার এই ধ্রুবপদটি উচ্চারণ করার প্রেরণা পেয়েছেন নিজের ব্যক্তিজীবনের অভ্যন্তর থেকে এবং কৌতুকাদির সংযোগে তাকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন শিল্পীর শক্তিতে।

১২. ক্ষুদ্র চরিত্রের স্থির চিত্র, কোনো বৃহৎ চরিত্রের বিচ্ছিন্ন কতগুলি অংশ

১ আমার 'কবি মুকুন্দরাম' দ্রষ্টব্য।

ভারতচন্দ্রের হাতে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। বলা চলে না সেগুলি সর্বদা বাস্তব, কিংবা বাস্তব ভাবে জীবন্ত, কিন্তু তারা আকর্ষণীয়, তাদের থেকে চোখ ফেরান যায় না। তাদের ভোলা যায় না। এরূপ কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হচ্ছে :

ক. নারদ। ভাঁড়, ঘটক, কলহসূচক গ্রাম-বৃদ্ধের প্রচলিত রূপ। লেখকের মৌলিক ভাবনা না হলেও কৃষ্ণকীর্তন থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি পর্যন্ত প্রাপ্ত জনপ্রিয় টাইপটি সার্থকভাবে ধৃত।

খ. ক্রন্দনরতা রতি। তৎকাল-প্রচলিত খেঁড়ুগানের কোনো নটীর ব্যঙ্গ-রূপ।

গ. শিবের কতকগুলি পৃথক পৃথক চিত্র। সব মিলে একটা পূর্ণরূপ গড়ে না উঠলেও স্বতন্ত্র চরিত্র-চিত্রগুলির উপভোগ্যতা অসাধারণ। আগেই সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—দশমহাবিদ্যা দর্শনে ভীত ও বিস্মিত শিব। শিবের প্রলয়সজ্জা ['মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে' ইত্যাদি]। সিদ্ধি ভক্ষণে নেশাযুক্ত শিব। শিবের ভিক্ষা এবং বালকদের রঙ্গের মধ্য দিয়ে শিবের মধ্যে একটি গ্রাম্য বাজীকর মূর্তির আভাস। শিবের ভোজনানন্দ ও নৃত্য।

খ বৃদ্ধ হরিহোড়ের চতুর্থ পক্ষের তরুণী ভার্যা কলহনিপুণা সোহাগীর চিত্র :
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ। / এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥

গ. এক দয়াপরায়ণা বৃদ্ধার ছদ্মবেশে দেবীর চিত্র, হরিহোড়ের দারিদ্র্যমোচন সূত্রে। চাপা কৌতুকে ছলনায় জড়িত, বাস্তবতা-বিকৃতি-মিশ্রিত চরিত্রের স্থির ছবি।

ঘ. কৌতুকপরায়ণা এক ব্রাহ্মণবধূর ছদ্মবেশে অন্নদার ছবি, ঈশ্বরী পাটনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। শ্লেষ অলঙ্কারের ব্যবহারে এই চরিত্রভঙ্গীটি আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঙ. সরল মাঝি ঈশ্বরীর প্রাণবন্ত রূপ; বিশেষ করে দেবীর কাছে তার বর প্রার্থনায়—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এই চরিত্র হয়ে উঠেছে তাৎপর্যময়।

চ. ব্যাস-ছলনাকালে দেবীর জরতী বেশ। একটি পৃথক স্থিরচিত্র, দৈহিক ও বৌদ্ধিক বিকারে তাৎপর্যপূর্ণ। আপাত ভারসাম্যহীনতার চিত্রটি আকর্ষণীয়।

ছ. ব্যাসের চরিত্র—তুলনায় দীর্ঘস্থান অধিকার করে আছে। তার চরিত্র বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশমান। বিদ্যাসুন্দরের বাইরে এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ চরিত্রাঙ্কনে লেখক উৎসাহ বোধ করেছেন। ব্যাস মহাভারত রচয়িতা, পুরাণাদির স্রষ্টা, পরম বৈষ্ণব—এ সব কথা কবি মনে রাখতে চান নি, পাঠকদেরও তাই তা ভুলতে হবে। অত্যন্ত অস্থিরমতি, তীব্র সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, স্বভাবত ক্রোধী, প্রতিশোধ-পরায়ণ ব্যাস একটি জীবন্ত মানুষ। যে ধর্মমত তাকে আশ্রয় দিতে পারে না. সেই মতকে শ্রদ্ধা অর্পণেও তার রুচি নেই। পরম বৈষ্ণব

থেকে সোচ্চার শৈব শিবির বদলাতে সে নির্দ্বিধা। শান্ত ও নিশ্চিন্ত ধর্মবিশ্বাসে তার রুচি নেই। যখন সে বৈষ্ণব তখন ঘোরতর শৈব-বিদ্বেষী, আবার শৈবপন্থা গ্রহণ করলেই সে ভীষণ বিষ্ণুবিরোধী। উত্তেজিত এই মানুষটি মধ্যযুগের তাবৎ সাহিত্যকর্মে একটা স্বতন্ত্র ধারার ব্যক্তিত্ব। সহজ ভক্ত এবং ধীরোদাত্ত বা ধীরললিত নায়কাদির চরিত্রাঙ্কনে ভারতচন্দ্রের রুচি ছিল না, কিন্তু ক্রুদ্ধ উত্তেজিত ও কিছুটা বিকৃত স্বভাবের ব্যক্তি রূপে পরিকল্পনা করে ব্যাসকে তিনি শিল্প-সাফল্য দান করেছেন।

ঞ. ভবানন্দ কতকটা ভ্রমণশীল দর্শক চরিত্র। দিল্লীর বাদশাহের আক্রমণের সামনে হিন্দু ধর্মের পক্ষে তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ যতটা ভবানন্দের ব্যক্তিচরিত্রে ওতপ্রোত তার চেয়ে অনেক বেশি লেখকের নিজ যুক্তির আরোপ। বিদেশ থেকে ভবানন্দ বাড়ি ফিরে এলে দুই স্ত্রীই তার সঙ্গ কামনা করল। তখন কবি নায়কের মনোভাবের এক আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছেন। কামশাস্ত্র-রসশাস্ত্রে[১] বর্ণিত নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন অবস্থা ও লক্ষণের উদাহরণ হিসেবে ভবানন্দ নিজেকে এবং পত্নীদ্বয়কে অনুভব করেছে। প্রৌঢ় নায়কের কামুকতা একটা বুদ্ধিপরিশীলিত রসিকতায় সমুত্তীর্ণ। ভবানন্দের মনের এই অস্বাভাবিক চিত্রটি কবির আশ্চর্য পরি-কল্পনারূপে গ্রহণযোগ্য :

প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে / দুহে ছিলা দুঃখ সয়ে / আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা। /
কার ঘরে যাব আগে / উৎকণ্ঠিতা এই রাগে / দেহুড়ীতে অভিসার কৈলা॥··· /
স্বাধীনভর্তৃকা ইনি / প্রোষিতভর্তৃকা তিনি / আমি হৈনু অপূর্বনায়ক। ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে অন্নদামঙ্গল কাব্যের আঙ্গিক এবং ভারতচন্দ্রের জীবনবোধ সম্বন্ধে দুটি সিদ্ধান্ত করা চলে।

এক. গোটা গল্প বলার জন্য প্রযুক্ত আখ্যানকাব্যের প্রচলিত রীতিকে তিনি ভেঙে একটি নূতন কথনভঙ্গী প্রবর্তন করলেন। যত জোরের সঙ্গে পুরাতন আঙ্গিক ভাঙা হলো, তত সার্থকভাবে অবশ্য নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। তবে তার আদলটি কবি ধরে দিয়েছেন। এই কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো :

ক. প্রতিটি অধ্যায়ের আরম্ভে একটি করে গান। গানটিতে অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়বস্তুর ভাবাকর্ষণ, মূল সুর বা তাৎপর্যটি ধরে দেওয়া হয়েছে। ভক্তির ভাবও আছে কোনো কোনো গানে। তার দ্বারা অবশ্য কবির ব্যক্তিগত ভক্তিব্যাকুলতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই শতাব্দীতে শাক্তগীতির যে নব্যধারা সূচিত হয়েছিল তাতে ভারতেরও কিছু দান ছিল। এবং এই গানগুলি ততখানি ভক্তির উৎসে জাত নয়, যতটা শিল্পবোধে সৃষ্ট। কারণ কাহিনীর প্রথম খণ্ডে প্রধানত দেবীমাহাত্ম্য কীর্তিত হলেও, বিদ্যাসুন্দরে এই গানগুলি প্রায়ই প্রণয়-সঙ্গীত, মানসিংহ পালাতেও নানা ধরনের গানই প্রযুক্ত। আখ্যান-বর্ণনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য। গান দিয়ে অধ্যায় আরম্ভ করায় যেন শ্রোতা-পাঠকের মনোযোগ বাইরের বহুমুখিতা থেকে কাহিনীর

১ এই প্রসঙ্গে স্বয়ং কবির লেখা 'রসমঞ্জরী'র কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

দিকে আকর্ষণের চেষ্টা। মনে রাখা যেতে পারে এ কাব্যও গান ও সুরেলা আবৃত্তি তথা কথকতা অর্থাৎ পুরাতন অষ্টমঙ্গলার রীতিতে পরিবেশন করা হয়েছিল। রচনার কালে কবির সামনে সেই পরিবেশনপদ্ধতি স্পষ্ট ছিল।

খ. গানে কাহিনী-কথন আরম্ভ। আগেই বলেছি কবির অনায়াসসিদ্ধ ভাষার সুমার্জিত কান্তি এবং শাস্ত্রালাপের পাণ্ডিত্য বাদ দিলে অতি মামুলীভাবে গল্প এগিয়েছে। যেন ঢিমে তেতালায় পাঁচালি গান চলছে। তারই মাঝে মাঝে কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ, বর্ণনা বা চিত্ররচনা কিংবা চরিত্রভঙ্গী প্রদর্শনে অনেক রঙ, ছন্দঝঙ্কার, উত্তাপ ও উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে। যেন কাহিনীর সূত্রে কবি কতকগুলি বিশেষ খণ্ড-চিত্রের মালা গেঁথেছেন। পাঠক বা শ্রোতা ঢিলেঢালা অনাকর্ষণীয় বা সুপরিচিত কাহিনী-স্রোতে অলসভাবে অবগাহন করতে করতে হঠাৎ যেন নাট্যবৈদ্যুতিতে চমকে উঠেছে,—কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে কাহিনীর প্রয়োজন ও ফ্রেম ছাড়িয়ে সামনে চলে এসেছে। যেন গায়ক বা কথকঠাকুর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে হাতের চামর-মন্দিরা নিয়ে নৃত্য জুড়ে দিয়েছেন।

এই অভিনব ভঙ্গী অনুসরণ করার ফলে কাহিনী বিষয়ে প্রচলিত কৌতূহল বা আকর্ষণের বদলে বিশেষ স্থানগুলির উপরে পাঠক-শ্রোতার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। ফলে ক্ষীণপ্রাণ কাহিনীর মধ্যেও নূতন একটি অর্থের দ্যোতনা এসেছে। অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বিশিষ্ট জীবনবোধের সঙ্গে এই আঙ্গিক-চেতনা ঘনিষ্ঠ ভাবেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সেই বিষয়ে প্রবেশের আগে 'মানসিংহে'র আঙ্গিক-ঘটিত অপর একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকানো যাক।

ভবানন্দের দিল্লীগমন এবং রাজা হয়ে দেশে ফিরে আসা এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। কবি ভ্রমণ-বিবরণকে আখ্যানের মধ্যে একটা বিশেষ জায়গা দিয়েছেন। বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর, কটক, ভুবনেশ্বর হয়ে পুরী গমন। পুরী বর্ণন। কবি নিজে বর্ধমান জেল থেকে পালিয়ে এই পথ ধরেই পুরীতে গিয়েছিলেন, কাজেই এই বিবরণে তাঁর ব্যক্তিগত ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে থাকবে। পুরী থেকে মানসিংহ ও ভবানন্দ দিল্লী গিয়েছে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে, মহারাষ্ট্র গুজরাট হয়ে, মথুরা বৃন্দাবন দেখে। ভবানন্দ দিল্লী থেকে ফেরবার পথে প্রয়াগ অযোধ্যা কাশী ভ্রমণ করে। ভ্রমণ বৃত্তান্তকে কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে আখানকাব্যের একটা নূতন আঙ্গিক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ভারত,—এরূপ মনে করার কারণ আছে।

দুই. ভারতচন্দ্রের আঙ্গিক বিষয়ে যে অভিনব পরীক্ষার কথা আগেই বলেছি এবারে তার আভ্যন্তর তাৎপর্যের খোঁজ করা যাক। আকর্ষণীয়, শিল্পগুণান্বিত এবং উত্তেজক যে অংশগুলির উল্লেখ আমরা করেছি, সেগুলিকে গোটা কাব্যের মামুলী আয়োজনের সিদ্ধিকেন্দ্র বলে গ্রহণ করতে হয়, সেখানে মধুর কোমল পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ, মধ্যযুগসুলভ পরিবারভিত্তিক মানবতায় সহজ আস্থা প্রকাশ পায় নি। একটি বক্র বিদ্রোহ, ভাঙার নেশা, বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ আঘাত লক্ষ্য করা যায়। জীবনের অতি

পরিচিত ভাবাবেগগুলি তাঁর রচনায় প্রশ্রয় পায় নি। আবেগের গাঢ়তা বা হৃদয়-প্রাধান্যকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। জীবনবিষয়ে আংশিকতার বোধ থেকে এসেছে কাব্য-কর্মের এই ভঙ্গী—বিশেষ বিশেষ অংশের উপরে গুরুত্ব আরোপ। জীবনকে একটা নিটোল কাহিনীতে পূর্ণ ও সুবলয়িত করে তোলায় কবির উৎসাহ নেই, তার মধ্যে যে সব চিত্র, চরিত্রভঙ্গী ও প্রসঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ সূচিমুখ ও উত্তেজিত তথা আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠছে তাকেই তিনি বিশেষভাবে সজ্জিত করে পাঠক-চক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন। অন্নদামঙ্গলে একমাত্র ঈশ্বর পাটনী ছাড়া সহজ, স্বাভাবিক মানুষ ও অবিকৃত হৃদয়ানুভূতি ঔজ্জ্বল্য লাভ করে নি। দরিদ্র হরিহোড়ের অন্নসংস্থান চেষ্টায়ও কোনো বর্ণসম্পাত ঘটে নি। অস্বাভাবিক জীবনপরিবেশে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্র জীবনের যে রূপ অনুধাবন করেছিলেন তাতে সততা কোমলতা পবিত্রতা সৌকুমার্য অশান্তি প্রভৃতি গুণাবলী এবং আবেগমূলক মনোবৃত্তিগুলির মূল্য ছিল না। তাঁর আবিষ্কৃত কাব্যরীতির অসরল, অপূর্ণাঙ্গ বিশিষ্টতার মধ্যে এই জীবন-বোধ যেমন প্রতিফলিত, তেমনি লক্ষণীয় কবির অতিসচেতন শিল্পচেতনাজাত অভিনব এক আঙ্গিকের অনুসন্ধান—জীর্ণ পুরাতন কাব্যরচনরীতি পরিহার করা।

পাঁচ বিদ্যাসুন্দর

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী উদ্ভাবনে ভারতচন্দ্রের মৌলিকতা নেই, কিন্তু এই গল্পটির নির্বাচন তাঁর পক্ষেই সবচেয়ে স্বভাবসঙ্গত। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য রচনার জাতিগত বা প্রেরণাগত কোন মিল নেই। সে বই পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না রামপ্রসাদ কার লেখার উপরে মক্‌স করেছেন।

ভারতচন্দ্র এ গল্পের কাঠামোটি প্রচলিত কাহিনী থেকে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিন্যাসে, ভাষা ও ছন্দঘটিত সংস্থানে, চরিত্রগুলির নির্দিষ্ট চেহারাদানের মধ্য দিয়ে একান্ত নিজস্ব কাব্যই গড়ে তুলেছেন। এই কাব্যটিতে ভারতচন্দ্রের জীবনবোধের অন্তার্থক দিকটি পূর্ণভাবে পাঠ করা যায়। অথচ রিরংসা প্রকাশক কাব্য হিসেবে অভিযোগ তুলে এই সন্ধানের পথ প্রথমেই রুদ্ধ করে দেওয়া হয়ে থাকে।

বিদ্যাসুন্দরে দুবার সম্ভোগ বর্ণনা আছে, সম্ভোগ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে আরও অনেকবার। বৈষ্ণব পদাবলী সহ মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও অল্পাধিক সম্ভোগের চিত্র আছে। অবশ্য বেশি আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম তত্ত্বলোকের বলে তাকে কামাতীত দেহাতীত রূপে দেখা আমাদের সংস্কার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং বিদ্যাসুন্দর দুটি রচনাই অশ্লীলতার দায়ে নিন্দিত হয়েছে। মধ্য-ভিক্টোরীয় নীতিবাগীশতার প্রভাবেই এরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু খোলা মনের শিল্প বিচারে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করতে হবে। বড়ু চণ্ডীদাসের কবিতায় দেহমিলনের বর্ণনাগুলি মানস বিবর্তনের কারণ ও ফল দুই-ই। আর ভারতের সম্ভোগবর্ণনা ঘিরে ছন্দের লাস্যনৃত্য, ভাষার কোমল-মোহন বর্ণাঢ্য সজ্জা। আদ্যন্ত যৌবনের চাঞ্চল্য,

উদ্ভাবন-বৈচিত্র্য ; উল্লাসে-কৌতুকে মানে ছলনায় বাক্‌চাতুর্যে দুটি তরুণ চিত্ত ময়ূরের মতো পেখম মেলে ধরেছে। প্রণয়ী-যুগলের আলাপে বিলাসে প্রকৃতি-আবাহনে বেশবদলে কবিতার লড়াইয়ে মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মিলে যদি দেহধর্ম না থাকত, তীব্র প্যাসন না থাকত তাহলে রক্ষণশীলেরা খুব খুশি হতেন, কিন্তু কবি নিরক্ত মিথ্যাচার ও জীবনবিমুখতায় অপরাধী হতেন।

কবি ভারতচন্দ্র গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ টেনে খুলে দেন। যে কালে গোটা সমাজ-জীবনে ও সাহিত্যচর্চায় জরা ও জড়ত্বের রাজত্ব, প্রথায়-নিয়মে-ভক্তিতে-মোক্ষবাসনায় মানবাত্মা বন্দী, তখন ভারতচন্দ্র বারংবার সেই জীবনবোধ ও সাহিত্যরীতিতে আঘাত করতে চেয়েছেন লঘু-চতুর-তির্যক মনোভাব নিয়ে,—ব্যঙ্গে তাকে বিপর্যস্ত করেছেন, ভৌতিক তাণ্ডবে তার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। এবং সেই সব বিদ্রূপাদি তথা প্রলয়কলরোলের মধ্যে ঐ চতুরতামিশ্রিত একটি লঘু কিন্তু গাঢ় প্রণয়কথায় কবি কামালোক সৃষ্টি করেছেন। যৌবন প্রেমের সেই দেহধর্মী সহাস্য জগতটি বৃদ্ধের গম্ভীর মুখোস ছিঁড়ে কেন্দ্রীয় সত্য হয়ে উঠেছে।

সুন্দর এবং বিদ্যার চরিত্রাঙ্কনে কবি-ভাবনাই জয়যুক্ত হয়েছে। গুণসিন্ধু রাজার ছেলে সুন্দর অনায়াসে ভাটের সঙ্গে বর্ধমানে যেতে পারত পরীক্ষায় জিতে বিদ্যাকে লাভ করার চেষ্টায়। প্রথামত সেই কাজে সে রাজী হল না—এটুকু প্রচলিত কাহিনী থেকেই কবি পেয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যার কথা শুনে তার রূপের বর্ণনা আর বিদ্যার অভিমান শুনে সুন্দর যে ভাবে, না দেখেই, নায়িকার প্রেমে পড়ে গেল তার ছবিটি ভারতচন্দ্রের ভাষায় বিশেষভাবে তীব্রতা লাভ করেছে। তাতে রক্তের চাঞ্চল্য তরঙ্গিত হয়ে শব্দে শব্দে বেজে উঠেছে :

> বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ। / বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ তপ ॥ / হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব। / কি বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যাবিদ্যমানে যাব ॥ / কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট। / খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥ / প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে। / খোয়াব তনুর তরি প্রবাস সাগরে ॥

বিদ্যা কথাটির চারপাশে তার মনের ভ্রমরসদৃশ গুঞ্জরণ শব্দটির বহুল পুনরাবৃত্তিতে ধরে রেখেছেন কবি।

সুন্দর সম্বন্ধে কবির দ্বিতীয় বিশিষ্ট ভাবনাটি হলো সে কবি। তার রাজপুত্র পরিচয় সে নিজেই গোপন করেছে। আচার-আচরণে-পোশাকে-ভূষণে তা প্রকাশ পায় নি। কাব্যরচনা করে সে বিদ্যার মন ভুলিয়েছে, কবিতায়-ফুলে-কামদেবতায় তিনটি উপাদানে মিলে তার প্রণয়পত্র রচিত হয়েছিল। ভারত নিজে কবি, কবি দরিদ্র হলেও 'বিহারের প্রভু'। এক কবিপত্নীর মুখে তিনি শুনিয়েছেন :

> মহাকবি মোর পতি কত রস জানে। / কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে ॥ / পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে। / চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি

সারে ॥ / কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার / কতমত করে রতি বলিহারি তার ॥ / শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু । / কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু ॥

সুন্দর রাজপুত্র, তার দারিদ্র্য নেই ! কিন্তু তাকে কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেই ভারতচন্দ্র নায়কত্ব দান করেছেন ।

সুন্দরের তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্য ভারতের সচেতন সৃষ্টি তা হলো বন্দী অবস্থায়ও নিজের যথার্থ পরিচয় গোপন করা । তার ব্যক্তিগত 'দেমাগ'-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে । এ বিষয়ে সুন্দরের কথা উদ্ধৃত হলো :

নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে ॥ / চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে । / উচ্চ জাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে ॥ / তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ । / তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ ॥

অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা, রোমান্টিক প্রণয়াভিলাষ—ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত এই সব বিষয়ের সঙ্গে পূর্বোক্ত উপাদানের মিশ্রণ ঘটিয়ে ভারতচন্দ্র মুক্ত প্রণয়ীরূপে সুন্দরকে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়লোলুপতা থেকে স্বতন্ত্র একটা ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ।

বিদ্যার চরিত্ররূপেও কবি শুধু 'তীনভুবন-মনমোহিনী-রতিরসকামমোহিনী'-এর ছবি আঁকেন নি । গোপন প্রণয়ের মাদকতা, শিক্ষার দর্প, কুলশীল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিচার হবার ক্ষমতা, বুদ্ধিচাতুর্যের সহযোগ তার তরুণলাবণ্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সহযোগ ঘটিয়েছে ।

ভারতচন্দ্রের জীবনবোধ যে বিদ্যাসুন্দরে একটা নতুন মাত্রালাভ করেছে তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যানের সুযোগ থাকলেও এখানে মূলসূত্রগুলির প্রতি মাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো ।

ভারতচন্দ্রের ভাষাশিল্প মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে শুধু নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে নি, সুস্পষ্টভাবে একটি পরিণত স্টাইলের নিদর্শন হয়ে উঠেছে । এ-বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকারচনা সম্ভব বলে মনে করি । এখানে তার প্রধান কয়েকটি দিকের সূত্র-নির্দেশ মাত্র করা হলো ।

এক. বাংলা বুলি বা ভাগীরথীকেন্দ্রিক কথ্য-ভাষাভঙ্গীকে মার্জিত করে কাব্যদেহ নির্মিত । ফলে দেশি ইডিয়মের ব্যবহার, প্রবাদ-প্রবচনের প্রযুক্তি এত সার্থক ও যথার্থ তাৎপর্যবহ হতে পেরেছে ।

দুই. প্রয়োজনানুরূপ তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার থাকলেও পণ্ডিতী-প্রকাশ থেকে কবি সতর্কভাবে বিরত থেকেছেন ।

তিন. পারসি শব্দের কিছু অধিক প্রয়োগ । তবে প্রসঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রযুক্ত হওয়ায় শিল্পগুণ বরং বেড়েছে ।

চার. শব্দপ্রয়োগে বিশেষত শব্দালঙ্কারের ব্যবহারে ধ্বনি [বা sound]-ময় জগত সৃষ্টির চেষ্টা । শ্লেষ এবং যমকের ব্যবহারে শব্দ ও অর্থের প্রথাগত সম্পর্ককে

বাঁকিয়ে চুরিয়ে ফেলা।

পাঁচ. বাক্যবিন্যাসে চাতুর্যের এবং নানাধরনের তির্যকতার প্রতি অতিরিক্ত প্রবণতা।

ছয়. অর্থালঙ্কারের চিত্রাত্মক উপমাদির তুলনায় বুদ্ধিপ্রধান ব্যতিরেক প্রভৃতির অধিক ব্যবহার।

সাত. মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যে প্রথম চিত্রবাহুল্য। বহুক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণ ছবি হয়ে উঠেছে। বিশেষত চঞ্চল ও গতিশীল চিত্রাঙ্কনে কবির বিশেষ সাফল্য ঘটেছে।

কবির ভাষারীতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহযোগে প্রমাণ করা যেতে পারে। কবির শিল্পীব্যক্তিত্ব তথা কাব্যধৃত জীবনবোধের যে পরিচয় আমরা আগে দিয়েছি তার সঙ্গে এদের কার্যকারণ সম্পর্কটিও আশাকরি সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না।

ছয় ছোট ছোট কবিতা

ভারতচন্দ্রের ছোট কবিতার মধ্যে দুটি সত্যপীরের ব্রতকথা। হুবহু এক কথাবস্তু, ভিন্ন ছন্দে, শব্দব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যে দুটি আলাদা কবিতা হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্র কবি হিসেবে পরিণতিলাভের আগে এই ব্রতকথা দুটি লিখেছিলেন, কিন্তু কবির এই প্রথম রচনা দুটিতে কোনো উচ্চ শিল্পগুণ বা বিশিষ্টতা প্রকাশ না পেলেও এবং প্রকাশ পাবার সুযোগ না থাকলেও কবির শিল্প-চেতনার প্রাথমিক নিদর্শন এর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমেই লক্ষ্য করার মতো কাহিনী-কথনের দ্রুত চাল। এর ফলে কোনো ঘটনা এবং পরিস্থিতিই রসপুষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ঘটনার ছুটে চলা পাঠকশ্রোতার মনের অলসতা ভেঙে সচকিত করে তোলে। গতির এই দ্রুততা দ্বিতীয় কবিতার চৌপদী ঢঙে একটা দুলকি চাল আশ্রয় করে আরও প্রকট হয়েছে। অতি পরিচিত গতানুগতিক ব্রতকথাকেও আবেদনের দিক থেকে অভিনব করে তোলার চেষ্টা কবির শিল্পবুদ্ধির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

দ্বিতীয়ত, বস্তু ও বিন্যাস অভেদ রেখেও পারসি শব্দের কুশল প্রয়োগে এবং চৌপদী ঢঙের সংযোজনে দ্বিতীয় কবিতাটি পৃথক স্বাদ পেয়েছে। প্রথমদিকের কাব্য-চর্চাতেই শব্দের ও ছন্দের এই শক্তি কবি লক্ষ্য করেছেন। একই উপাদান এদের সহযোগে ভিন্ন কাব্যবস্তু হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের জগতে এ একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

ছোট ছোট অন্য কবিতাগুলি অবশ্যই কবির পরিণত প্রতিভার ফসল। হয়তো সবগুলিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিপালক ভূস্বামীর আজ্ঞায় রচিত। কোথাও রাজার মনোরঞ্জন-বাসনা প্রেরণা হলেও কবির কল্পনা ও সৃষ্টিধর্ম বিরূপতা করে নি। সেই রচনাগুলি শিল্পসিদ্ধ। কিন্তু যেগুলি মাত্র ফরমায়েসী বস্তু সেখানে কিছু ব্যঙ্গ

কিছু চাতুর্যমাত্র প্রকাশিত। সে-সব কবিতা-লেখাও খেলা মাত্র।

হিন্দীতে, সংস্কৃতে বাংলা সংস্কৃত-পারসি মিশ্র ভাষায় কবিতা লেখার পেছনে রাজসভায় বাহাদুরি নেওয়া, নিজের বহু ভাষাজ্ঞান জাহির করার [অর্থাৎ 'পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি'] ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রশ্নও কি মনে জাগে না পরবর্তীকালে মিশ্রভাষার সাহায্যে কোনো নব্যরীতির কাব্যরচনার পাঁয়তারা কি এই সব ক্ষুদ্র কবিতায় শব্দবিদ্ কবি ভারতচন্দ্র করছিলেন। এরূপ একটি ভগ্নরচনার নিদর্শন আছে চণ্ডীনাটকে। এবং শুধু সংস্কৃতভাষায় কবিতালেখায় তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে কবির শেষ দিকের লেখা নাগাষ্টক ও গঙ্গাষ্টক কবিতায়।

বলিরাজার উক্তি, বৃন্দাবলীর উক্তি কৃষ্ণচন্দ্রের হুকুমে পুরণ করা কবিতা। 'পায় পায় পায় না' এবং 'পায় পায় পায়' এই দুটি কথায় মিল দিতে হবে দুটি কবিতার শেষে—এই নির্দেশেই যথাক্রমে আলোচ্য কবিতা দুটি লিখেছিলেন। এই কবিতা দুটিতে কবির উপস্থিত বুদ্ধি, দ্রুত উদ্ভাবনী ও রচনা শক্তির পরিচয় আছে। সম্ভবত 'কাদ্দোরফথ' কথাটিকে ধরেও এইভাবে রাজকীয় অলস বিলাসিতাকে সাহচর্য দেবার জন্যই ঐ পঞ্চপদী কবিতা রচিত। এদের অন্য কোনো মূল্য নেই। কিন্তু এইসব স্বতন্ত্র কবিতায় কবিগান ও তরজা রচনা শক্তির প্রাক্‌রূপ দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতা দুটিও সম্পূর্ণতই এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। এর সুরে খেউড়ের অতি চটুলতা ['আ আরে মামী' 'আ আরে ভাগিনা' প্রভৃতি বাক্যে] লক্ষ্য করা যায়।

'ধেড়ে ও ভেড়ে' একটি ফরমায়েসি কৌতুক-কবিতা হলেও কবির ব্যঙ্গ-নৈপুণ্য তথা কিছু ব্যক্তিগত অভিপ্রায় এই কবিতায় প্রকাশ পেয়ে থাকবে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নারীদের পতিনিন্দা বর্ণনার ছলে রাজসভার বিভিন্ন কর্মচারীর প্রতি কটাক্ষপাতের সুযোগ করে নিয়েছিলেন কবি। ব্যক্তিগত ক্রোধ ঘৃণা প্রতিহিংসা প্রভৃতি ঐ কবিতায় তাঁর ব্যঙ্গকে শাণিত করে তুলেছিল। কিন্তু যে কোনো কারণে রাজসভার বিদূষক বা ভাঁড়টি সেখানে রেহাই পায়। বর্তমান কবিতায় রাজবাড়ির পোষা ধেড়ের বর্ণনা করতে গিয়ে ভাঁড়ের চরিত্র বিদ্রূপবাণবিদ্ধ করেছেন :

> ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে ধেড়ের বিক্রম বুকে / ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে / জল স্থল নেড়ে ॥

কবির ক্রুদ্ধমনের এই ছন্দোবদ্ধ নিদর্শন অবশ্যই কবিতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণের জ্বালা এতে এতই তীব্র।

ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ তথা শিল্পগুণ দুদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য চারটি—'বসন্তবর্ণনা,' 'বর্ষাবর্ণনা', 'হাওয়ারবর্ণন', 'বাসনাবর্ণনা'। আধুনিক গীতিকবিতার স্পষ্ট পূর্বরূপ এদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। কবিতাগুলি সম্পূর্ণ ধর্মভাবমুক্ত। কবিচিত্তের কথাই এদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। ভারতচন্দ্র

যে শুধু আঙ্গিক-সচেতনই ছিলেন তা নয়, প্রচলিত কাব্যরীতিতে তাঁর ছিল গভীর অস্বস্তি। নানা দিক থেকে তাকে ভেঙেছিলেন কবি, নতুন কিছু গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আখ্যানকাব্যের বাইরে নব্যরীতির [বৈষ্ণব ও শাক্ত পদের সঙ্গে যার কোনো সম্বন্ধ নেই] খণ্ডকবিতার খোঁজও তিনি পেয়েছিলেন, এগুলি তারই নিদর্শন।

বসন্ত বা বর্ষা-প্রকৃতির কিছু ছবি আছে কবিতাদুটিতে। হাওয়াবর্ণনে কবি প্রকৃতি বিষয়ে আরও বস্তুনিষ্ঠ। বসন্তে বা ঝড়ে হাওয়ার বিচিত্ররূপের, বদ্ধ হাওয়া গুমটের ছবি তিনি এঁকেছেন। প্রলয়বিলাসী কবি ঝড়ের বর্ণনায় সবচেয়ে সার্থক :

কখনো দারুণ ঝড় / শাখী উড়ে পাখী জড় / ঘর ভাঙে উড়ে খড় / নাহি যায় চাওয়া / বেগ কে সহিতে পারে / মেঘ স্থির হতে নারে / হুলস্থুল পারাবারে / প্রলয়ের দাওয়া ॥

যদিও তাঁর স্বভাবসুলভ অগম্ভীর মনের স্পর্শ সেখানেও বর্তমান, কিন্তু পরবর্তী কালের কবি ঈশ্বর গুপ্তের চেয়েও তিনি প্রকৃতির স্বাধীন রূপ এঁকেছেন এবং মানবহৃদয়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে চেয়েছেন। মানবচিত্তের যে উদ্দাম আবেগ-গাঢ়তায় ভারতচন্দ্রের বিশ্বাস সেই কাম বা প্রেমই প্রকৃতির স্পর্শে বর্ষায় বসন্তে মলয় বাতাসে উদ্বুদ্ধ, এবং মানবসাধারণের মনোভাবের কথা ছাপিয়ে তিনি তাঁর নিজের হৃদয়কেই বার বার এগিয়ে দিয়েছেন সামনে, যেমন, বসন্ত প্রসঙ্গে :

অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি / শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি। ভারতেরে ভুলাইলি / আ আরে বসন্ত ॥

[ভণিতায় নিজের নামোল্লেখ কৌশলমাত্র থাকে নি, আধুনিক লিরিক-সুলভ কবি-ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ সূচিত করেছে।] বর্ষা প্রসঙ্গে তো কবি নিজের কাহিনীই স্পষ্টতর ভাষায় বলেছেন। বর্ষায়ও প্রিয়া-সমাগমের যে আশা ছিল তা মিটল না বলে কবি আক্ষেপ করেছেন :

পুণ্যা বাদে যাব ঘর / সেই ছিল ভর্সা / বসন্ত নিদাঘ শেষ / পুন তোর পরবেশ / ভারত না গেল দেশ / আ আরে বর্ষা ॥

এই আত্মকথনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'বাসনাবর্ণনা'। এ কবিতায় ভারতচন্দ্র রোমান্টিক কামনার স্বর্গ এবং বাস্তব অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বে ব্যথিতচিত্ত। যদিও এখানে এবং অন্যত্র নিজ প্রকৃতিবশে কবি আবেগকে স্পর্শমাত্র করে চাতুর্যযোগে চাপা দীর্ঘশ্বাসটি সামলে নিয়েছেন, তাকে গাঢ়তায় নিমজ্জিত হতে দেন নি। তাই এখানে অপ্রাপ্তিজনিত রোমান্টিক হাহাকার নেই। এবং সেখানেই কবির স্বধর্ম।

□

৬. বিবিধ

৬১. আলাওল / পদ্মাবতী

এক

আলাওলের কাব্যে হিন্দুভাবের প্রাধান্য সহজেই লক্ষণীয়। ভাষা ও ভাবে তিনি হিন্দুর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্রানুসরণে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা একাধারে কবির উদারতা এবং এদেশীয় নিজস্ব লৌকিক ভাব-ভাবনার প্রতি অতি-প্রবণতার প্রমাণ দেয়।

ভাষা-ভঙ্গিতে সংস্কৃতানুকারিতা মধ্যযুগের বাংলার হিন্দু কবিদের সঙ্গে সহজেই তাঁকে এক শ্রেণীভুক্ত করেছে। এবং তিনি সংস্কৃত ও ফারসীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন। মূলত ফারসী কাব্যের অনুসরণ করেও আপন কাব্যমধ্যে ফারসী শব্দ ব্যবহারে যে সংযত নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। উপমা বা পূর্বকথনে রামায়ণ-মহাভারত বা নাথপন্থী শৈবদের উপাখ্যান থেকে যদৃচ্ছ গ্রহণে তিনি দ্বিধাহীন ভাবে এ দেশীয় প্রাচীন কাব্যকাহিনীর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিয়েছেন। হিন্দুদের বিবাহ, স্ত্রী-আচার, বাসরের বিচিত্র রঙ্গরসিকতার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন হিন্দু সমাজ-জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশের চিহ্ন হিসেবে তা সমালোচকদের বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসা আকর্ষণ করেছে। হিন্দু যোগমার্গে কবির প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল বলে মনে হয়। বৈষ্ণব পদের অনুসরণে কাব্যমধ্যে হৃদয়োচ্ছ্বাস পূর্ণ এগারটি গীতের সংযোজন একদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহ্য ধারার সঙ্গে কবিকে যুক্ত করেছে। অন্যদিকে নাগমতীর বারমাসী প্রভৃতির বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে কবির সম্পর্কের প্রমাণ দিচ্ছে।[১]

সমালোচকেরা আলাওলের কাব্যের এই বৈশিষ্ট্যকে একবাক্যে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে আলাওলের উদারতা ও জাতীয় কাব্য ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি রয়েছে একটি অভিনব প্রত্যাশার সমাধি। এ বৈশিষ্ট্য আলাওলের সুফীবাদী ধর্মীয় উদারতা সম্ভূত হলেও বাংলা কাব্যের ইতিহাসের বিচারে এটি একটি প্রধান দুর্বলতাও।

১ "আলাওলের রচনায় আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প। জায়সীর মত আলাওলও দেশী শব্দ পাইলে বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। দুইজনেই 'বেহেশ্‌ত' না লিখিয়া 'কবিলাস' [অর্থাৎ কৈলাস] লিখিয়াছেন। জায়সী সর্বত্র 'কোরাণ' স্থলে 'পুরাণ' বলিয়াছেন। আলাওলে 'কোরাণ' পাই বটে, কিন্তু মনে হয় ইহা প্রকাশকের বা সম্পাদকের পরিবর্তন, আলাওল 'পুরাণ'ই লিখিয়াছিলেন। জায়সীর কাব্যে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত কাহিনীর উল্লেখ পাই অজস্র। আলাওলও তাহা করিয়াছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও গোপীচন্দ্র-ময়নামতী কাহিনীর ইঙ্গিত উভয় কবিই করিয়াছেন। আলাওলে উপরন্তু বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উল্লেখ আছে।' —ড. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম]।

আলাওল বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবিদের অন্যতম। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের উপমা ও ঘটনার উল্লেখে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য কেবল সমৃদ্ধ নয়, একটু ভারাক্রান্তও। বাঙালি হিন্দুর বিবাহ-স্ত্রীআচার-বারমাসীর বর্ণনায় মধ্যযুগের কাব্যের পাঠক বেশ ক্লান্ত। সংস্কৃতানুগ শব্দাদি অনুসরণের পদ্ধতিও বহু ব্যবহারের ফলে অভিনবত্বহীন। ফারসী কাব্য অবলম্বনে রচিত আপন কবিতায় আলাওল যদি কিছু ফারসী শব্দের [মাত্রা বজায় রেখে, এবং কাব্যরসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে] অধিক ব্যবহার করতেন রসের স্বাদে হয়ত বিচিত্রতা আসত। ভারতচন্দ্রের 'যাবনী-মিশাল' ভাষা বাংলা কাব্যভাষার রাজ্যে আঠারো শতকে যে বিপ্লব এনেছিল সতেরো শতকের আলাওলে তার স্পষ্ট পূর্বসূরীত্ব পেতাম। আর এ বিষয়ে আলাওল যে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহ কি? তিনি বাংলা-সংস্কৃত ও ফারসীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন। বাংলাভাষার স্বরূপশক্তি এবং তার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অবহিত তাঁর মত পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলাভাষার বিশিষ্টতার হানি না ঘটিয়ে নতুন ফারসী শব্দ ব্যবহারে সংযত সার্থকতা দেখাতে পারতেন, এমন বিশ্বাস করা চলে। উপমাদি সংকলনের ব্যাপারেও তাঁর হিন্দু ঐতিহ্যপ্রীতি কিছু কম হলে সম্ভবত মুসলমানী প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ আমাদের উপভোগের সীমানা বাড়িয়ে দিতে পারত।

কিন্তু এই হিন্দু ভাবরূপের প্রতি অধিক আকর্ষণের ফলে আলাওল বাংলা সাহিত্যকে যে প্রধান সম্পদ থেকে বঞ্চিত করলেন তা হল স্বকালের বাঙালি মুসলমানের সমাজ ও পরিবার-জীবনের চিত্র। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের জীবন-চর্যার মধ্যে যে নানা কারণে কিছু কিছু পার্থক্য বর্তমান—এ কথা স্বীকার করে নিতে হয়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে হিন্দু সমাজের নানা স্তরের জীবন-কাহিনীর বর্ণনা থাকলেও মুসলমানদের কথা প্রায় অনুপস্থিত। বিজয় গুপ্তের বিরোধী মনোভাব প্রসূত হাসান-হোসেন পালায় কিংবা মুকুন্দরামের নবনির্মিত গুজরাট নগরে তাদের ভূমিকা বর্ণনার সংক্ষিপ্ত সামান্যতায় বাঙালি মুসলমানের জীবনলীলার বিচিত্রতা প্রতিফলিত হয় নি এবং তার অভিনব রসাস্বাদ থেকেও বাঙালি পাঠক বঞ্চিত হয়েছে। হিন্দু কবি-সাহিত্যিকেরা মুসলমান সমাজের অন্তরঙ্গ জীবন ও মননের দিকে তো ফিরে তাকানই নি, মুসলমান কবি আলাওল তাঁর পদ্মাবতীতে হিন্দু জীবনচর্যা, ভাব-ভাবনা, ভাষারূপ ও রীতি এবং কাব্য-ঐতিহ্যের অনুসরণ করেই প্রশংসা কুড়িয়েছেন; কি বিপুলতর সম্ভাবনার দ্বার যে তিনি রুদ্ধ করে দিলেন তার বিচার আজও হয় নি। 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে' মুসলমান পাত্রপাত্রীর কাহিনী বর্ণিত হলেও সমাজ-জীবনের পটভূমিটি বাস্তবতা-বর্জিত। তাই 'পদ্মাবতী'র ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের প্রশ্নই ওঠে না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র কয়েকটি পালা ব্যতীত মুসলমান জীবনের ঘনিষ্ঠ চিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না। বাংলা সাহিত্যধারার এই অভাবজনিত দুর্বলতার অনুসরণ একাল পর্যন্ত ঘটে চলেছে। এর কিছু দায়িত্ব যে

আলাওলের মত সেকালের অত বড় শক্তিমান মুসলিম কবিতে বর্তায় তাতে সন্দেহ কি ?

দুই

আলাওলের পদ্মাবতী প্রেমের কাব্য—রোমান্টিক প্রণয়গাথা বলে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার সঙ্গে এর একটি প্রধান পার্থক্য ধর্ম সম্পৃক্তির অভাবে।

আলাওল সুফী মতে বিশ্বাসী ছিলেন। জায়সীর মূল কাব্য 'পদ্মাবত' আসলে সুফী ধর্ম-সাধনার রূপক মাত্র। এই রূপকটি কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন কাব্যের সমাপ্তিতে—'চৌদ্দভুবনের সব কিছু আছে মানুষের ঘটে। চিতোর হইতেছে মানবদেহ, রাজা রত্নসেন মন, সিংহল হৃদয়, পদ্মাবতী [পদ্মিনী] বুদ্ধি, শুক পথ নির্দেশকারী গুরু, রত্নসেনের প্রথম পত্নী নাগমতী দুনিয়া-ধান্দা, রাঘবচেতন শয়তান, আলাউদ্দীন-সুলতান মায়া'।[১] আলাওলের কাব্যে এ ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু কাব্যের শুরুতে প্রেমতত্ত্ব নিয়ে যে সুগভীর বিরহানুভূতির কথা কবি বলেছেন তা সুফীবাদ-সম্মত। এবং অনেকের মতে আলাওলের কাব্যের প্রাপ্ত সংস্করণগুলির শেষাংশ প্রক্ষিপ্ত বলেই এ অংশটি মিলছে না। মূল কাব্যের পুথি পাওয়া গেলে এ ব্যাখ্যা অবশ্যই মিলত। যে কোন দিক দিয়েই হোক আলাওলের 'পদ্মাবতী' নিশ্চিতভাবে সুফী সাধনার রূপক-সীমায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেলে ধর্ম-অসম্পৃক্ত কাব্য হিসেবে এর দাবি নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু আলাওলের কাব্য এ রূপকের ব্যাখ্যাকে ছাপিয়ে উঠেছে। নাগমতী দুনিয়া-ধান্দা হলে, রত্নসেনরূপ মন পদ্মিনীরূপ বুদ্ধিকে আয়ত্ত করবার পরেও তার ক্রন্দনে ব্যাকুল হয়ে তার সঙ্গে নিশাযাপন করেন কি করে? বুদ্ধি ও দুনিয়া-ধান্দার ঐরূপ সখীত্ব সম্পর্কেরও বা কি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? তা ছাড়া মায়া-রূপ আলাউদ্দীন মানবদেহ আক্রমণ করে মনের কাছ থেকে বুদ্ধিকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু গোরা-বাদলের বীরত্ব বা জীবন দান কোন্ তত্ত্ব-রূপের বাহন হয়ে দেখা দেয়? আরও অজস্র পার্শ্বচরিত্রের এই রূপকতত্ত্বের রাজ্যে স্থান কোথায় ?

অথচ রূপকটি একেবারে বাদ দিলে এ কাহিনীর রসাস্বাদে বাধা ঘটে না, আনুপূর্বিক সঙ্গতিই রক্ষিত হয়। কাজেই ধর্মসম্পর্কহীন কাব্য হিসেবে এর দাবি মেনে নিলে ঠকবার আশঙ্কা নেই।

কিন্তু আলাওলের সুফী প্রেম-সাধনার তত্ত্বে ছিল বিশ্বাস। প্রেমবোধ সম্পর্কিত কবির সুপ্রচুর উক্তি এবং তার অতি বিস্তৃত বর্ণনা পীড়াদায়ক হলেও অন্তত একটি চরিত্রের কার্যকারণবোধে অনিবার্য। রত্নসেনের বিচিত্র দুঃসাহসিক কর্ম অর্থহীন পাগলামি বলে মনে হত, যদি না গভীর প্রেমবোধের উচ্ছ্বসিত এবং আবেগতরঙ্গিত

১. ড. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড।

বর্ণনা কাব্যমধ্যে যথেষ্ট বিস্তৃতির সঙ্গে বিবৃত হত।

প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কিত এই বিবৃতিগুলির মধ্যে সূফী সাধনতত্ত্ব প্রকাশিত হলেও অনুভূতির যে গভীর স্তরের ঘনীভূত নির্যাস এরা প্রকাশ করে চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত সহজিয়া সঙ্গীতগুলি ব্যতীত তার সমকক্ষতার দাবি করতে পারে এমন রচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তবে উপলব্ধির গভীরতা থাকলেও প্রকাশ-সৌষ্ঠবে চণ্ডীদাসের কবিতায় যে রোমান্টিক সুদূরাভিসার ও বুকফাটা আর্তি তার সাদৃশ্য আলাওলে মিলবে না। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে আলাওল বিরহবোধের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার গভীর তাৎপর্য অনস্বীকার্য :

যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল। / সুখ দুঃখ প্রতি তার আপদ তরিল ॥ /
বিরহ-অনলে যার দহিল পরাণ। / পিতল অঙ্গুটি করে হেম দরশন ॥

সূফী তাত্ত্বিকতা নিরপেক্ষভাবে মানব প্রেমানুভূতির যে সত্য এখানে বিবৃত হয়েছে তা একান্ত সূক্ষ্ম এবং গভীর। বিরহের উপলব্ধিতেই প্রেমের পরমা সিদ্ধি। বেদনার অশ্রুধারায়ই সত্যের সোনা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়। পার্থিব সুখ-দুঃখ বোধ এর নাগাল পায় না। সাধনতত্ত্বের কথা ছেড়ে দিলে এই প্রেমাভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে রোমান্টিক। প্রাত্যহিক বোধ থেকে প্রত্যাহাতীত রহস্যের অস্পষ্ট কুহেলীর প্রাণ-কেন্দ্রে তা মানুষকে নিয়ে যায়। কিন্তু আলাওলের কবিতার ভাষারূপে এই রোমান্টিক প্রেমানুভূতিকে বহন করে কল্পনার কামনাস্বর্গের অভিমুখী করে দেবার ক্ষমতা নেই। আলাওলের পদ্মাবতীতে চণ্ডীদাসের রাধাসুলভ সেই চরিত্র জিজ্ঞাসা নেই যা দেহোর্ধ্ব, ইন্দ্রিয়োর্ধ্ব—কেবলই সূক্ষ্ম মানসিকতার তন্তুতে নির্মিত। পদ্মাবতীর বিরহ-কথা [এ কাব্যে বিরহবর্ণনার কিছু প্রাধান্যই আছে] তাই মামুলি দুঃখ প্রকাশ করার ঊর্ধ্বলোকে পাঠককে নিয়ে যেতে পারে না।

মধ্যযুগের বাংলা পদ-সাহিত্যে কিছু রোমান্টিক-উপলব্ধির প্রকাশ আছে বৈষ্ণব কবিতায়—বিশেষ করে চণ্ডীদাসে ও জ্ঞানদাসে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে চাঁদ ও বেহুলার চরিত্র কল্পনায় রোমান্টিক আদর্শ জয়যুক্ত হয়েছে। অবশ্য রোমান্টিকতা থাকলেও প্রণয়বৃত্তি এদের চরিত্রের নিয়ন্ত্রী শক্তি নয়। কৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রণয়-আখ্যানের যে রূপ তাতে কবির বস্তুবিদ্ধ বিশ্লেষণ-প্রবণ মনের পরিচয় আছে। প্রেম-জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণ-কীর্তন অনেকখানি দেহসীমায় বদ্ধ—রাধা বিরহখণ্ডেও দেহোর্ধ্ব অতিকল্পনার রহস্য প্রধান হয়ে ওঠে নি। আরাকান সভার কবিদের পরবর্তী সময়ে রচিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর প্রেমবোধের রোমান্টিকতায় নয়, একটা সামাজিক ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায়ই জীবন্ত। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলিতে একমাত্র রোমান্টিক প্রণয় সার্থক রূপ লাভ করেছে। পদ্মাবতীর বিশেষণ হিসেবে তাই 'রোমান্টিক' শব্দটির ব্যবহারে শিথিলতা লক্ষণীয়।

অবশ্য রত্নসেনের চরিত্রে পদ্মাবতীর সন্ধানে যোগীব্রত গ্রহণে, নানা ক্রীড়া-কৌতুক ও দুঃসাহসিক কর্মে আপন যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টায় রোমান্টিক লক্ষণ

কিছু আছে। কিন্তু প্রণয়বৃত্তিই এর কেন্দ্রীয় শক্তি নয়। কাজেই পদ্মাবতীর মৌলিক গুণাবলীর জন্য অন্য ক্ষেত্রে খোঁজ করা বিধেয়।

তিন

আলাওলের কাব্যের প্রকৃত স্বাদ জীবনের একটা বিপুল সমুন্নত ও তরঙ্গিত উপভোগে। মঙ্গলকাব্যের জীবনচিত্রণে যে শিথিল পরিবারমুখিতা, গার্হস্থ্য প্রাত্যহিকের যে কোমল ইন্দ্রিয়ালুতা তা থেকে আলাওল আমাদের যেন অকস্মাৎ 'শ্যেনসম ছিন্ন করে' ঊর্ধ্বে নিয়ে যান—প্রচণ্ডের মুখোমুখি করে দেন, বিপদের দোলায় সমগ্র সত্তাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেন। যুদ্ধবর্ণনা অবশ্য ধর্মমঙ্গলেও আছে। কিন্তু তার ছন্দেস্বরে সেই উদ্দামতা নেই; মামুলি ঘটনা ছাপিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসার কোন নবতর সত্যে তার প্রতিষ্ঠা নেই। আবার মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরে যে বীর্য-ব্যক্তিত্ব তার সমকক্ষতা এর নায়কে নেই। অবশ্যই রত্নসেনের অতি উল্লসিত বেদুইন-বৃত্তি তার নিজস্ব।

আর পদ্মাবতী কাব্যের এই বিশিষ্টতা আলাওলের ব্যক্তিত্বের পাত্র থেকেই উৎসারিত।

চার

আলাওলের জীবনকাহিনী আদ্যন্ত কৌতূহল জাগ্রত করে রাখে। মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে তা একদিকে যেমন তুলনীয়, অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা তুলনারহিত। ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারজনিত বেদনার্ত কবি মুকুন্দরামের মৌন সহনশীলতা এবং স্মিত কৌতুকে তার প্রতি প্রশান্ত কটাক্ষ। ভারতচন্দ্রও যুগসঙ্কট এবং ব্যক্তিগত কারণে বেদনাবিদ্ধ, কিন্তু শাণিত বিদ্রূপ-দৃষ্টিতে সদা-জাগ্রত। আলাওলের জীবনেও বিপর্যয় প্রচুর, কিন্তু স্মিত হাস্যে কবি তাকে জয় করেন নি অথবা বক্র ব্যঙ্গ-দৃষ্টিতে তাকে আহতও করেন নি, মুহূর্তে ফেনিল উন্মত্ততা কণ্ঠ ভরে পান করার উদ্দাম উল্লাস অনুভব করেছেন। জীবনের ঘটনা থেকে কবির ব্যক্তিত্ব এই জিজ্ঞাসাকেই আকর্ষণ করে নিয়েছেন।

কোন কোন সমালোচকের মতে কবির ব্যক্তিগত জীবন-ঘটনা তাঁর কবিসত্তাকে একেবারেই স্পর্শ করে না। তাই কাব্যবিচারে সে আলোচনা অবান্তর। কিন্তু একথা আদৌ স্বীকার্য নয়। ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন তাঁর কাব্যে না থাকতে পারে; কিন্তু কবি-আত্মার [যে আত্মা সৃষ্টি করে] সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগসূত্র থাকবেই—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, বর্ণালী সহযোগে বা বর্ণহীন স্বচ্ছতায়। তাই আলাওলের জীবন-কাহিনীর মধ্যে তাঁর নিগূঢ় কবিসত্তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

আলাওলের জীবনের নিম্নোক্ত তথ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবিদগণ কর্তৃক সঙ্কলিত। আমি তা পুনর্বিবৃত করছি মাত্র।

গৌড়ের জালালপুরে ছিল আলাওলের নিবাস। তাঁর পিতা ছিলেন নৃপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য। জলপথে যাত্রাকালে হার্মাদ বা পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা পিতাপুত্র আক্রান্ত হলেন। যুদ্ধ করে পিতা বীরের ন্যায় শহীদ হলেন। আলাওল কোনক্রমে বেঁচে গেলেন এবং আরাকানে এসে উপস্থিত হলেন। নৃপতি মজলিস কুতুবের অমাত্যপুত্র ঘোড়সওয়ারের জীবন বরণ করলেন।

সঙ্গীত ও নাট্যকলায় তাঁর অসামান্য দখল ছিল। বাংলা-সংস্কৃত-আরবী-ফারসী ভাষাও ছিল তাঁর আয়ত্তে। সেকালে গুণীর আদর ছিল। সামান্য অশ্বারোহী সৈন্যের তাই রাজসভার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে বিলম্ব হল না। অশ্ব এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করে তিনি কাব্য লিখতে আরম্ভ করলেন। মাগনের মৃত্যুর পরেও সুলেমান বা সৈয়দ মহমদের মত রাজামাত্যদের আনুকূল্য তিনি লাভ করেছেন। ফলে 'পদ্মাবতী', 'তোহফা', 'হপ্তপয়কর', দৌলত কাজীর 'সতীময়না'র অসম্পূর্ণ শেষাংশ এবং 'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামালে'র কতকাংশ রচিত হয়।

এমন সময় আবার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল। সাজাহানের পুত্র সুজা রোসাঙ্গে এসে আশ্রয় নিলেন। কিছু কিছুকালের মধ্যেই তিনি রাজার রোষাকর্ষণ করলেন। সম্ভবত দিল্লীর সম্রাটবংশের সুজাকে কেন্দ্র করে মগ রোসাঙ্গরাজ্যের মুসলমান অমাত্যদের এক অংশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়াতেই সুজা রাজরোষে পড়েন।

রোসাঙ্গ-নৃপতি সহ হৈল বিসংবাদ। / পরাজয় ঘটিল তান পাই অবসাদ ॥ / যত লোক মুসলমান তান সঙ্গে ছিল। / রোসাঙ্গ নাথের হাতে সব লোক মৈল ॥

আলাওল কারারুদ্ধ হলেন। এ ব্যাপারে তিনি কতটা সম্পৃক্ত ছিলেন তা জানা না গেলেও সুজার পরাজয়ে কবি যে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তার সাক্ষ্য আছে কবির নিজেরই রচনায়।

কবি অবশ্য কিছুকাল পরে কারামুক্ত হলেন, কিন্তু-রাজকীয় মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা তো গেলই, জীবিকার সংস্থানও রইল না।

সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যাএ

রাজকবি ভিখারি হলেন। অবশেষে ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরল। রোসাঙ্গের কাজীর আনুকূল্যে রাজসভায় তাঁর প্রবেশ ঘটল। 'সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামাল' সমাপ্ত করলেন, 'দারা-সিকেন্দার নামা' লিখে নৃপতিকে সন্তুষ্ট করলেন।

নাটকীয় উত্থানপতনপূর্ণ, ঘটনাবহুল জীবন ছিল আলাওলের। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে কয়েকটি মূল সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে।—

১. জীবনে বহুবিচিত্র এবং উদ্দাম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন আলাওল— হার্মাদ জলদস্যুদের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে রাজবন্দীর দুঃখ দুর্দশা, অশ্বারোহী সৈনিকের জীবন থেকে ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত।

২. আলাওল যে রাজসভার কবি ছিলেন এবং যে সব মন্ত্রি সেনাপতির আনুকূল্য

লাভ করেছিলেন, তাঁরা মুকুন্দরামের পোষ্টার মত গ্রাম্য জমিদার ছিলেন না। ভারতচন্দ্রের প্রতিপালক কৃষ্ণচন্দ্রও একটু বড় ধরনের জমিদার মাত্র, রাজা ছিলেন না। তাঁর রাজসভায় বিলাসকলার অভাব ছিল না, অভাব ছিল প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-বেগের। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে বাঙালি কবিগণ তাই সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি থেকে বহু দূরবর্তী ছিলেন। গ্রাম কেন্দ্রিক জীবনচর্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনের উত্থান-পতনের প্রভাব বড় পড়ত না। বাঙালি কবিগণের চিন্তা-চেতনায় রাজ্যে তাই রাজনৈতিক জীবন ও মননের প্রতিফলন প্রায় অনুপস্থিত ছিল। কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী পরাগল ও ছুটি খাঁয়ের সভায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। সৈনাপত্য-কেন্দ্রিক চিত্তধর্ম এবং প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সংস্পর্শে উক্ত কবিদের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের যুদ্ধবর্ণনার আধিক্য ঘটেছে। রোসাঙ্গ-নৃপতিদের সভাকবি ছিলেন আলাওল। এবং এ সভায় রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা ও কর্মতৎপরতাই প্রধান কর্তব্যরূপে অনুশীলিত হত। আর আলাওলও যে কাব্যরচনা ব্যতীত সর্ববিধ কর্মতৎপরতা থেকে বিরত থাকতেন না এমন প্রমাণ মিলছে।

৩. আলাওল যাবতীয় ঘটনাতরঙ্গের নীরব ও নিরাসক্ত দর্শক ছিলেন না। সূফীসাধক হওয়া সত্ত্বেও এই নিষ্ক্রিয় নিরাসক্তি তাঁর কবিস্বভাবের অংশ ছিল না। যে ব্যক্তি হার্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন, ঘোড়সওয়ার সেনানীর গতি ও শক্তির অধিকারী হিসেবে জীবিকা অর্জন করেন, কবি হয়েও রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করেন, অতি সামান্য অবস্থা থেকে উচ্চ রাজ-পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণে একাধিকবার নিপুণ কৌশলের সার্থক প্রমাণ দেন তিনি আর যা-ই হোন—নিষ্ক্রিয়ও নন, নিরাসক্তও নন।

এই কবি-চিত্তের সৃষ্টি হিসেবে 'পদ্মাবতী' কাব্যের বিচার করলেই তার যথাযথ পরিচয় মিলবে।

বাঙালি মুসলমান সমাজজীবনের বাস্তব চিত্রের অভাবের জন্য আলাওলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছি। তবে আলাওলের যে কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচয় নিলাম তার পেছনে কেবল ব্যক্তিগত কারণই নয়, সম্ভবত ধর্মগত জীবন-চেতনার কিছু কারণ বর্তমান।

সেকালের বাঙালি হিন্দুর স্বাভাবিক জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'বৃহত্তর, সংগ্রাম-মুখর উল্লাস-উতরোল জীবনের স্পর্শও সেই জন্যই [অর্থাৎ গ্রাম-কেন্দ্রিক কৃষিপ্রাধান্য—লেখক] বাঙালীর গ্রামীণ সংস্কৃতির স্রোতে কোনো বৃহৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই, তাহার তটরেখাকে প্রসারিত বা প্রবাহকে গভীর গম্ভীর করিতে পারে নাই।...সেখানে জীবনের শান্ত, সংযত, সমতাল; পরিমিত সুখ ও পারিবারিক বন্ধনের আনন্দ ও বেদনা, সুবিস্তৃত উদার মাঠ ও দিগন্তের, নদীর ঘাট ও বটের ছায়ার সৌন্দর্য।'—[বাঙালীর ইতিহাস]। অপরপক্ষে মুসলমান ধর্মের পায়ের তলায় 'বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন,' এক হাতে

কোরান অপর হাতে তরবারী। শ্রীগোপাল হালদারের ভাষায় বলা যায়, 'মুসলমান ধর্ম অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের মতোই স্বমতসর্বস্ব এবং পরমত অবিশ্বাসী।—সেমিটিক জাতিদের ইতিহাসে ইহার কারণ দেখা যায়; তাহারা ভিন্ন মতের জাতি ও রাজাদের হাতে কম নিপীড়ন সহ্য করে নাই। সেমিটিক গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত মুসলমান ধর্মের প্রেরণাও তাই উগ্র। সেই প্রেরণা যে কত প্রবল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শতখানেক বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ আরব, পারস্য, সিরিয়া, আর্মানীয়া জয় করিয়া মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়া স্পেন পর্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিল—' ['সংস্কৃতির রূপান্তর']

এই গতিবেগ, এই প্রবল বিজিগীষা ধর্মবিশ্বাসের সূত্রে মুসলমানের নীতিবোধে রূপান্তরিত।

এই বোধ বাংলার জাতীয় চেতনায় একেবারে অভিনব। ইসলামী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসেবে আলাওলের চিত্তধর্মে এই গুণ অনুপ্রবিষ্ট এবং কাব্যরূপে অভিব্যক্ত।

পাঁচ

আলাওলের কাব্যগুলির মধ্যে 'তোহ্‌ফা' ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনা, কাহিনীকাব্য নয়। 'সতীময়না' অপরের রচিত কাব্যের অসমাপ্ত অংশ পূরণ মাত্র। কাজেই আলাওলের কবি-চিত্তের প্রবণতার পরিচয় অন্য কাব্যগুলির মধ্যে অনুসন্ধানযোগ্য।

কবির কাব্যগুলি অনুবাদমূলক। অবশ্য এ-অনুবাদ যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীন। অনুবাদমূলক হলেও কবি বিশেষ করে কোন্ ধরনের কাব্য-কাহিনী অনুবাদে উৎসাহ অনুভব করেন তার বিচার কবির মানস-জিজ্ঞাসার সন্ধান দেবে। 'সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জমাল' কাব্য আরব-পারস্য উপকথার রাজ্য থেকে সংকলিত। বন্ধ কল্পনার অবাধ উল্লাস এ জাতীয় কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'সপ্ত পয়করে'র কাহিনীটি নিম্নরূপ। রাজপুত্র বহ্‌রামকে জ্যোতিষীর নির্দেশে রাজা বিদেশে রাখেন। তাঁর ব্যবহারের জন্য সাত রঙের সাতটি টাঙ্গী ঘর নির্মিত হল। বহ্‌রামের অনুপস্থিতিকালে রাজার মৃত্যু হল এবং মন্ত্রী সিংহাসনে বসল। বহ্‌রাম এসে মন্ত্রীকে অপসারিত করলেন। ক্রমে প্রতিবেশী সাত রাজাকে পরাজিত করে তাঁদের কন্যাদের বিবাহ করেন। সাত রানীর জন্য সাতটি টাঙ্গী ঘর নির্দিষ্ট হল। সাতদিনে বহ্‌রাম এঁদের কাছে সাতটি গল্প করেন। সপ্ত পয়কর তারই সঙ্কলন। এই সংক্ষিপ্তসারের মধ্য দিয়েই এই কাহিনীর নায়কের বিচিত্র দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতার এবং উদ্দাম জীবন-বেগের পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'দারাসিকান্দার নামা'র বিষয়বস্তুও সমগোত্রীয়। বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযানের কয়েকটি কল্পকাহিনী এ কাব্যে অবলম্বিত।

আলাওলের কবিমনের পরিচয় উপরের আলোচনায় অনেকখানি স্পষ্ট হবে।

কবিচিত্তের এই উদ্দাম আবেগই পদ্মাবতী কাব্যের স্রষ্টা।

ছয়

পদ্মাবতী কাব্যকে মাঝে মাঝে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বাতায়ন নামে চিহ্নিত করবার বাসনা জাগে। এ কাব্য যেন ঘর থেকে পথে বার করে আনে—সে পথ উদ্দাম উল্লাস, অট্টহাস, প্রবল গতি ও বিচিত্র দুঃসাহসিক অভিযানের পদচিহ্নে ধন্য।

নৃপতি রত্নসেন সন্ন্যাসী হয়ে পথে বেরোলেন। নাথ-কাব্যের গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বর্ণনার সঙ্গে এর তুলনা সহজেই মনে আসে। গোপীচাঁদের সন্ন্যাস ত্যাগ-তিতিক্ষা আত্ম-নিগ্রহের চরম পরীক্ষায় পূর্ণ আর রত্নসেনের সন্ন্যাস প্রেমের সন্ন্যাস। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা পদ্মাবতীকে লাভ করবার এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এই সন্ন্যাস তাই বাসর-কক্ষে পরিসমাপ্ত এবং তার পথ সমুদ্রলঙ্ঘনের প্রবল শক্তিমত্ততায়, সিংহল নৃপতির গড় আক্রমণের আত্মঘোষণায় এবং অশ্ব ও 'চৌগান' ক্রীড়ার বিচিত্র নিপুণতায় চিহ্নিত। মুকুন্দরামের ধনপতি পায়রা উড়িয়ে যে খেলায় মত্ত তাতে ক্ষীণপ্রাণ বিলাসীর স্বাক্ষর আছে, ভারতচন্দ্রে সুন্দরের বচনবিন্যাসে চাতুর্যের পরিচয় আছে। রত্নসেনের এ ক্রীড়া বীর্যময় এবং প্রাণ-চঞ্চল। রত্নসেন অশ্বক্রীড়া প্রদর্শন করছেন :

> ধূলি মাঝে অঙ্গ হেন মেঘেতে বিজলি॥ / দক্ষিণে ফেরায় ক্ষেণে ক্ষেণে বাম পাক। / অলক্ষিতে গতি যেন কুম্ভকার চাক॥ / যখন দক্ষিণে বামে পাক উলটায়। / আগে পাছে তখনে কিঞ্চিৎ চিন পায়॥ / কত দূর গিয়া নৃপ অশ্বকে উঠায়। / দৃষ্টি নাহি পরশিত হয় তথা যায়॥ / সম্মুখে চাবুক ফেলি ধরে শীঘ্রগতি। / দেখিয়া সকল লোক ধন্দ হৈল অতি॥ / ধাই অশ্ববর যাইতে চাবুক ফেলায়। / আসিতে ধরণী হৈতে পুণি উদ্ধারয়॥ / আর বার ফেলি বেগে যায় দূরান্তর। / আসিতে নামিতে কিবা বেকত অন্তর॥ / অশ্বপৃষ্ঠ তল দিয়া লইয়া চাবুক। / আর দিক দিয়া উঠে দেখায় কৌতুক॥ / লোকে অনুমান করে পড়িল ভূমিত। / অলক্ষিতে উঠে যেন চমকে বিদ্যুৎ॥

ভাষা ও শব্দচয়নে কবি রত্নসেনের বীর্যোল্লসিত চিত্তের রঙ্‌টি এখানে জীবন্ত করে রেখেছেন। 'চৌগান' খেলার বর্ণনাটিও সমান প্রাণময়—

> দুই দিকে চারি খুঁটি আনিয়া গাড়িল। / মধ্যভাগে আরোপিয়া গাড়ুয়া ফেলিল॥ / মিলিমিশি হই সবে লাগিল খেলিতে। / সকল চাহেন্ত নিতে আপনার ভিতে॥ / সিংহলের আসোয়ার গুলি নিতে চায়। / চৌগান ঠেলিয়া যুগি গুলি পালটায়॥ / গাড়ুয়া বেড়িয়া শব্দ ওঠে ঠন্‌ঠনি। / দ্বারে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপমণি॥ / ঈষৎ হাসিয়া নৃপ আসিয়া তুরিত। / গাড়ুয়া মারিয়া দিল সিংহলের ভিত॥ ·· / যুগিগণ বলে গুরু কি কর্ম করিলা। / আপনা হস্তের খেড়ি পরহস্তে দিলা॥···· / গুরু বলে শুন শিষ্য আমার বচন। / দড়ভাবে খেলা খেল হৈয়া এক মন॥ / পরহস্তগত যদি হৈল গাড়ুয়া। / পুনি ফিরাইতে পারে সেই

সে খেড়ুয়া ॥ / শিষ্যগণ সঙ্গে নৃপ এতেক কহিতে। / সিংহলের নরে গুলি নিল নিজ ভিতে ॥ / তখন সকল লোক মনে ভাবিলেক। / সিংহলের আসোয়ারে খেলা জিনিবেক ॥... / খুঁটি বেড়ি দুই দলে করে হানাহানি। / রত্নসেন নৃপ তবে মনে মনে গণি ॥ / বিজলি ছুটকে প্রবেশিয়া মহামতি। / চলিল গাড়ুয়া লই অলক্ষিত গতি ॥ / বেলাবারি মারি গুলি দূরে চালাইল। / পাছে পাছে শীঘ্রগতি অশ্ব ধাবাইল ॥ / তার পাছে আসোয়ার ধাইল তুরিতে। / নৃপতির শিক্ষা কেহ না পারে লঙ্ঘিতে ॥ / ছাটের উপরে ছাট অশ্বরে চাপিয়া। / চলিল নৃপতি তবে গাড়ুয়া লইয়া ॥ / ডাইনে রাখিয়া গুলি বলে খেলাখেলি। / শীঘ্র দ্বারকল্প রত্নসেন মহাবলি ॥ / লঙ্ঘিতে নারিল সিংহলের আসোয়ার। / এই মত যুগীরা জিনিল তিনবার ॥

মঙ্গলকাব্যের রন্ধনশালা ও পূজা-ব্রত-স্ত্রীআচারের অতি বিস্তৃত বর্ণনার রাজ্য থেকে এ পৃথিবী বহুদূরে অবস্থিত। তাই মেয়েলি ধ্যানধারণা, চিন্তা-চেতনাকে মঙ্গলকাব্যের উৎস বলা গেলে, এ কাব্য-কল্পনার ভিত্তি যে নিরঙ্কুশ পৌরুষের রাজত্বে তাতে সন্দেহ থাকে না।

বাংলা মঙ্গলকাব্য [চাঁদ চরিত্রের কথা বাদে] পরিবার-জীবনের আনুপূর্বিক কাহিনী, কিন্তু আলাওলের পদ্মাবতী অ্যাডভেঞ্চারের মালা। ফলে এর কাহিনীর ঐক্য বিস্মিত। কিন্তু সেখানেই এর বৈশিষ্ট্য। বহু শত যোগীবেশধারী রাজপুত্র সমভিব্যাহারে রত্নসেনের সিংহলে গমন এবং বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে পদ্মাবতী লাভ, শিকার-বর্ণন, স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমনের পথে সমুদ্রে বিপর্যয়, আলাউদ্দীনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, গোরা এবং বাদলের বীরত্ব, প্রথম পত্নী সম্ভাষণের মাধুর্য-রোমাঞ্চকে অস্বীকার করে বাদলের যুদ্ধযাত্রা, দিল্লীর বন্দীশালা থেকে কৌশলে নৃপতিকে উদ্ধার করে পলায়ন, অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে গোরার আত্মবলিদান প্রভৃতি দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর ঘটনার মাল্যগ্রন্থনই এই কাব্যের বিশিষ্ট স্বাদ। এই দুঃসাহসিক ঘটনাবলীর অন্তরস্থিত জীবনদর্শনটিকেও কবি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন রত্নসেনের মাধ্যমে। আলাউদ্দীনের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যেকার ক্ষণিক বরতিতে :

তবে রাজা রত্নসেনে বিচারি বুঝিয়া মনে / অবশ্য মরণ আছে তত্ত্বে। / যে দিন আনন্দে যায় জীবনে সুফল পায় / সুখ ভোগ ভাল মন্দ সর্তে ॥ / ভবিতব্যে থাকে যেই অবশ্য হইবে সেই / বুদ্ধি বলে নাহিক এড়ান। / অজ্ঞান ভাবয়ে দুঃখ জন্মিতে বরিব সুখ / সদানন্দ সাহস প্রমাণ ॥ / এতেক ভাবিয়া চিত্তে রত্নসেন আনন্দিতে / রাজদ্বারে রচি নৃত্যশালা। / হরসিতে সর্বজন নাচয়ে নর্তকীগণ পঞ্চ শব্দ করি এক মেলা ॥

চিতোরের দুর্গপ্রাকারে নৃত্যশালা নির্মিত হল। অদূরে অত্যুচ্চ বেদীতে আলাউদ্দীনের কামান সজ্জিত। মুহূর্তপূর্বেও যেখানে গোলাবর্ষণ ঘটেছে, নর্তকীর নৃত্যতালে,

উচ্চকণ্ঠ সঙ্গীতে সে স্থান মুখর হয়ে উঠল। আরাবল্লীর শিখরে শিখরে তা প্রতিধ্বনিত হল।

মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনভোগের এই বাসনা সমস্ত ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে চিত্তকে সমুন্নত করে। এই বলিষ্ঠ ভোগবাদ দেবতার মন্দিরে করজোড়ে কাম্যবস্তুর প্রার্থনা নয়, বিপরীতের দস্তুর জিঘাংসা থেকে জীবনের শেষ নির্যাস ছিনিয়ে নেওয়া। প্রাণকে বাজী রাখতে তার তাই ভয় নেই।

৬. ২ রামপ্রসাদ / শাক্তপদাবলী

এক

বাংলা দেশের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান কবিদের মধ্যে রামপ্রসাদ অন্যতম। তাঁর খ্যাতি সাময়িককে লঙ্ঘন করেছে, তাঁর সঙ্গীত একালের মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। এই জনপ্রিয়তা কবি মাত্রের কাম্য হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের মূল্যায়নে এ কোন সর্বজনীন সূত্র হিসেবে গ্রাহ্য নয়। জনপ্রিয়তায় নূনতম হয়েও গুণে উচ্চতম হবার উদাহরণ প্রচুর, ঠিক তেমনি অত্যুচ্চ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সাহিত্যমূল্যের চূড়ান্ত অভাবের দৃষ্টান্তও অজস্র। বরঞ্চ মনে হয় জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষের সঙ্গত সমন্বয় ক্বচিৎ ঘটেছে।

রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার কারণ অনেক, তবে সাহিত্যিক উৎকষ এর অন্তর্ভুক্ত কিনা তাই-ই বিচার্য।

১ রামপ্রসাদের কবিতা অনাবিল ভক্তিরসের উৎস। ভক্তদের কাছে ভক্তিও একটা রস, অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় রসবাদে এর স্বীকৃতি নেই এবং আধুনিক য়ুরোপীয় সৌন্দর্যতত্ত্বে এ অজ্ঞাত। কিন্তু বাঙালির চিত্তে একালেও ভক্তি শতধারে উৎসারিত তাই তার সাহিত্যবোধেও ভক্তিরসের অবিচল প্রতিষ্ঠা।

২. রামপ্রসাদের ধর্মবোধ সহজ এবং ভাবপ্রবণ, যুক্তি বা মননপ্রধান নয়। চর্যার মননপ্রাধান্য রামপ্রসাদে নেই, যদিও ভিত্তিতে তন্ত্রসাধনার বহু জটিল প্রক্রিয়া আছে।

৩ সাধক কবির আন্তরিকতা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং একবাক্যে তার গুণকীর্তনও তাঁরা করেছেন। মনে রাখতে হবে সে যুগের জীবন ও ধর্মবোধের চরম ক্ষয়িষ্ণুতার কথা এবং ভারতচন্দ্র তখনকার অবিসংবাদী কবিগুরু। সে পরিপ্রেক্ষিতে রামপ্রসাদের কালীভক্তির অকৃত্রিম আন্তরিকতা সংগ্রাম-ক্ষত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে।

৪. প্রসাদী সুর বাঙালির কানের ভিতর দিয়ে অতি সহজে মরমে প্রবেশ করেছে। সুরের বাহনে রামপ্রসাদ জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছেন।

কিন্তু এই কারণগুলির সঙ্গে সাহিত্য-সৌন্দর্যের যোগ কোথায়? তবে সাহিত্য-বোধের সঙ্গে এইসব আকর্ষণকে মিলিয়ে ফেলবার ভ্রান্তি সমালোচনা-সাহিত্যে অপ্রচুর নয়।

দুই

রামপ্রসাদ নানাভাবে আমাদের আকর্ষণ করেন, কিন্তু তার কতটা কাব্যিক? কাব্যিক আকর্ষণের একান্ত বিশুদ্ধি হয়ত পুঁথিগত আদর্শ, কিন্তু বিমিশ্র হলেও কাব্য-সৌন্দর্যের নিজস্ব উপকরণের সন্ধান করা সর্বত্রই কাব্য-পাঠকের কর্তব্য।

রামপ্রসাদের নানা রচনার মধ্য থেকে 'বিদ্যাসুন্দর' যে-কোন বিচারেই অগ্রাহ্য হবার মতো। ভারতচন্দ্রের তুলনায় সমসাময়িক কবি হিসেবে রামপ্রসাদের ব্যর্থতা কত সম্পূর্ণ এ বইয়ে তার উদাহরণ মিলবে। আসলে inspired আর uninspired-এর মধ্যে যে পার্থক্য উভয়ের বিদ্যাসুন্দরের মধ্যেকার পার্থক্য যে সেখানে এটা কোন সাহিত্যরসিকেরই দৃষ্টি এড়াবে না।

তবে রামপ্রসাদের উমা আর শ্যামাসঙ্গীত uninspired এ অভিযোগ আদৌ করা চলে না। আসলে এদের প্রেরণা কতটা কবি-প্রেরণা তা ভাবার মতো। রামপ্রসাদের এ কবিতাগুলির মূল্যায়ন তাই দুদিক থেকে করা চলে।

১. রামপ্রসাদের উপলব্ধি কাব্যিক কিনা, অর্থাৎ তা কতখানি ব্যক্তিক আর কতখানিই বা গোষ্ঠীক কিংবা সাম্প্রদায়িক। ২. কবির হৃদয়ানুভূতি কতটা রূপ-চিত্রাঙ্কনে সার্থক হয়েছে।

তিন

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁর বোধে তান্ত্রিকতার ভয়ঙ্করতার মধ্যেও এক কোমল পেলব জীবনদৃষ্টির প্রকাশ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই নিরিখে অনেকে রামপ্রসাদের ধর্মচেতনাকে সাম্প্রদায়িকতা-ঊর্ধ্ব ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বিশিষ্ট বলতে চেয়েছেন।

কিন্তু রামপ্রসাদে ভক্তির যে কোমলতা তন্ত্রসাধনার সঙ্গে মিলেছে তার মৌলিকত্ব স্বীকার্য নয়। 'তন্ত্রপরিচয়' নামক গ্রন্থে সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'কর্ম ও ভক্তি—উভয়ের যোগ না থাকিলে মুক্তির অনুকূল তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।......তন্ত্র-শাস্ত্রে কর্ম-কাণ্ড ও ভক্তি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া 'হরগৌরীত্ব লাভ করিয়াছে। এই হরগৌরী হইতেই জীবের সিদ্ধিদাতা গণেশের মত মোক্ষের প্রকাশ।......দৈবী সম্পৎ লাভ করিতে হইলে, যে পথেই হউক না কেন, সাধনার প্রয়োজন। সাধনা করিতে গেলেই উপাস্যের সহিত একটা কিছু লৌকিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলে উপাস্যকে একান্ত আপনার বলিয়া চিন্তা করিতে পারা যায় না। তাহাতে মনও প্রসন্ন হয় না। ইহাই ভক্তিবাদের মূল কথা।...অন্যান্য ভাব অপেক্ষা মাতৃভাবের উপাসনাই তন্ত্রে সবিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। জগতের মূল কারণকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া সাধক আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। শাক্ত তান্ত্রিকের এই মাতৃ সাধনা হিন্দুসংস্কৃতিতে একটি বড় রকমের দান বলিয়া মনে করি। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের

মহাশক্তির মধ্যেই সাধক জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। খড়্গ ও সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ডের সহিত জননীর হাতের বর ও অভয় মুদ্রা দেখিয়া সেই ভীমকান্ত মূর্তির প্রসাদস্নিগ্ধ জ্যোতিতে সাধক বিস্ময়াবিষ্ট হন। সন্তান এবং মার সম্পর্কের মত পবিত্র মধুর সম্পর্ক আর কিছু কল্পনা করা যায় না।'

তন্ত্র ও ভক্তির সম্পর্ক নির্ণয় করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবুও আমি দীর্ঘ উদ্ধৃতির সহায়তা গ্রহণ করেছি একটিমাত্র সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য। এবং তা হল, ১. ভক্তি ও তন্ত্রের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। এ ব্যাপারে রামপ্রসাদের মৌলিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ২. মাতৃমূর্তিতে কঠোর ভয়ঙ্করতায় কোমল ভাবের আরোপ তন্ত্রচিন্তার প্রাচীন বিশ্বাসজাত, কোন বিশিষ্ট সাধকের নব-উপলব্ধি নয়। ৩. তাই, কি কোমল মধুর ভাবাসঙ্গ সৃষ্টি-চেষ্টায়, কি কালিকার সঙ্গে হৃদয়-সম্পর্ক স্থাপনে রামপ্রসাদের উপলব্ধি গোষ্ঠীগত চিন্তাসীমায় সীমিত, নব ব্যক্তিচেতনার দ্যোতক নয়।

সর্বশেষে এ কথাও বলব যে রামপ্রসাদ ধর্ম ও সাধনগত কোন মৌলিক চিন্তার উদ্ভাবনকর্তা হলেও তা কবিজনোচিত ব্যক্তিগত উপলব্ধি [লিরিকধর্মী] হিসেবে স্বীকৃত হবার নয়। তা হলে পৃথিবীর যে-কোন ধর্মগুরুর চিন্তা ও সাধনগত অভিনবত্বই কাব্যিক ব্যক্তি-বোধ হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য হত। কিন্তু এ জাতীয় স্বতন্ত্র মৌলিক চিন্তার প্রথম আবিষ্কারকের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়। পরবর্তী সাধক-ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে তা অনায়াসে গৃহীত ও অনুসৃত হয়। অপরপক্ষে কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি কবির একান্ত নিজের সামগ্রী, তা অনুকরণকারীদের মধ্যে চারিয়ে দেওয়ার নয়, কবির সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

বাংলা লিরিকের পুরনো ধারার বিবর্তনে রামপ্রসাদের বিশিষ্ট স্থানটি লক্ষণীয়। বৈষ্ণব পদাবলীর গীতোচ্ছ্বাস অনস্বীকার্য হলেও এর লিরিক-লক্ষণে অপূর্ণতা আছে। এক একটি পদে রাধা বা কৃষ্ণের বিশিষ্ট এক একটি 'মুড' ব্যক্ত হয়েছে। কাহিনী ও তথ্যসঞ্চয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অল্প। কিন্তু 'লিরিক' কবিতায় কবির 'ব্যক্তি-আমি'র যে প্রকাশ প্রত্যাশিত এখানে তা লক্ষ্য করা যায় না। রাধা বা কৃষ্ণের অনুভূতির প্রকাশই এখানে মুখ্য। শাক্তকবিতাও উমা-মেনকার আগমনী-বিজয়া গানে মাতা-কন্যার হৃদয়-সংবেদনারই প্রকাশ, কবি-হৃদয়ের বেদনা প্রত্যক্ষ নয়। এদিক দিয়ে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতগুলির কিছুটা অভিনবত্ব আছে। কবি এখানে নিজের কথাই বলেছেন, নিজের হৃদয়ানুভূতির কথা। রাধা বা কৃষ্ণ, উমা বা মেনকার হৃদয়বাণী নয়, কবিচিত্তের কথা—কামনা, বাসনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এগুলি, তাই লিরিক লক্ষণ এই গানে অধিক।

রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের কতকগুলিতে কালীরূপ বর্ণিত। এই বর্ণনায় কবি-হৃদয়ের রঙ্‌ লেগেছে। কাজেই সে রূপ ব্যক্তিত্বের কামনা-বাসনার বর্ণে অনুরঞ্জিত। রামপ্রসাদের অধিকাংশ সঙ্গীতেই তাঁর হৃদয়ের মুক্তির বেদনা প্রকাশিত। এর অনেক-

গুলিতে আবার কবি আপনার 'মন'-কে লক্ষ্য করেছেন। নিজের মনের সঙ্গেই এই নিভৃত আলাপচারী ভঙ্গি খাঁটি লিরিকের নিজস্ব। কিন্তু রামপ্রসাদের বহিরঙ্গে লিরিক-আনুকূল্য, আন্তর-প্রেরণা সেখানে থেকে বহুদূরে। কারণ ধর্মমত ও সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিশিষ্ট হলেও তাঁর উপলব্ধি আদৌ ব্যক্তিক নয়, বরং গোষ্ঠীগত। ভক্তিমার্গের তান্ত্রিকদের গোষ্ঠীগত অধিকার আছে এ বোধে। অন্তত কালীকে সমগ্র সৃষ্টি স্থিতির কারণ, কার্য ও পরিণতি হিসেবে কল্পনা এবং পার্থিব জীবনবোধকে ধিক্কার জানানো, এ ত শাক্ত সাধকমাত্রেরই বিশ্বাসের কথা। এবং রামপ্রসাদে যথেষ্ট কোমল মাতৃচেতনা থাকলেও, মান-অভিমানের লীলার প্রকাশ হলেও তা এই বিশ্বাস থেকে কণামাত্র বিচ্যুত নয়। তাই রামপ্রসাদের মুখের আর্তিতে সমগ্র গোষ্ঠীর চেতনারই প্রকাশ। কবির নিজের ভাষায় :

মনরে আমার এই মিনতি। / তুমি পড়াপাখী হও করি স্তুতি॥

যেমন প্রকাশ বাউলদের গানে, চর্যার অধিকাংশ পদে। অবশ্য উপলব্ধিগত এই অকবিজনোচিত প্রত্যয়ও ভাষারূপ-বিধৃত হয়ে কবিতা পদবাচ্য হতে পারে। ভাবানুভূতির রাজ্যে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ না থাকলেও কবির অজ্ঞাতেই চিত্ররচনায় ও শব্দযোজনায় ব্যক্তিবোধের স্পর্শ লাগতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে চিত্রকল্প ও বাণী-ভঙ্গিতে কাব্য-সার্থকতার অনুসন্ধান করা হবে। আপাতত উপলব্ধির বিশিষ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা।

কয়েকটি কবিতায় রামপ্রসাদের মনোভঙ্গির একটি বিশিষ্ট পরিচয় চকিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ধরনের কবিতার সংখ্যা কম নয়। অন্তত ২০।২৫ টি হবে। রামপ্রসাদ সাধনরাজ্যের যত বড় সিদ্ধই হোন কাব্যরাজ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধি-সাধনার দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত আছে। যুগসন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ায় যে অসাম্য ও অরাজকতা সমাজদেহে প্রকট হয়েছিল—অনেকে এ-জাতীয় কবিতায় তারই প্রতিফলন মাত্র দেখেছেন। এদের পিছনে তার পটভূমি আছে ঠিকই, কিন্তু এদের মধ্যে প্রতিফলন কবির ব্যক্তি-জিজ্ঞাসারও।

একদিকে একান্তচিত্তে ধর্মসাধনার আগ্রহ অন্যদিকে সাংসারিকতার আকর্ষণ। একদিকে কালীপদে অবিচল দৃষ্টি এবং সর্ববুদ্ধি-বিচার সমর্পণ, অন্যদিকে জাগতিক দুঃখ-বেদনা-অভাবে জীর্ণ হয়ে আর্তনাদ,—কতকগুলো কবিতায় এই চিত্ত-দ্বৈধের প্রকাশ আছে।—

ঐযে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটে ভুকে॥ / সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখহে যারে পরম সুখে। / ওমা, আমি কত অপরাধী, নুন মেলে না আমার শাকে।

কিংবা—

মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে। / কিন্তু এমন কল করেছে কালী বেঁধে রাখে মায়া পাশে॥

অথবা—

ঘরের কর্তা যে স্বন স্থির নহে মন ছুজনেতে করে সারা।

অর্থাৎ কবির 'ব্যক্তিত্ব' এবং 'মন' এ দুয়ের সংযোগে তাঁর সাধনার সিদ্ধি ঘটছে না। ছয়টা সর্বনাশা রিপুকে বলি দিয়ে কালী চরণ লাভের পরম সুখই হয়ত তাঁর কাম্য ছিল। কিন্তু বাস্তব জীবনের মায়ার আকর্ষণে সে সুখলাভও ঘটে না। অধ্যাত্ম-সাধনার স্খলনজনিত এই দুঃখের বেদনার সঙ্গে বাস্তব-জীবনের অপ্রাপ্তি অভাব-উপবাস ও অসার্থকতার বেদনার সুরও জড়িত। বাস্তব ও বাস্তবাতীত সুখদুঃখ বোধের মিশ্রণ, বিপরীত চেতনার বাণীরূপ 'সুখ' ও 'দুঃখ' এই দুটি শব্দকে অবলম্বন করে ঝঙ্কার তুলেছে কতকগুলি কবিতায়। আমার বিশ্বাস এখানেই রামপ্রসাদের দুঃখবাদ।—

পূরলনাকো মনের আশা। / আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥

দুঃখানুভূতির এই তীব্র আর্তনাদে কয়েকটি কবিতায় তাই ব্যক্তি-সুর বেজেছে। তীব্র দুঃখানুভূতির গভীর থেকে জীবনের সত্যদৃষ্টি লাভের বাণী বহনে সার্থক প্রাণময় এই কবিতার আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিবোধে স্বতন্ত্র :

আমি কি দুঃখেরে ডরাই। ·· / আগে পাছে দুঃখ চলে মা যদি কোনখানেতে যাই। / তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥ · / দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই॥

চার

রূপচিত্রাঙ্কনের কথা। প্রসঙ্গত প্রমথ চৌধুরীর একটি অতি মূল্যবান বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। 'আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি হোক-না, অপরের কাছে তার যা-কিছু মূল্য, সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত তাহলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না। মানুষমাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়। এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে বাদক হিসেবে দেখেন, তাহলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ করবার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়।'

রামপ্রসাদের কবিতাগুলি অধিকাংশই রূপক।

রূপক কবিতার সাহিত্যমূল্য বিচারে লক্ষ্য এই—রূপক কোথায় রূপে ধরা পড়েছে। এবং সেই রূপ কোথায় কবির হৃদয়-সংযোগে বিশিষ্ট। রূপকের কাজ উদ্দেশ্য-বন্ধনে সীমিত। রূপ সেই উদ্দেশ্য-বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। তার মুক্তি সৌন্দর্যের রাজ্যে। চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য প্রসঙ্গে এ প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সাধক-কবির রূপক-প্রবণতা তাঁর মনোভঙ্গির বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করে, তাঁর

পরিবেশ-পরিচিতির কাজও করে দেয় অনেকটা। রামপ্রসাদের চিন্তা-চেতনার জগৎ যে বাংলাদেশের গ্রাম্য-পরিবেশ তাঁর কবিতা-পাঠে এ বিষয়ে ভুল করবার উপায় নেই। মাঠে মাঠে কৃষি, বেড়াঘেরা জমির সীমানা, জাল ফেলে মাছ ধরার দিনান্ত পরিশ্রম, কলুর ঘানিতে বলদের বিরামহীন চংক্রমণ, শিকারীর পাখিধরার কলাকৌশল, আকাশে ঘুড়ির আনাগোনা, বাড়ির দাওয়ায় পাশাখেলার আসর, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আঠারোশতকের রাজকীয় অত্যাচার-অরাজকতার চিহ্নবাহী পেয়াদা-পাইক, বরকন্দাজ, মামলা-মোকদ্দমার রূপকও অজস্র। রূপকসঙ্কলনে আঠারো শতকের এই সাধক কবি দশ শতকের সিদ্ধাদের সমগোত্রীয়। কিন্তু রূপকগুলির চিত্রাত্মক আবেদন রামপ্রসাদে কতদূর সার্থক? এদের উল্লেখ আছে স্পষ্টভাষায়, কিন্তু এদের তুলনায় যে তত্ত্ব প্রচারের কামনা তার প্রকাশ স্পষ্টতর। রূপক-বস্তুর রূপে চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব ও সাধনার রাজ্যে নিমজ্জিত হতে হবে।

এ জমি যে মানবচিত্ত, পেয়াদা-পাইক যে ষড়রিপু, কলুর বলদ যে মায়াবদ্ধ মন একথা বুঝতে তো অসুবিধা হয় না। বরং এই বোধে পৌঁছে দিয়েই এদের যাবতীয় চিত্রাত্মক আবেদন নিঃশেষ হয়ে যায়।

রামপ্রসাদের কবিতায় তাই সাধকোচিত ভাবগভীরতার প্রকাশ আছে কিন্তু কাব্যোচিত রূপ-নির্মাণ নেই। রূপকের প্রাচুর্য আছে, চিত্রকল্প কটিই বা!

প্রায় তিন শত কবিতার মধ্যে যে অল্প কটি চিত্রকল্পের সন্ধান মেলে এখানে তার দু একটির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। একটি গানে রামপ্রসাদ তারার নাম উচ্চারণ করতে করতে তাঁর চক্ষু বেয়ে যে জলের ধারা পড়বে তার কথা বলছেন:

তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।

তারা শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগে পঙ্‌ক্তিটিতে শিল্পকৌশলহীনতার স্পর্শ লেগেছে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশে [তারা বেয়ে পড়বে তারা] 'তারা' শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবি চোখ না বলে তারা বলেছেন। তারা বেয়ে জলের ধারা পড়ার চিত্রে সমস্ত অন্তরভেদী গভীর বেদনা ভাষারূপ পেয়েছে। আর একটি কবিতায় সিদ্ধির আলোকোজ্জ্বল রাত্রির বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলছেন, 'সন্ধ্যারে বন্ধ্যা জেনেছি'। যে সন্ধ্যা রাত্রির অন্ধকারকে আহ্বান করে না, সেই সম্ভাবনাহীন সন্ধ্যার এই বন্ধ্যা মূর্তি কবি ভাষাবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ জাতীয় ভাষারূপ-সৃষ্টি রামপ্রসাদের কবিতায় খুব বেশি নেই।

কালীর মূর্তি অঙ্কনে রামপ্রসাদের বিশিষ্টতা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কোমল ও কঠোরের এ সমন্বয় নাকি আমাদের সাহিত্যে অন্যত্র প্রাপ্তব্য নয়।

কালীর মূর্তি-অঙ্কনে সাধারণভাবে কঠোরতার উপরে কোমলতা জয়ী হয়েছে। রামপ্রসাদের কল্পনায় কালী ভয়ঙ্করী নয়, ভয়ঙ্কর ও বরাভয়ের সম্মিলনও নয়। আসলে সুকোমলা মাতৃমূর্তিই কবির আরাধ্যা। কাজেই কবি বলেন:

বসন পর মা বসন পর তুমি। / রাঙা চন্দনে মাখিয়া জবা, পদে দিব আমি॥

কবির কোমল ভাবরূপ প্রকাশের চেষ্টা প্রায়ই মামুলি। সংস্কৃত কাব্যের ট্রাডিশনাল উপমার রাজ্য থেকে চিত্র-উপকরণ অধিকাংশ স্থলেই সঙ্কলিত। তাতে 'রতিরস কামদোহনী'র ভাবটাই একান্ত হয়ে ওঠে। তবে এ কবিতার 'রাঙাচন্দনে মাখিয়া জবা' চিত্রকল্পে কঠোরের উপর কোমলের প্রাধান্য সুন্দর ফুটেছে।

কঠোরতার ভাব-ব্যঞ্জনায় শব্দের 'ধ্বনি'কে কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে রণনিপুণা নারীর রূপবর্ণনায় সার্থকতাও এসেছে।

> বামা ওকে এলোকেশে। / সঙ্গিনী রঙ্গিনী ভৈরবী যোগিনী রণে প্রবেশে অতি ঘেষে॥ / কি সুখে হাসিছে লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে / ঘোর সমরে মগনা হয়েছে নগনা পিবতি সুধা আবেশে॥ / চলিয়া চলিয়া যাইছে চলিয়া ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।

ভয়ঙ্করী রণমত্ততার দোলা লেগেছে এ কবিতার ছন্দে। আবার :

> কে রে রজনী-রূপিনী রণ করে। / ঘোর চিকুর অন্ধকার আলুথালু দেখি মরি বা ডরে॥ / যত দেবগণ ধরেছে তাল / নাচিছে বামা সমরে বিশাল। / ববম্ ববম্ বাজিছে গাল, নর শির হার কণ্ঠে দোলে॥

ঘন কেশের প্রাচুর্যে যে রাত্রির পরিবেশ রচিত তার 'শব্দ' মাত্রের ভয়ঙ্করতাই এ চিত্রের অবলম্বন। এর আবেদন চোখের কাছে নয়, কানের কাছে। ফলে সীমাবদ্ধ রূপের ছবি না হয়ে, সীমাহীন অন্ধকারের ধ্বনি-গম্ভীর ভয়ঙ্করতা এ-কবিতায় ভাষা পেয়েছে।

তবে ভয়ঙ্করী এবং বরাভয়দাত্রীর সম্মিলিত রূপাঙ্কনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে প্রায় সর্বত্র। পাশাপাশি এদের পৃথক ছবি কোন ঐক্যবদ্ধ ভাব উদ্রেক করে না। কবি হয় কঠোরের মূর্তি আঁকবেন, কোমল ভাবব্যঞ্জনা বিচ্ছুরিত হবে সে ভয়ঙ্করের অঙ্গকান্তি থেকে, না হলে কবি কোমল মধুরকেই আঁকবেন, বজ্রের কাঠিন্য তার মধ্য থেকে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হবে। এ ব্যাপারে রামপ্রসাদের চেষ্টা দু-একটি উপমাত্মক চিত্রে [যেমন 'কালিন্দী জলে কিংশুক ভাসিছে' অথবা 'কিবা কান্তি এলোকুন্তলে কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে।'] সার্থকতার সীমা স্পর্শ করেছে।

পাঁচ

রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীতে কালীকে মা বলে ডেকেছেন। মাতা-পুত্রের মানবিক সম্বন্ধ এ কবিতাগুলিতে কি পরিমাণ আছে? রামপ্রসাদের ভাষায় সন্তানের মায়ের প্রতি ক্ষোভ-দুঃখ-অভিমান বহু স্থলেই সার্থক রূপ পেয়েছে, দু একটি কবিতায় [যেমন 'মা মলে কি ছেলে বাঁচে না'] ধর্মবোধ ও তত্ত্বচিন্তাকে লঙ্ঘনও করেছে; কিন্তু সাধারণভাবে এ সম্পর্ক মানবিক নয় বলে, মানবিক আনন্দ-বেদনার মায়াজাল দীর্ঘকাল পাঠকমনকে রস-সৌন্দর্যের রাজ্যে বদ্ধ রাখতে পারে না। এ মাতা যে সামান্য নয় এ মায়ের কোলে উঠবার কামনা যে 'জীবন্মুক্তি' এ বোধ এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে বাৎসল্য রসের প্রকাশ

এখানে বাধাহীন নয়।

কিন্তু রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের বিপুল সম্ভারের পাশে আপাত-অনাদৃত যে তিন চারটি 'আগমনী-বিজয়া' গান সঙ্কলিত তাতে বাৎসল্যের মানবিক রসাস্বাদ এক নবধারা বিকশিত করে তুলেছে।

বৈষ্ণব কবিতার বাৎসল্যের পাশাপাশি দীর্ঘকাল বাংলার গ্রাম্যসঙ্গীতে বাৎসল্য রসের অপর একটি ধারার সুর বেজেছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গ্রাম্য মাঘ-মণ্ডলের ব্রতে সূর্যের বা শিবাইয়ের সঙ্গে বালিকা গৌরীর বিয়ের ছড়া সঙ্কলন করেছেন। বালিকা কন্যার চিরদিনের মতো পর হয়ে যাবার ব্যথা যেন আর্ত হয়ে আছে সে কবিতায়। নৌকার মাঝিকে সম্বোধন করে সে বালিকা যাত্রাকালে বলছে :

ভরা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানি / ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই / আমি মায়ের কান্দন শুনি।

রামপ্রসাদের উমা-মেনকা সর্বদেবভাবমুক্ত বলেই মানব-বেদনা-আনন্দ জড়িত হৃদয়-কথা তাতে ভাষাবদ্ধ হয়েছে। উমার আগমনে মেনকার উচ্ছ্বসিত আনন্দে দ্রুত চলায় 'খসিল কুন্তলভার' চিত্র-রচনায় মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-কোমলতার ব্যঞ্জনা; তেমনি বিজয়ার আসন্ন বেদনার গাম্ভীর্য ব্যক্ত শিবের এই আহ্বানের চিত্রে :

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল / বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বারে বারে।

পরবর্তীকালে, বিশেষ করে রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালার গানে, রামপ্রসাদের এই ধারার অনুসরণ ঘটেছে। এবং সমগ্র কবিওয়ালা সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র আগমনী-বিজয়া গানই রস-রূপে উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য বাংলার পুরনো সমাজব্যবস্থায় বালিকা কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে বাৎসল্যের এই যে সুর বেজেছিল তা অনেক পরিমাণে স্থান-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ। বর্তমান সমাজে বিশেষ করে নাগর সভ্যতায়, এর আবেদন অনেকখানি সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত এবং পাত্র-পাত্রীর বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও মানবাত্মার চিরন্তন স্নেহবুভুক্ষার মূর্তি অঙ্কনে এর কিছু সার্থকতা চিরকাল স্বীকৃত হবে।

৬. ৩. আজু গোঁসাই / প্রথম বাংলা প্যারোডি

এক

আজু গোঁসাই পুরনো বাংলা সাহিত্যের কোন নিত্য-উচ্চার্য নাম নয়। তাঁর সৃষ্টির সামান্যতা এবং অন্যসাপেক্ষতা এর জন্য দায়ী হতে পারে। সে যুগে শুধু কয়েকটি লঘু কৌতুকাত্মক চুটকি গানে বেঁচে থাকার মতো পাথেয় জুটত না। এ ক্ষেত্রে মনে রাখবার মতো যে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সেকালের কৌতুকরসিকেরা কৌতুকমাত্রকে উপজীব্য করতে

সাহসী হননি। আজ হয়ত সমালোচকের দৃষ্টিতে এঁদের কেউ কেউ মূলত কৌতুকপ্রাণ শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। কিন্তু তাঁদের কাহিনী-বিস্তার, চরিত্র-চিত্রণ এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্য এত প্রত্যক্ষ ছিল যে কৌতুক বা ব্যঙ্গ-রস একটা বাড়তি পাওনা বলেই গণ্য হত, মৌল প্রকৃতি বলে নয়। গুটিকয়েক ব্যঙ্গ-গানের রচয়িতা আজু গোঁসাইকে তাই মনে রাখা স্বাভাবিক নয়।

তবু আজু গোঁসাই বেঁচে আছেন এবং তাঁর নয়-দশটি কবিতারও সন্ধান পাওয়া গেছে। এর একমাত্র কারণ যে তাঁর 'অন্যসাপেক্ষতা' তাতে সন্দেহ নেই, বিশেষত এই 'অন্য' যখন রামপ্রসাদের মতো অতি জনপ্রিয় কবি। রামপ্রসাদের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকায়ই প্রথম প্যারোডির স্রষ্টাকে অন্তত নামে খুঁজে পাওয়া গেছে; অবজ্ঞাত এবং অখ্যাত হলেও তাঁর নয়-দশটি কবিতা সাধক-কবির আড়াই শতাধিক গানের পিছনে একটি সরু সুতোয় ঝুলে শতাব্দীর বিস্মৃতিকে লঙ্ঘন করেছে।

দুই

আয়রনি, স্যাটায়ার, উইট ও হিউমারের মতো প্যারোডিও হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের এক বিশেষ ভঙ্গি; এবং এর হাস্য ব্যঙ্গ আর ব্যঙ্গাতীত কৌতুকমুখী।

ইংরেজি সাহিত্যে প্যারোডির ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক, তা নিয়ে আলোচনা-গবেষণাও বহু-বিস্তৃত। জনৈক সমালোচক খুব অল্প কথায় প্যারোডির রূপলক্ষণের আদর্শ-নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন : 'Parody at its best, and it is true that its best is rare, is faithful to form and treacherous to matter. It has the great advantage over all other forms of literary criticism in its side-stepping of the poet's reproach that those who can write, and those who cannot, criticize. The parodist must criticize by creating.' —Barbara Hardy.

আজু গোঁসাই-এর কবিতা রূপ ও আকৃতিতে প্রসাদী সঙ্গীতের অবয়বে আবদ্ধ। ছন্দ এবং পদগঠন এমনকি বিষয়-অবলম্বনেও রামপ্রসাদের অনুসরণ। কিন্তু ভাবচিন্তায় বিপরীতমার্গী—জীবনবোধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এবং এই বৈপরীত্য উপস্থাপনার উদ্ভট লঘুত্ব ও কৌতুক সৃষ্টিতে অনেকাংশে সার্থক। কাজেই প্যারোডির দাবি এর আছে।

তিন

আগেই বলা হয়েছে, প্যারোডি অন্য-নিরপেক্ষ সাহিত্য নয়। এর স্বাদে তাই মূল কবির কাব্যসংস্কার যদি পাঠকের মনে কাজ না করে তবে রসের আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই জনপ্রিয় কবিতাদি অবলম্বনেই এর সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আজু গোঁসাই এদিক দিয়ে স্পষ্ট সচেতন। যে কটি গান তিনি বেছেছেন প্রসাদী সঙ্গীতের

প্রাচুর্যের মধ্যেও তাদের খ্যাতি অনেককেই ছাড়িয়ে ওঠে। আর কেবল স্বাদেই নয় সমালোচনায়ও অন্ত-সাপেক্ষতা বার বারই দেখা দিতে বাধ্য। আজু গোঁসাই-এর আলোচনায় রামপ্রসাদের তুলনা তাই কেবলই এসে যাবে।

রামপ্রসাদের সঙ্গে আজু গোঁসাই-এর লড়াইকে অনেকে বৈষ্ণব ও শাক্তের মতাদর্শগত সংঘাতের ফল হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। অবশ্য একটু ভেবে দেখলে একে লড়াই বলা চলে না। কারণ ব্যাপারটা একপেশে। রামপ্রসাদের 'সুরাপান করি নেরে, সুধা খাইরে কুতূহলে' গানটির কথা ছেড়ে দিলে আজু গোঁসাই-এর ব্যঙ্গে আত্মভোলা সাধক কবি একপ্রকার নির্বিকার ছিলেন বলা যায়। আর ব্যক্তি-পরিচয়ে আজু গোঁসাই বৈষ্ণব হলেও কবিতাগুলি তেমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে না। এমনকি 'না জানে পরম তত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব' গানটিও কবির বৈষ্ণবতাত্ত্বিকতার স্বাক্ষর নয়।

আজু গোঁসাই-এর কবিতায় ধর্মবোধের যে পরিচয় মিলবে তা তাত্ত্বিকতামুক্ত এবং সাম্প্রদায়িকতারও ঊর্ধ্বে। 'ও তুই ডুবিস্‌নে ধরগে ভেসে শ্যাম কি শ্যামার চরণতরী' এবং 'তবে শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামা মায়ের চরণ দুটি' অন্তত এ দুটি গানে শ্যাম ও শ্যামার অভেদ-ঘোষণায় তিনি উচ্চবাক্ এবং প্রাপ্ত গানগুলির একটিতেও রামপ্রসাদের ধর্মবোধের প্রতি কটাক্ষমাত্র লক্ষিত হবে না। পুরনো যুগের ধর্মপ্রাধান্যের পরিবেশে—বিশেষ করে আঠারো শতকে শাক্ত-বৈষ্ণব তত্ত্বগত দ্বন্দ্ব যখন তীক্ষ্ণাগ্র হয়ে উঠেছে—এ জাতীয় স্বচ্ছ মনের প্রকাশ বড় সহজে মিলবার নয়।

চার

আজু গোঁসাই বৈষ্ণবতত্ত্বে খুব প্রাজ্ঞ ছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু তাঁর একটি জীবনদর্শন গানগুলিতে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে জড়িয়ে আছে। এই জীবনবোধে স্থিত হয়ে রামপ্রসাদের জীবন-চিন্তাকে ব্যঙ্গে-কৌতুকে বিদ্ধ করেছেন কবি, তাঁর ধর্মকে নয়। এ আঘাত তীক্ষ্ণ নয় ঠিকই, কিন্তু কেবল মজা করার জন্যই এলোমেলো বলা নয়, যা খুশি বলে হাসানোই উদ্দেশ্য নয়। আপাতস্থূলতার অন্তরালে প্রসাদ বিরোধী জীবনদর্শনের ভিত্তি আছে।

রামপ্রসাদ যেখানে জীবনচর্যার প্রাত্যহিকতাকে কলুর চোখ বাঁধা বলদের নিত্য পরিক্রমা বলে ধিক্কার দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণত নির্জিত করে নিবৃত্তিমার্গের অনুধ্যানে আত্মস্থ হতে চেয়েছেন, জীবনটাকে যখন তিনি মায়া এবং ভোগপ্রবৃত্তিকে দুঃস্বপ্ন বলে বুঝেছেন, আজু গোঁসাই তখন জীবনবাদের মধুরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। রামপ্রসাদের 'এ সংসার ধোঁকার টাটি' কবিতার ব্যঙ্গানুকৃতি রচনা করতে গিয়ে তাই তিনি বলেন:

এ সংসার রসের কুটি। / হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥

অথবা:

ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী ॥

এই স্থূল কৌতুকের অন্তরালে গভীর কথাটিও কবি ব্যক্ত করেন :

মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া ভাবছো মায়ার বেড়ি কাটি।

মহামায়ার মায়ায় সুন্দর এ পৃথিবী, প্রাণপূর্ণা। আজু গোঁসাই এই মায়ার মোহজাল ছিন্ন করতে চান না, তা ক্ষণস্থায়ী হলেও না, তা মিথ্যে হলেও না।

আজু গোঁসাই-এর এই জীবন-দৃষ্টি থেকেই উৎসারিত তাঁর গানের কৌতুক।

পাঁচ

রামপ্রসাদের অধিকাংশ পদই রূপকাত্মক। আজু গোঁসাই রূপকের তত্ত্বটি ভেদ না করে আপাত অর্থটি গ্রহণ করেছেন তাঁর প্যারোডিতে। ফলে প্রসাদী সঙ্গীতের গভীর আধ্যাত্মিক তৎপর্য গোঁসাইয়ের হাতে বাস্তব কিন্তু অসঙ্গত ঘটনাযোগে হাস্যকর হয়ে উঠেছে।

রামপ্রসাদ যখন 'আমায় দে মা তবিলদারী' বলে গান ধরেন তখন তিনি কালী-ভক্তির তহবিলের কথাই বলেন, এর সঙ্গে বাস্তব অর্থসম্পদের কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু আজু গোঁসাই এ কবিতার প্যারোডি লেখেন :

কেন চাস ভাই তবিলদারী / ওকাজে আছে ঝুঁকি ভারি। / দুদিনকার মুহুরী হয়ে তাইতে এত বাড়াবাড়ি। / পেলে তবিল, ভাঙতে এক তিল, / তোমার আর সবে না দেরী ॥

রামপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি স্নিগ্ধ কটাক্ষে এ কবিতার তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি বিশেষ রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আবার রামপ্রসাদ যখন সংসার ধান্দা থেকে মুক্ত হয়ে মনকে ভক্তির উন্মুক্ত মাঠে বেড়াতে যেতে বলেন, তখন আজু এ ভক্তির তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়ে গান ধরেন :

কেন মন বেড়াতে যাবি। / কারো কথায় কোথাও যাসনেরে তুই, / মাঠের মাঝে মারা যাবি ॥

কিংবা রামপ্রসাদ যখন মনকে হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে কালী বলে ডুব দিতে বলেন, তখন গোঁসাইয়ের গান ব্যঙ্গাত্মক অর্থ-বিপর্যয়ে হাস্যময় হয়ে ওঠে :

ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি। / দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥ / একে তোমার কফোনাড়ী ডুব দিও না বাড়াবাড়ি। / তোমার হলে পরে জ্বরজ্বারি মন যেতে হবে যমের বাড়ী ॥

রামপ্রসাদে যা রূপকমাত্র, তা গভীর ভক্তিতত্ত্বের ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত, গোঁসাই তার বাস্তব রূপ পর্যন্ত গিয়েই থমকে থেমে দাঁড়ান এবং রামপ্রসাদের সাধনসঙ্কেতটির তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টিমাত্র না ফিরিয়ে ব্যবহৃত রূপকের বাস্তব সুবিধে অসুবিধে নিয়ে কৌতুকে মেতে ওঠেন।

দুই

এ জাতীয় কবিতার ব্যঙ্গরস আস্বাদে অনুভূতির প্রাধান্য চলে না, বুদ্ধিবৃত্তিকেও অনেক-খানি দায়িত্ব নিতে হয়। কিছু চিন্তার সূক্ষ্মজালে জড়িয়ে এর হাস্য পাঠকচিত্তে আবর্তিত হয়। তবুও একথা ঠিক যে ভারতচন্দ্রের মননের তীক্ষ্ণতা ও সুমার্জিত পরিশীলিত বিদ্রূপকটাক্ষ আজু গোঁসাইয়ে পাওয়া যাবে না। ভারতচন্দ্রের ভাষাগত অধিকারের সুবিস্তৃতি আর মননগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গভীর যুগ-বেদনা গোঁসাইয়ের আয়ত্তের অতীত। তবে গোঁসাই-এর কবিতা একান্ত স্থূল, রামপ্রসাদের ধর্মসঙ্গীতের মূল্যে লোককে হাসাবার চেষ্টা করে নিজেকেই হাস্যাস্পদ করেছে—এমন মনে করাও আদৌ ঠিক হবে না। মাঝে মাঝে দু একটি কথায় স্থূলতা নেই তাঁর গানে এমন নয়। আরম্ভের দীপ্তি শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে সর্বদা তিনি সক্ষম হননি তা-ও ঠিক। শব্দচয়নে তাঁর সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মের অভাব আছে—কিন্তু একটি স্পষ্ট গভীর এবং ব্যক্তিক জীবনবোধ তাঁর প্যারোডির কৌতুকের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। কবির এই ব্যক্তিক স্বতন্ত্র সত্তাটি 'মনরে আমার এই মিনতি। / তুমি পড়াপাখী হও করি স্তুতি॥' এই গানের প্যারোডিতে আপনাকে প্রকাশ করেছে :

হয়োনা মন পড়োপাখী। / ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী॥ / পাখী হলেও তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি। / তুমি মুখে বলবে পরের বুলি পরম তত্ত্বের জানিবে কি॥

কোন ধর্মসম্প্রদায়ের চিন্তা-পিঞ্জরেই আপন মনকে প্রবেশ করাতে রাজী নন কবি। তাঁর মুক্ত প্রাণ আপন স্বাধীন চিন্তার আকাশেই ডানা মেলে দেবে। কবিচিত্তের কেন্দ্রে যুক্ত বলে এর নিছক হাস্যের পিছনে গভীরতার গোপন স্পর্শ সতর্ক দৃষ্টিতে নাও এড়াতে পারে।

কিন্তু যে কবিতায় ভাব-কল্পনা ও রূপরচনায় গোঁসাই ক্লাসিক হয়ে উঠেছেন তা ঠিক প্যারোডি নয়। রামপ্রসাদ কালীর গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করায় একটু ব্যঙ্গের সুরেই বলেছেন গোঁসাই :

না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, / মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে। / তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে।

ব্যঙ্গ এর বহিরাবরণে, অন্তরে এর মানবীয় সম্পর্কের এক অতি গভীর বোধ। বাৎসল্যরসকে ধর্মসংস্রবমুক্ত করে মানবরসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার এত সহজ যুক্তি স্বাভাবিক এবং বিস্ময়কর।

রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক কল্পলোকে বাস্তব লজিকের আঘাতে কৌতুকরস বিকীর্ণ করেছেন আজু গোঁসাই।

৬·৪· মৈমনসিংহ গীতিকা / লোকসাহিত্যের মুক্তি

মৈমনসিংহ গীতিকা পুরনো কি নতুন, খাঁটি কি ভেজাল এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। এই বিষয়ে বর্তমানে আমাদের আগ্রহ নেই। আমরা এর কাব্যরস আস্বাদে নিবিষ্ট হতে চাই। আর কাব্য-সৌন্দর্যে এই গীতিকাগুলি যে একক এবং কালোত্তীর্ণ এ-কথা বোধ হয় তর্কাতীত।

রোমান্স ও বাস্তবতা

বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের মূলে পার্থক্য। কিন্তু কোথাও একটা যোগসূত্র থেকে গেছে। রোমান্সে আমরা দৈনন্দিনের খণ্ডিত সামান্যতা থেকে কল্পনার এক সুদূর বর্ণাঢ্য রাজ্যে অভিযান করি। সেখানে প্রকৃতিতে, মানুষে ও প্রাণীজগতে পার্থক্যের সীমারেখা বড় অস্পষ্ট, সেখানে কল্পনা ও বাস্তব বড়ই কাছাকাছি হাত ধরাধরি করে চলে। সে রাজ্যে মানুষের কামনা দেহ ধারণ করে আবির্ভূত হয়, বাস্তবের স্থুল বাধা অতি সহজেই সেখানে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু তবুও রোমান্সের রাজ্য রূপকথার রাজ্য নয়। আমাদের প্রাত্যহিকের ধূলিমলিন সুর তার গায়ে না লাগলেও সম্ভব ও অসম্ভব সেখানে একাকার হয়ে যায় না। কার্যকারণের সমস্ত প্রয়োজন সেখানে অবলুপ্ত নয় বিশেষ করে উপরের গাঢ় রঙের প্রলেপ একটু অপসৃত হলেই সেখানে বাস্তব জীবন ও পরিবেশের কিছুটা পরিচয় ফুটে ওঠে।

মৈমনসিংহ গীতিকার গাথাগুলি প্রায় সবই রোমান্সধর্মী। আমাদের জীবনের দৈনন্দিন কাহিনীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সে-রাজ্য সৌন্দর্যের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য। সেখানে সুন্দরী নারীর 'হাঁটিয়া না যাইতে কন্যার পায়ে পড়ে চুল। / মুখেতে ফুটিয়া উঠে কনক চম্পার ফুল॥' এবং যাযাবরী যুবতীর 'আসমানের তারা'র ন্যায় 'আগল ডাগল' আঁখি দেখে মুনির মন ভোলে, ব্রাহ্মণ জমিদার পুত্র তার সমাজ সংসার ধর্ম সব ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে যায়।

দৈনন্দিন সাংসারিকতা থেকে 'মহুয়া' কাহিনীর পটভূমি বহুদূর। 'উত্তরা না গাড়ো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ। / তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্ব্বত॥ / হিমানী পর্ব্বত পারে তাহারই উত্তর। / তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর॥ / চান্দ-সুরুয নাই আন্দারিতে ঘেরা। / বাঘ-ভালুক বইসে মাইনসের নাই লরাচরা॥' গারো পাহাড়ের নিবিড় অন্ধকার অরণ্যানী, খরস্রোতা পার্বত্য নদী, বেদের দলের অদ্ভুত যাযাবর জীবন, সন্ন্যাসীর ভাঙা মন্দির ও অলৌকিক ক্ষমতা, আর সর্বোপরি মহুয়া সুন্দরী—'আন্ধার ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা।' প্রত্যহের প্রয়োজনের ধূলিলিপ্ত জগত থেকে কল্পনার মোক্ষধামে অপসৃত হয়েছে এ কাহিনী। যেখানে গ্রাম্য-জীবনের সাধারণ পরিবেশের কাছাকাছি এসেছে 'মহুয়া' সেখানেও শালি-ধানের

ক্ষেত আর কাকচক্ষু জল সরোবরের এক অপূর্ব মোহিনী জাল বিস্তৃত। সমগ্র কাহিনীটির গতিই হল সমাজ ও সংসার থেকে দূরে—বহুদূরে।

অপরাপর পালায় রোমান্সের এই বিপুল সুদূরতা নেই, কোথাও কাহিনী পরিবারধর্মের চারপাশেই আবর্তিত, গ্রাম-জীবনেই কেন্দ্রিত। কিন্তু কল্পনার রঙে-রসে বাস্তবতা সর্বত্রই আবৃত, দূরের আভাস সর্বত্রই ব্যঞ্জিত। কোথাও আবার এই ব্যঞ্জনা রূপকথার রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে, যেমন 'কাজলরেখায়', কোথাও উত্তীর্ণ-প্রায়, যেমন 'রূপবতী'তে।

কিন্তু 'কেনারাম' বা 'চন্দ্রাবতী'র পালা সম্পর্কে ইতিহাসের দাবি উঠেছে।

'চন্দ্রাবতী' চরিত্রটি ঐতিহাসিক কিন্তু আলোচ্য কাহিনীটি একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তি-জীবনের আশা-বেদনায় কম্পিত; এ গাথায় রোমান্স রসের প্রবেশে তাই বাধা অল্প। কেনারামের পালা সম্পর্কেও একই কথা। দ্বিজবংশী ঐতিহাসিক ব্যক্তি সন্দেহ নেই, জালিয়ার হাওর প্রভৃতি স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থানও নিশ্চিত হতে পারে, হয়ত কেনারামের ব্যক্তিত্বও প্রমাণ করা সম্ভব; কিন্তু 'দস্যু কেনারামের পালা'—অন্তত তার যে সাহিত্যিক রূপ আমাদের হস্তগত—অন্যান্য গীতিকাগুলির ন্যায়ই একটি উৎকৃষ্ট রোমান্স। এ পালায় জনশূন্য জালিয়ার হাওর যতটা না ভৌগোলিক সত্য, রোমান্স কাহিনীর পরিবেশ-রচনায় তার দান তার চেয়ে অনেক বেশি। একদিকে ফুলেশ্বরী নদী খরস্রোতে বয়ে যাচ্ছে, আর তারই পাশে সেই আদিঅন্তহীন শরবন, মাঝে মাঝে উচ্চ বৃক্ষশাখে পাখিদের কলকূজন। এই অঞ্চলটি যেমন আমাদের পল্লীগ্রাম থেকে যোজনব্যবধান, তেমনি দস্যু কেনারাম আমাদের পরিচিত দস্যুগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সে ভীষণ ও দয়াহীন। জীবন হননেই তার আনন্দ। কিন্তু সংগৃহীত অর্থরাশি সে নিজে ব্যবহার করে না, দান করে না, দান করে পুণ্যলাভের বাসনাও নেই তার; মাটির গর্ভেই লুকিয়ে রাখে। ঐতিহাসিক বাস্তবতা অপেক্ষা রোমান্স কল্পনার রাজ্যে এই ব্যাপার অধিক সম্ভব। এ-রাজ্যে দ্বিজবংশী যখন মনসার ভাসান গান করেন, আকাশ চাঁদোয়া হয়, উড়ন্ত পাখি ফিরে আসে বৃক্ষশাখায়, পাগলা ভাটিয়াল নদী উজান বয়, ভুজঙ্গ শির নুইয়ে চলে যায়, আর কেনারাম খাঁড়া ছুঁড়ে ফেলে একতারা হাতে তুলে নেয়। এ রাজ্য রোমান্সের রাজ্য, এর বাস্তবতা তাই একটু জটিল ধরনের।

সবগুলি গাথায়ই প্রেমের এমন মুক্ত গতি, দেহসৌন্দর্যের এমন প্রজ্জ্বলিত মাদকতা, কামনার এমন অহঙ্কৃত তীব্রতা, আত্মদানের এমন তেজোগর্ভ স্বভাবিকতা দেখা যায় যে এরা আমাদের এক কল্পলোকের সৌন্দর্যের মধ্যে নিয়ে যায়, যেখানে ফুলে ফলে, নদীর ধ্বনিতে, পাখির গানে, বর্ষায় বসন্তে এক অপূর্ব রাজ্য আমাদের প্রাণ ভুলায়।

কিন্তু এ রাজ্য কি একেবারেই রূপকথার রাজ্যে? অসম্ভব অতিপ্রাকৃত পরিবেশ কিংবা অলৌকিক শক্তিপুঞ্জের সমারোহে এর ভাবাকাশ আবরিত নয়। লঘু তরল কল্পনা-বিলাসে এখানে পাঠকমন মাধ্যাকর্ষণচ্যুত হয়ে মেঘখণ্ডে প্রমোদবিহার

করে না। রোমান্সের বর্ণাঢ্যতার আশপাশ থেকে যে সমাজ ও যে-মানুষগুলি উঁকি মারে তা একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব। এখানে সপত্নী-পুত্রকে হত্যার চক্রান্ত আছে, মুক্তপ্রেমের জয়গানের পাশে পাশেই চলেছে সমাজ-প্রধানদের কুৎসা-রটনা, —সমাজমন মানুষের প্রেমধারণাকে বারংবার ক্লিষ্ট করে ট্রাজেডি ঘটিয়েছে এই সব কাব্যে। মুসলমান কাজি বা দেওয়ানের লালসা ও অত্যাচারের নখর বহুস্থানে উদ্যত, কিন্তু কোথাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ব্যাহত নয়। হিন্দু-মুসলমনের প্রেমচিত্রকে দরদের সঙ্গে এঁকেছেন কবিরা। আর এই দেশের কর্মশীল মানুষ—কাঙালিয়া, জাঙালিয়া, মৈষাল বন্ধু প্রমুখ চরিত্রের মাহাত্ম্য নিখুঁত বাস্তবতার সঙ্গেই মূর্ত হয়েছে।

কেবল কাহিনী ও চরিত্রেই নয়, প্রকৃতি-চিত্রণেও বর্ণাঢ্যতার পিছনে এই গ্রাম-বাংলা জীবন্ত: 'শাওনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে। / বউ কথা কও বলি ডাকে পথে পথে॥' 'হাতেতে জলের ঝারি বর্ষা নেমে আসে।' এ একান্তভাবেই বাংলার বাস্তব পল্লী-চিত্র।

প্রকৃতিতে আর লোকাচারে—দুর্গোৎসবে, আলপনায় আর মেয়েলি প্রথার বর্ণনায় —রোমান্সরসের বাহুল্য সত্ত্বেও এক সুষম কিন্তু বাস্তব মণ্ডনচিত্র রচিত হয়েছে গীতিকাগুলির চারপাশে।

কিন্তু প্রেম হল সেই কেন্দ্রীয় সত্য যার সূত্রে রোমান্স আর বাস্তবের মধ্যেকার এই বেণীবন্ধন রচিত। নিঃসংশয়ে এই কাব্যগুলির কেন্দ্র-কথা প্রেম [কেনারামের পালা ব্যতীত], প্রেমের অপ্রতিরোধনীয় প্রবল শক্তিতে তার অনন্ত বৈচিত্র্যে। মানব-অনুভূতির জগতে প্রেম এমনই একটি হৃদয়-বাণী যা একান্তভাবে বাস্তব হয়েও মনন ও কল্পনার সূক্ষ্মতায় আর ব্যঞ্জনায় সুদূর সৌন্দর্যের পক্ষকামী।

রোমান্সের বর্ণবিচ্ছুরণে কিংবা বাস্তবের ঘন-পিনদ্ধতায় মৈমনসিংহ গীতিকায় মুক্তপ্রেমেরই জয়গান।

প্রেম

রূপ আর অরূপ জগত, কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে প্রেম। স্বভাবতই দেহধারী মানুষের জীবনধারণের সঙ্গে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য—কিন্তু এখানেই এর সমাপ্তি নয়, সূচনা মাত্র। দেহকে অবলম্বন করেও দেহাতীত লোকে অভিযান করে বলেই চিরকাল সাহিত্যে এর পটভূমি বিস্তৃত!

আমাদের পুরনো কাব্য-কাহিনীতে প্রেমের স্থান ছিল সঙ্কীর্ণ। মধ্যযুগের সামাজিক বিধিনিষেধ মুক্তপ্রেমের পক্ষবিস্তারে সাহায্য করেনি আদৌ—বাধাই দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যে নরনারীর সম্বন্ধ অতি সাধারণ ও মামুলী দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেই সীমিত। সৌন্দর্য ও কল্পনার কোন উচ্চ ভাবরাজ্যে তার অভিযান নয়। স্বভাবতই দাম্পত্য সম্বন্ধের দৈনন্দিনের এ-পরিচয় প্রেমচিত্র হিসেবে গ্রাহ্য নয়।

মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যেই সত্যকার প্রেমগাথার পরিচয়। পদাবলীর

প্রেমের স্বরূপ আলোচনার অবকাশ আলোচ্য প্রবন্ধে স্বল্প। তবে এ-কথা মন্তব্যযোগ্য যে পদাবলীর প্রেমের দুটি দিক। ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক প্রত্যয়ের পাশাপাশি মানবীয় প্রণয়ের সুগভীর অনুভূতির প্রবাহে এ প্রেম দ্বিধা-দীর্ণ। তাই ধর্মের প্রভাবমুক্ত মানুষের একান্ত জীবন-নির্ভর প্রেম-চিত্রণে মৈমনসিংহ গীতিকা তথা পূর্ববঙ্গগীতিকার নাম একক—আরাকানের মুসলমান কবিদের রোমান্টিক কাব্যগুলির কথা মনে রেখেও এ-সিদ্ধান্ত করা চলে। আলাওল প্রমুখের কবিতায় মানবীয় ভাবাকাশের অন্তরালে সুফীবাদী ধর্ম-সাধনার প্রভাব সম্ভবত দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

গীতিকার প্রেমচিত্রগুলির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় .

প্রথম : বৈষ্ণব কবিতার ন্যায় এগুলি নায়ক বা নায়িকার প্রেমানুভূতিসর্বস্ব 'লিরিক' মাত্র নয়। এখানে হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে কর্মের মেলবন্ধন ঘটেছে; কাহিনীর পটভূমিকায়, চরিত্র-চিত্রণের নৈপুণ্যে প্রেম বিশুদ্ধ অনুভূতির স্তর অতিক্রম করে স্পষ্ট বাস্তবতায় এক একটি মানবদেহে ও আত্মায় মূর্তি ধরেছে।

দ্বিতীয় : কোন বিশেষ দার্শনিক বিশ্বাস কিংবা তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত গীতিকা-রচয়িতাদের জীবন-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। জীবন-বিরোধী যা কিছু—অস্বীকৃত হয়েছে এই কাব্য-মালায়। বাস্তব বা কল্পনা সবই এ-রাজ্যে জীবননির্ভর। সহজ-ভাবে গীতিকার কবিরা তাকিয়েছেন মানুষের দিকে, আর সরলভাবে জীবন ও যৌবনের গান গেয়েছেন : 'এমন দুর্লভ মানব জনম আর হইবে না।' অথবা, 'অঙ্গে দেখা দিল সোনার যৈবন।'

সহজিয়া বৈষ্ণবদের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' বাণীর মধ্যে ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বের যে সাধনাগত তাৎপর্য লুকায়িত মৈমনসিংহ গীতিকার উচ্চ ঘোষণায় তার স্পর্শ নেই। তত্ত্বনিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টি সত্যকার গভীরতায় অবতরণে সক্ষম।

তৃতীয় : মঙ্গলকাব্যগুলিতে নরনারীর আকর্ষণের লক্ষ্য ছিল সম্ভোগ। গীতিকার প্রেমে দেহগত সম্ভোগের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে হৃদয়ের আশা-আনন্দ-বেদনাকে। গীতিকায় দেহধর্মের অস্বীকৃতি নেই, দেহ-সৌন্দর্য ও দেহগত মিলনকে ছোট করে দেখা হয়নি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় আকর্ষণীশক্তি ছিল সৌন্দর্যের প্রচণ্ড মাদকতায়। কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকা কখনও সম্ভোগ-কামনায় অধৈর্য ও চঞ্চল হয়ে ওঠেনি। মনে হয় এইসব কবি, প্রেমকে যদিও মানবসম্পর্ক ও দেহসম্বন্ধের অতীত বলে মনে করতেন না, তবুও যেখানে দেহভোগ-বাসনাকে ছাপিয়ে এই সম্বন্ধ একটা সৌন্দর্যময় সুষমায় মণ্ডিত হত, কল্পনার লীলাশক্তি যেখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়াত এবং হৃদয়ের আকর্ষণ প্রধানতম স্থান অধিকার করত সেখানেই তাঁরা প্রেমের সন্ধান পেতেন। তাই অনেকগুলি গীতিকায় প্রেমের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভোগলালসা ধিকৃত হয়েছে। গীতিকার প্রেমের লীলাকে সুষম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করবার জন্য দৈনন্দিন সামান্যতা থেকে একটা কল্পনার রম্যান্তরে উন্নীত করবার জন্য একদিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশকে, অপরদিকে

বর্ণনা করা হয়েছে নানাবিধ রোমান্টিক কলাবিলাসের।

চতুর্থ : গীতিকায় সর্বত্রই মুক্তপ্রেমের জয়গান। স্বাধীনভাবে জীবনের সাথী মনোনয়নের অধিকার যেন স্বীকৃত হয়েছে এখানে। নারী-পুরুষের উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রেমের এই মুক্তি হৃদয়ের একাধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হৃদয়কে রাজা করে অর্থ-প্রতিষ্ঠা-সমাজ সবকিছুকে অস্বীকার করবার শক্তিসঞ্চয়ে গীতিকার প্রেম সার্থক। কোথাও প্রেমিক জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়েছে, কোথাও গৃহধর্ম ত্যাগ করেছে [মহুয়া], কোথাও অভিভাবকের অভিমতের বিরুদ্ধে পতি মনোনয়ন করেছে আপনার প্রিয়তমকে [ভাবনা], কোথাও ধর্মের উত্তুঙ্গ মন্দির থেকে সংস্কারের বেড়াজাল ছেদ করে এসে দাঁড়িয়েছে [চন্দ্রাবতী], কোথাও আবার উচ্চ রাজকার্য জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে এসেছে মৃতা প্রণয়িনীর সমাধিপার্শ্বে [মদিনা]।

পঞ্চম : কিন্তু গীতিকার মুক্তপ্রেমও রূপকথার লঘুমেঘসঞ্চরণ নয়, বায়বীয় অবাস্তবতাও নয়। এর মধ্যেও পারিবারিক সম্বন্ধের ইঙ্গিত রয়েছে—নদেরচাঁদ-মহুয়ায় সম্পর্কটি সমাজবিচ্ছিন্ন হলেও পরিবারপ্রথার মূল ধর্মগুলি পালন করেছে। অন্যান্য গীতিকায়ও পরিবারজীবনের ঘটনাই মিলনে-বিরহে বর্ণিত। একদিকে যেমন প্রাত্যহিকের সঙ্কীর্ণতা থেকে বিচিত্র লীলাবিলাস ও প্রাকৃতিক পটভূমিকায় অপসৃত করে প্রেমকে কাল্পনিক ঐশ্বর্যে ভূষিত করা হয়েছে, আবার অপরদিকে সংসারের মধ্যেই একে প্রতিষ্ঠিত করে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ : গীতিকায় পূর্বরাগের সূত্রপাত প্রধানত দুটি উপায়ে। কয়েকটি কবিতায় প্রথম দর্শনে অকস্মাৎ হৃদয়ে প্রেমের জন্ম হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে রূপমোহজাত প্রেম থেকে কামকে স্পষ্ট পৃথক করে দেখান হয়েছে। নায়িকার দেহ-সৌন্দর্যই এখানে ভাগ্যবিপর্যয়ের আকর্ষণী শক্তি। উদাহরণ হিসেবে মহুয়া, মলুয়া, কমলা, সোনাই, রূপবতীর পালার উল্লেখ করা চলে। আবার কতকগুলো পালায় আবাল্য পরিচিতির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে প্রেমের অঙ্কুর বেড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও নায়িকাদের সৌন্দর্যের অভাব ছিল না, কিন্তু স্বভাবতই কবিদৃষ্টি এদিকে কেন্দ্রিত হয়নি। চন্দ্রাবতী, মদিনা, কঙ্ক ও লীলা এজাতীয় কবিতার নিদর্শন। এখানে বিপদের জন্ম সামাজিক বৈষম্য এবং গোঁড়ামির মধ্যে।

সপ্তম : নায়িকার বিরহ বর্ণনায় গীতিকার কবিরা প্রায়ই পুরনো সাহিত্যের একটি বিশেষ ভঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। বারমাসী বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পটভূমিতে এই বেদনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রায় কোথাও এই বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলির মতো গতানুগতিক ও বর্ণহীন হয়ে পড়েনি। এবং কোথাও বিরহের মধ্য থেকে একটা দার্শনিক তত্ত্বনিষ্কাষণের চেষ্টামাত্র নেই। এ বিরহ দেহ-প্রাণ-মনের, নিঃসংশয়ে রক্ত-মাংস-আত্মার।

অষ্টম : মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রেম প্রধান, তাই নারীচরিত্রেরও অবিসংবাদী প্রাধান্য। গীতিকার কবিরা মানবপ্রেমের সুগভীর রহস্যের মূলোদ্‌ঘাটনে যে অনেক-

খানি সমর্থ হয়েছিলেন এখানেই তার প্রমাণ। হৃদয়বৃত্তির বহুবিকশিত লীলাবৈচিত্র্যে নারীচিত্তের অভিনবত্ব কবিরা পরম কৌতূহল ভরে লক্ষ্য করেছেন এবং অঙ্কিতও করেছেন। হৃদয়ের অপ্রতিরোধ্য গতিতে কিংবা সচেতন ক্রিয়ায় অনুভূতির সুগভীর তীব্রতায় নারীরাই মৈমনসিংহ গীতিকার নিয়ন্ত্রণী শক্তি। আর এর চরম গৌরব আত্মত্যাগে। এ আত্মত্যাগ প্রেমের জন্য, প্রিয়তমের জন্য। প্রিয়জনের বিরহে কেউ ঝরা ফুলের মতো শুকিয়ে গেছে [মদিনা ও লীলা], কেউ বা আপন জীবনের মূল্যে প্রিয়তমের প্রাণরক্ষা করেছে [সোনাই], আবার কেউ প্রিয়তমের প্রাণরক্ষায় অপারগ হয়ে পূর্বাহ্নেই আত্মবিসর্জন দিয়েছে [মহুয়া]।

ট্রাজেডি

ট্রাজেডি এক বিশেষ রসের বিশেষ প্রকৃতির সাহিত্য-সৃষ্টি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এক রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া কোথাও এই বিশিষ্ট রসের সাক্ষাৎ মেলে না। পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু প্রাচীন কাল থেকেই ট্রাজেডি রচিত হয়েছে। গ্রীক নাটকের নিয়তিকল্পনা থেকে সেক্সপীয়রীয় চারিত্র-দ্বন্দ্ব অথবা অতি আধুনিক নাট্যকারদের চরিত্র ও সমাজগত নানা সূক্ষ্ম ঘাত প্রতিঘাত—এমনি বহু বিচিত্র পথে কল্পনা বিবর্তিত হয়েছে।

তবে প্রাচীন কালে এবং বর্তমানের অল্পশক্তিসম্পন্ন লেখকদের নাটক ও কাব্যে ট্রাজেডির দায়িত্ব একান্তভাবেই বাহ্য ঘটনার। বহুস্থানেই বাইরের কোন দুর্ধর্ষ শক্তি —সে কোন ভিলেনই হোক বা অজ্ঞাত নিয়তিই হোক—সমগ্র বেদনাময় পরিণতিকে সম্ভাবিত করেছে। নায়ক-নায়িকার অকস্মাৎ মৃত্যুই সেখানে ট্রাজেডির নিদান।

কিন্তু এ ধরনের ট্রাজেডি মানুষের মনে খুব গভীর দাগ কাটতে পারে না, কারণ এর আবেদন যতটা ঘটনা-নির্ভর, ততটা চরিত্র-কেন্দ্রিক নয়। মানবমনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত এর আবেদন প্রসারিত নয়। তাই দেখা যায় অনেক সময়েই এ ধরনের ট্রাজেডি হয় আকস্মিক ও বাহ্যিক,—এর অনিবার্যতা ও গভীরতা প্রায়ই স্বীকার করা চলে না।

আধুনিককালে ট্রাজেডি হয়ে উঠেছে অন্তরাশ্রয়ী। সেখানে মৃত্যু হয়ত একমাত্র পরিণাম নয়। বেঁচে থেকে কষ্টভোগ করায় যে মানস-সংঘাত যার ফলে হৃদয়ের সব সৌন্দর্য, সব মাধুর্য নিঃশেষে অবক্ষয়িত হয় তার মধ্যেই রয়েছে সাহিত্যিক রসাস্বাদের অপার্থিব আনন্দ।

ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যে প্রাগাধুনিক কালে ট্রাজেডি রচিত হয়নি। উনিশ শতকের বাংলা নাট্যকারদের ট্রাজেডি রচনার কৈফিয়ৎ হিসেবে দীর্ঘ ভূমিকা ফাঁদতে হয়েছে। তাই বলা চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে সেকালে মৈমনসিংহ গীতিকায়ই চলেছে ট্রাজেডির একক আয়োজন। সে যুগে যে কাহিনীর অনিবার্য গতি ট্রাজেডিমুখিন তাকেও সর্বাঙ্গীন আনন্দে পরিসমাপ্ত করে ভারতীয় মন শান্তিলাভ

করেছে। চাঁদসদাগরের বিধ্বস্ত হৃদয়ের উপরে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য তাই মনসাপূজার মণ্ডপ প্রস্তুত করেছে, মৃত্যুকে নিয়ে জীবনকামনায় বেহুলার যে মহাপ্রস্থান তার আত্যন্তিক বেদনাকে অলৌকিক মিলনে পর্যবসিত করা হয়েছে।

পুরানো বাংলা সাহিত্যে মৈমনসিংহ গীতিকার কতকগুলি গাথায়ই আমরা ট্রাজেডির সন্ধান পাই। সেখানে মানুষের কামনা অপূর্ণ থেকেই দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছে ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, কখনও চোদ্দডিঙা ভরে জীবনের সব সাধনার ধনকে দ্বারদেশে উপস্থিত করেনি। মৈমনসিংহ গীতিকাই পুরনো বাংলার একমাত্র সাহিত্য-সৃষ্টি যেখানে ভক্তির মন্ত্রে অথবা অলৌকিক প্রভাবে কিংবা উৎসবানুষ্ঠানের আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনায় হৃদয়ের বেদনাকে আনন্দমণ্ডিত করবার চেষ্টামাত্র লক্ষিত হয় না।

এ কথা অবশ্য সত্য যে মৈমনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ স্থলেই কাহিনীর সমাপ্তি মৃত্যুতে এবং এতে বাইরের বিরোধী শক্তির ভূমিকাও অনুল্লেখ্য নয়। কিন্তু এই বাইরের শক্তিই ট্রাজেডির অবিসংবাদী কারণ নয়, বহুস্থলে মানবপ্রবৃত্তি, মানব-চরিত্র ও মানবভাগ্যের গভীর উৎসে এই ট্রাজেডির বীজ নিহিত।

গীতিকাগুলির মধ্যে কতকগুলিতে ট্রাজেডি ঘটেছে নারীসৌন্দর্যের মাদকতাময় আকর্ষণের ফলে। মহুয়া, মলুয়া ও দেওয়ান ভাবনা গাথা তিনটি এই শ্রেণীভুক্ত। এগুলির মধ্যে নারীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই পুরানো প্রবচন মানুষের প্রবৃত্তির মধুরসে ও হলাহলে মিশ্রিত হয়ে ফুটে উঠেছে: 'অপণা মাঁসে হরিণা বৈরী' আপনার সৌন্দর্যই আকর্ষণ করেছে তাদের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয়কে।

মলুয়া কাব্যে এই ট্রাজেডি কিন্তু নারীচরিত্র ও ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতির মধ্যে অনুস্যূত হয়নি। মলুয়ার জীবননাট্যকে সহজেই দুইভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম ভাগে চাঁদবিনোদের সঙ্গে তার প্রণয় ও বিবাহ এবং দ্বিতীয়ভাগে দেওয়ানের কাম-লালসা ও তার পরিণতি। এতে অবশ্য সন্দেহ নেই যে পরিসমাপ্তিতে হিন্দু সমাজের কূপমণ্ডুকতাও মলুয়ার মৃত্যুবাণে তার বিষ মাখিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সমগ্র ঘটনা যেন অনিবার্য নয়। বিশেষ করে মলুয়ার ট্রাজেডির যে কেন্দ্রীয় শক্তি অর্থাৎ মুসলমান দেওয়ানের অত্যাচার—তা একাই বহিরাগত।

অপরপক্ষে মহুয়া ও নদেরচাঁদের মৃত্যুর জন্য হুমরার দায়িত্ব কিন্তু একান্ত বহিরাগত নয়। প্রথম থেকেই মহুয়া-নদেরচাঁদের মিলন-মধুর, বিরহ-করুণ প্রেমের পশ্চাতে হুমরার রুদ্রদৃষ্টির আগুন জ্বলেছিল। প্রথম থেকেই সে মহুয়াকে নদেরচাঁদ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে, এমনকি নদেরচাঁদকে হত্যা করেও মহুয়ার জীবনের স্বাভাবিকগতিকে বাধাহীন করতে চেয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাজীকরী যাযাবরী যুবতীর 'আগল ডাগল আঁখিরে আসমানের তারা' দেখে নদেরচাঁদের মতো ধীরস্থির ব্রাহ্মণকুমারের গৃহ-সংসার সমাজধর্ম ত্যাগ করে তার খোঁজে ঘুরে বেড়ানো, অগ্নিশিখায় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট পতঙ্গের ভয়ঙ্কর পরিণতিকেই যেন চোখের সামনে অনিবার্য করে তোলে। তৃতীয়ত, মহুয়ার এই সৌন্দর্যের উন্মাদনা কেবল নদেরচাঁদকে গৃহের শান্ত

জীবন থেকে টেনে আনেনি, বারবার সদাগর অথবা ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরও লেলিহান লালসা জাগিয়ে তুলেছে। ঐ সৌন্দর্যের মধ্যে এ কী ভীষণ অগ্নিতেজের ও ধ্বংস-ক্ষমতার ইঙ্গিত কবি করেছেন। এই কাব্যে তাই ট্রাজেডি অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত।

সোনাই-এর ট্রাজেডিতে নূতনত্ব আছে। স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য সে বিষপানে প্রাণত্যাগ করেছে, দেওয়ান ভাবনার হাতে আপনাকে সঁপে দিতে গিয়ে। কিন্তু এর মধ্যে এক অসাধারণত্বের ব্যঞ্জনা আছে। সোনাই প্রেমকে রক্ষা করবার জন্য কামের হাতে আপন দেহকে দান করেছে। মৃত্যু তো রূপক মাত্র। আত্মাকে রক্ষা করবার জন্য দেহ দান—'sold her skin to save her soul'—যুগে যুগে মানুষের ট্রাজেডির এ এক চরম রূপ।

অপর কাব্যগুলির মধ্যে ট্রাজেডি ঘটেছে সমাজবোধের সঙ্গে হৃদয়ের সংঘর্ষে। কঙ্ক ও লীলায় লীলা ঝরে পড়েছে শুকনো ফুলের মতো। কিন্তু সত্যকার ট্রাজিক মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন গর্গ। তাঁর চরিত্রে একদিকে পিতৃস্নেহ অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজবোধের অবক্ষয়ী দ্বন্দ্ব সুন্দর তুলিতে অঙ্কন করেছেন কবি।

দেওয়ানা মদিনায় দুলাল চাষীকন্যা মদিনাকে ত্যাগ করেছে দেওয়ানী লাভ করে, মদিনার মৃত্যু ঘটেছে ধীরে ধীরে অবহেলার তীব্র বেদনা বক্ষে বহন করে। কিন্তু আসল ট্রাজেডি দুলালের প্রত্যাগমনে; কারণ উচ্চ সমাজের শ্রেণী-দম্ভে সে প্রেমকে আঘাত করেছে, আপন আত্মাকে করেছে দ্বিখণ্ডিত, তার বেদনা তাই দুঃসহ।

চন্দ্রাবতীতেও দ্বন্দ্ব চলেছে ধর্মত্যাগী এবং প্রণয়ে বিশ্বাসহন্তা জয়ানন্দকে ভুলবার চেষ্টা ও ঐকান্তিক হৃদয়াকর্ষণের মধ্যে।

মৈমনসিংহ গীতিকায় তাই ঘটনাগত কারুণ্যের সঙ্গে চিত্তগত দুঃসহ অবক্ষয় যুক্ত হয়ে বেদনার অশ্রুপ্লাবনকে প্রায়ই ট্রাজেডির মহিমায় সমুন্নীত করেছে।

শ্রেণীবিভাগ

মৈমনসিংহ গীতিকায় সংকলিত কাব্যগুলিকে ভাবকেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। ১. সমাজ-সংস্কার ও ব্যক্তিহৃদয়ের সংঘর্ষ ও তার ফলে ট্রাজেডি—চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ানা মদিনা। ২. নারীসৌন্দর্য, তজ্জাত বিপর্যয় ও ট্রাজেডি—দেওয়ান ভাবনা, মলুয়া, মহুয়া [মলুয়ার যথার্থ স্থান সম্পর্কে একটু দ্বিধা থেকে যায়]। ৩. নারী-সৌন্দর্য, তজ্জাত বিপর্যয় কিন্তু মিলনান্ত পরিণতি—কমলা, রূপবতী। ৪. মানব চরিত্রে কাব্যরসের প্রভাব—দস্যু কেনারামের পালা। ৫. রূপকথা—কাজলরেখা।

চন্দ্রাবতী

চন্দ্রাবতী গাথাটির আখ্যান-গ্রন্থন নিখুঁত। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে কেবলমাত্র অতি-

প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলিকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করে কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। গীতিকাটির নাটকীয় গুণধর্ম অনস্বীকার্য চমৎকারিত্বে কাহিনীকে মণ্ডিত করেছে। নাটকীয় গুণধর্ম বলতে আমরা প্রধানত বুঝি action বা ঘটনাসঙ্কুল পরিস্থিতি এবং conflict বা ব্যক্তিত্বের সহিত ব্যক্তিত্বের, প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির কিংবা বিপরীত ঘটনার মধ্যকার সংঘাত। আলোচ্য গীতিকায় এই দুটি লক্ষণই প্রবল। জয়ানন্দ কর্তৃক চন্দ্রাবতীকে পত্রপ্রেরণ, চন্দ্রাবতীর বিচলিত হওয়া ; বিবাহের প্রাক্কালে আকস্মিক আঘাতে সাধের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া বেশ নাটকীয়ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শেষ দৃশ্যে এই নাটকীয়তা ট্রাজেডি-কল্পনার সঙ্গে সমন্বিত। একদিকে ধর্মত্যাগী এবং প্রণয়ে বিশ্বাসহন্তা জয়ানন্দের প্রতি হৃদয়ের প্রবল আকর্ষণ আর অপরদিকে আপনার চেতনার একান্ত গভীরে ধর্মনিষ্ঠা ও সমাজ-সংস্কার। এদের দ্বন্দ্ব ট্রাজেডির করুণ নির্মম ও শ্বাসরোধকারী পরিবেশটিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

চন্দ্রাবতী নারীসৌন্দর্য, তজ্জাত মোহ ও বিপর্যয়ের কাহিনী নয়। কিন্তু এর মধ্যেও সৌন্দর্যমোহের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জয়ানন্দ হঠাৎ একদিন চন্দ্রাবতীর যৌবন-সৌন্দর্যের মাদকতায় মুগ্ধ হয়ে প্রেম প্রার্থনা করেনি। আবাল্য-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান চলেছে। জয়ানন্দের পত্র ও চন্দ্রাবতীর উত্তরে এর চরম প্রকাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কবি চন্দ্রাবতীর দেহসৌন্দর্যের বর্ণনা এখানে করেননি অন্য গাথার মতো। কারণ চন্দ্রাবতীর সৌন্দর্য মুহূর্তের দর্শনে চেতনাকে অগ্নিস্পৃষ্ট পতঙ্গবৎ পুড়িয়ে দেয় না, আত্মাকে ধীরে ধীরে আবিষ্ট ও ধ্যানস্তম্ভিত করে তোলে।

কিন্তু জয়ানন্দের পতঙ্গ-প্রাণ কোন অগ্নি-শিখার স্পর্শলালসায় অন্তরে অন্তরে অপেক্ষা করছিল, তাই অকস্মাৎ বিপর্যয় ঘনিয়ে এল। চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের প্রেম বিবাহে পরিণত হতে যাচ্ছিল, এমন সময় : 'ঘাটে আস্যা বিনা ঝড়ে ডুবে সাধুর না।'

জয়ানন্দ মুসলমান যুবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ধর্মত্যাগ করল, প্রথম দর্শনের মোহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

চন্দ্রাবতীর মনের উপরে যে আঘাত এল তা একটু বিচিত্র ধরনের। এ কেবল বাইরের কতকগুলো ঘটনার আঘাত নয়, জয়ানন্দ তাঁর হৃদয়ের প্রেমকে আঘাত করেছে—এ আঘাত হৃদয় দ্বারা হৃদয়ে আঘাত। তাই সে গীতিকার অন্যান্য নায়িকার ন্যায় বিনিয়ে বিনিয়ে বারমাসী কাঁদল না : 'না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী। / আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী ॥'

সত্যই সে পাষাণ হয়ে গেল : 'নির্মাইয়া পাষাণ শিলা বানাইয়া মন্দির। / শিবপূজা করে কন্যা মন করি স্থির ॥'

এই মন স্থির করার চেষ্টাই চন্দ্রার জীবনের বড় ট্রাজেডি।

সমাজ এই গাথায় বাইরে থেকে আঘাত করেনি, সে মনের কোণে বাসা বেঁধেছে, আর তার উপর বড় হয়ে উঠেছে জয়ানন্দের নির্মম ব্যবহারে প্রেমের চরম অপমান। কিন্তু তবুও জয়ানন্দ যখন অনুতাপ করে দেখা করতে চাইল, কি করে চন্দ্রা তাকে ফেরাবে? যতই সে অপরাধ করুক, অপমান করুক প্রেমকে, উৎপাটিত করুক হৃদয়ের কোমল কোরক—চন্দ্রা তো তার দোষগুণ বিচার করে ভালবাসেনি, সে সম্পূর্ণ মানুষটাকে ভালোবেসেছিল। তবুও সে আপন হৃদয়কে শৃঙ্খলিত করল, জয়ানন্দকে ভুলবার চেষ্টা করল, শিবপূজার একনিষ্ঠায় বোধ হয় শান্তিও পেল—সাময়িক শান্তি। কিন্তু সব বৃথা। প্রেমরূপ কালসর্প যার মস্তকে ব্রহ্মতালুতে দংশন করেছে কোন মন্ত্রতন্ত্র—ওষুধ-বিষুধই তাকে বাঁচাতে পারে না। জয়ানন্দের স্পর্শে অপবিত্র মন্দিরকে নদীর জলে ধৌত করতে গিয়ে সে যখন দেখল: 'দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান। / ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নমাসীর চান ॥ / আঁখিতে পলক নাই মুখে নাই বাণী। / পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী।

অপবিত্র মন্দিরকে আর পবিত্র করা হল না—দোষগুণ ছাপিয়ে মানুষ বড় হল, নিবৃত্তির চেষ্টা মিথ্যা হল, চন্দ্রাবতীর এই ট্রাজেডি তার প্রেমকেই জয়ী করল।

কঙ্ক ও লীলা

কঙ্কের কবি-ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক সত্য বলেই মনে হয়। তাঁর রচিত বিদ্যাসুন্দর এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালির পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ভিত্তিতে ঐতিহাসিক সত্য থাকলেও কবি কল্পনায় যে গাথাটিকে একটি রোমান্টিক কাহিনী হিসেবেই গড়ে তুলেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে ঐতিহাসিক তথ্যের হয়ত প্রচুর বিকৃতি ঘটেছে কিন্তু এর কাব্যমূল্য অনেক বেড়ে গেছে।

এই কাহিনীটিতে সমাজশক্তির সঙ্গে মানবীয় স্নেহ-প্রেম ও মুক্তবুদ্ধির দ্বন্দ্ব রূপায়িত। ব্রাহ্মণের পুত্র কঙ্ক আবাল্য চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছে, গর্গ কিন্তু তাকে গৃহে স্থান দিয়ে পুত্রবৎ পালন করতে দ্বিধামাত্র করেননি। আপন মুক্তবুদ্ধিতে কিংবা বালসুলভ কৌতূহলে কঙ্ক মুসলমান ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার মন থেকে কৃষ্ণভক্তি গৌরভক্তি চলে যায়নি। ধর্মবোধের এমন এক সমন্বিত ও সুষম ধারণা সত্যই বিরল। কিন্তু বাধা এসেছে সমাজশক্তির কাছ থেকে। তারা কঙ্কের জীবন ও কর্মগত এসব অনাচারকে আদৌ সহ্য করতে রাজী নয়। গর্গকে তারা ধর্ম ও শাস্ত্রীয় যুক্তিতে পরাভূত করতে না পেরে তার হৃদয়ের কোমলতম স্থানে আঘাত করল। তার কন্যা লীলাকে জড়িয়ে কঙ্কের নামে কলঙ্ক প্রচার করল তারা, কাজেই সামাজিক শক্তির আক্রমণ এখানেও বাইরের রূপহীনশক্তি হিসেবেই দেখা দেয়নি, মানুষের মানসিক বৃত্তির রূপ ধরে সে আবির্ভূত হয়েছে এবং ট্রাজেডি সম্ভাবিত করেছে।

গর্গের চরিত্র অঙ্কনে কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তার চরিত্রে

একদিকে প্রচণ্ড বিত্তাবত্তা অপরদিকে সহানুভূতিশীল একটি মুক্ত সুন্দর হৃদয় আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সংস্কার তাকেও শেষ পর্যন্ত কঙ্কের হাতে বিষ তুলে দিতে প্ররোচিত করেছে। এই ঘটনার পরেই গর্গের যে মানসিক অবস্থা তা চরিত্রটিকে বুঝবার দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ : 'গর্গের হইল কিবা শুন বিবরণ। / চৌদিকে পাগলপ্রায় করিল ভ্রমণ॥ / সারারাত্রি অনিদ্রায় ফিরি ঘুরে ঘুরে। / প্রভাতে ফিরিল গর্গ আপনার ঘরে।... / চারিদিকে শূন্যময় শুধু হাহাকার। / এত বেলা হলো কেহ না খোলে দুয়ার॥ / মালতি-মল্লিকা পড়ে ঝরিয়া ভূতলে। / ভ্রমরা উড়িয়া যায় নাহি বসে ফুলে ॥ .. / পুষনিয়া পাখী যত নীরব খাঁচায়। / নাহি ডাকে কঙ্কে তারা না ডাকে লীলায়॥ / প্রভাতে আসিয়া গর্গ আশ্রমে প্রবেশে। / নয়নেতে নিদ্রা নাই পাগলিয়া বেশে॥ / আশ্রমে পশিয়া গর্গ দেখিলা তখন। / কালবিষে সুরভি যে ত্যজিছে জীবন॥ / হাম্বারবে মা মা বলি ডাকিছে পাটলী। / গর্গের পাষাণ প্রাণ আজি গেল গলি॥ / কাতরে মায়ের কাছে হাম্বারবে ধায়। / কভু বা আসিয়া গর্গের চরণে লুটায়॥'

গর্গের তীব্র অন্তর্জ্বালা ও সুগভীর বেদনা এই পঙ্‌ক্তিগুলিকে অবলম্বন করে আবর্তিত। মন্দিরে দেবতার আদেশও কেবল তার আপন মনেরই প্রতিধ্বনি। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ই জয়লাভ করেছে, কঙ্ককে ফিরে পাবার জন্য গর্গের আকুলতার মধ্যেই এর পরিচয়। কিন্তু চিত্তবৃত্তিকে আঘাত করলে সেও প্রত্যাঘাত করে। এর নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ ; লীলার মৃত্যুতে এরই দ্যোতনা।

লীলা ও কঙ্কের সম্পর্কটির অস্পষ্ট অনির্দিষ্টতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। একে যেমন একান্তভাবে সৌভ্রাত্র বলে উল্লেখ করা চলে না, তেমনি প্রেম বলতে মন সায় পায় না। আবাল্য পরিচিতি প্রেমে পরিণতি পাবার কিছু পূর্বের অবস্থা এ কবিতায় চিত্রিত। কঙ্ক-লীলার ভালোবাসা সৌহার্দ্যের চেয়ে কিছু বেশি, কিন্তু প্রেমবোধের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এমন সময় কঙ্কের নানা বেদনা ও অপমান সয়ে চলে যাবার আঘাত রাতারাতি লীলার চিত্তলোকে প্রেমজ বিরহবেদনার সৃষ্টি করেছে বলা চলে।

লীলার মৃত্যু বর্ণনার চমৎকারিত্ব পাঠকমাত্রকে মুগ্ধ করবে। লীলার সঙ্গে চার পাশের প্রকৃতির যেন একটি সহজ যোগ ছিল। তাদের কাছে লীলা আপন হৃদয়ের অতি গভীর ও তীব্র আর্তি প্রকাশ করেছে। লীলার ছয়মাসী গানে প্রকৃতির পরিবেশ মানবপ্রবৃত্তির পটভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সব ফুরিয়েছে : 'প্রথম যৈবন কন্যা কমনীয় লতা। / সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষুকের পাতা। নাসিকা হালিয়া পড়ে শ্বাস বহে ঘনে। / মরণ বসিল আসি নয়নের কোণে॥ / বৈকালের রাঙা ধনু মেঘেতে লুকায়। / দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায়॥ / সব আশা মিছারে হইল লীলার প্রাণমাত্র বাকী। / একদিন উইরা গেল পিঞ্জরের পাখী।

দেওয়ানা মদিনা

আপাতদৃষ্টিতে কাহিনীটিতে ঐক্যের অভাব আছে বলে মনে হয়। দুলালের জীবনের দুটি ঘটনার বিস্তৃতিতে গীতিকাটি কিছুটা দ্বিধাদীর্ণ। বিমাতার ষড়যন্ত্রে আলাল দুলালের জীবনান্ত হবার আশঙ্কা ও ভাগ্যবলে তাদের জীবনলাভ রূপকথার ছাঁদে রচিত,—ঠাকুমার ঝুলির শীত-বসন্তের গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুলালের সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার জন্য আপন প্রিয়তম পত্নীকে অস্বীকার এবং তার ফলে জীবন-বিফলতা কাহিনীর অপর স্বাধীন অংশ। এই দুই অংশের সম্বন্ধটি কি অচ্ছেদ্য ? অবশ্য গ্রীক ট্রাজেডির অতি সরল এবং কিছুমাত্র দ্বিধাহীন একমুখিন ঐক্যের কথা ছেড়ে দিলে মদিনার পালায় ঐক্য একেবারেই ব্যাহত হয়েছে একথা বলা চলে না : মদিনার পালায় দুলাল-মদিনার প্রেম-বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর কাহিনীটিই প্রধান। কিন্তু দুলালের জীবনের পূর্ব-কাহিনী এই ট্রাজেডির সম্ভাব্যতাকে বাস্তব করে তুলেছে। দুলালের দেওয়ানি আভিজাত্য তার রক্তের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এতকাল লুপ্ত ছিল ; তা না হলে তার দেওয়ানিলাভ কাহিনী হিসেবে রূপকথার মতো অবাস্তব এবং দেওয়ানি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মদিনাকে তালাকনামা লিখে দেওয়া কেবলই অর্থগৃধ্নু নীচতার পরিচয় হত। বিশেষ করে আলালের অকপট ভ্রাতৃস্নেহ এ গল্পের ট্রাজেডিকে একটি অভিনব সুর দিয়েছে। বাইরের কোন শত্রু ট্রাজেডির বাস্তব ঘটনাগত পরিবেশ সৃষ্টি করেনি, ভাইয়ের ঐকান্তিক ভালোবাসাই এই বেদনাকে বহন করে এনেছে। তবুও স্বীকার্য যে প্রথম দিকের কাহিনী অংশের অতিপল্লবিত বিস্তৃতি ঐক্যের কিছুটা হানি ঘটিয়েছে।

সামাজিক মর্যাদাবোধ ও শ্রেণীবিরোধই বর্তমান কবিতায় ট্রাজেডি সম্ভাবিত করেছে। কিন্তু এই সমাজশক্তি কেবল বাইরে থেকে এসে দুলাল ও মদিনার জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়নি। এর ক্রিয়া চলেছে দুলালের মনোজগতে। দুলালের মনে দ্বন্দ্বের একটি বীজও কবি উপ্ত করেছেন। সে যুগে কাব্যে মানস-দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ দেখাবার কোন সুযোগ থাকলে দুলাল চরিত্রটি অতি উচ্চ ট্রাজিক গৌরবে মহিমান্বিত হতে পারত। একদিকে মদিনার সঙ্গে তার আবাল্যবর্ধিত প্রেম, অন্যদিকে তার নবলব্ধ সামাজিক মর্যাদা। সে দেওয়ান হয়ে সামান্য চাষা-কন্যাকে কি করে স্বীকার করবে আপন পত্নী বলে ? সে সুরুষজামালকে ফিরিয়ে দিয়েছে কিন্তু আপন হৃদয়দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারেনি। অন্তরের গভীরে সমাজপার্থক্যকে সে স্বীকার করেনি। তাই যখন দেখি জীর্ণবসনের মতো দেওয়ানির তক্তকে পদদলিত করে সে গ্রামের অভিমুখে চলেছে তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে হৃদয়াভ্যন্তরালে ক্রিয়াশীল মানস-দ্বন্দ্বই শেষপর্যন্ত তাকে এই পথে নিয়ে গেছে।

মদিনার প্রেমের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার বিরহক্রন্দনে। সে দুলালকে ভালোবেসেছে তাদের দৈনন্দিন কৃষিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। তাদের ক্ষেতচষা,

বীজবোনা, ফসল কাটার যে আনন্দ তার মধ্যেই জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে তাদের প্রেম : 'দারুন মাঘ না মাস শীতে কাঁপয়ে পরাণি। / পতাবর উঠ্যা খসম সাইল ক্ষেতে দেয় পানী ॥ / আগুন লইয়া আমি যাই ক্ষেতের পানে। / পরার অইলে আগুন তাপাই দুইজনে ॥ / সাইলের দাওয়া মারি দুয়ে যতনে তুলিয়া। / সুখে দিন যায় রে আমরার ঘরেতে বসিয়া।'

এ প্রেম প্রথম দর্শনের নয়, কেবলমাত্র রূপমোহও নয়। এ প্রেমই জীবন, জীবন থেকে এ কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু মাটির পৃথিবীর এই প্রেমের উচ্ছ্বসিত সত্য স্বর্গের অমৃতকে স্পর্শ করেছে যেখানে প্রিয়-বিরহে মদিনা : 'কান্দিয়া কান্দিয়া বিবির সুখে দিন যায়। / খানা পিনা ছাড়্যা করে হায় হায় ॥ / তারপর না একদিন সগল চিন্তা রইয়া। / বেস্তে হুরী না গেলে বেস্তেতে চলিয়া ॥

দেওয়ান ভাবনা

কাহিনীর আরম্ভ আকস্মিক, প্রায়-নাটকীয়। সোনাই-এর ক্রমবিকশিত যৌবন-সৌন্দর্যের বর্ণনায় গল্পটির শুরু : 'পরম সুন্দরী সুনাইগো দীঘল মাথার চুল। / মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইর যো শতেক চম্পার ফুল ॥ / মামায়ত দিয়াছে কিন্যারে পাছা নীলাম্বরী। / জল ভরিতে যায় সুনাইগো কাকেঁতে গাগরী ॥ / নদীর পারে কেওয়া বনরে ফুটল কেওয়া ফুল। / তার গন্ধে উইরা করে ভমরারা রুল ॥ / কাক্ষেতে গাগরী সুনাইর গো পৈরনে নীলাম্বরী। / পন্থেতে মানুষ চাইয়া থাকে গো শুনাইরে না হেরি ॥ / অঙ্গের লাবণি সুনাইরগো বাইয়া পড়ে ভূমে। / বার বছরের কন্যাগো পইড়াছে যৈবনে ॥ / আষাঢ় মাসে দীঘলা পানসীরে নয়া জলে ভাসে। / সেহি মত সুনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে ॥

আর এই যৌবন-সৌন্দর্যের বিষে আত্ম-ধ্বংসের মধ্যেই গল্পটির শেষ : 'নিশি রাইত মেঘে হাল্কা আসমানে নাই তারা ॥/বারবাংলার ঘরে সুনাই চৌদিকে পাহারা ॥ / আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশা যামিনী। / বিষের কটরা খুলে কন্যা জনম দুঃখিনী ॥

প্রত্যক্ষতই কাব্যটিতে ঘটেছে সৌন্দর্য-সমুদ্র-মন্থন, আর পাঠকচিত্তে তারই বিষামৃত আস্বাদন। যৌবন-সৌন্দর্যের এই মাদকতার চারপাশে ঘটনাগত সংঘাতের চলেছে এক প্রবল আবর্তন। দেওয়ান ভাবনার অনুচরদের দ্বারা সুনাইকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া, মাঝপথে মাধব-কর্তৃক সুনাই-এর উদ্ধারসাধন, মাধবের পিতাকে দেওয়ান ভাবনার বন্দী করা, পিতার উদ্ধারে মাধবের যাত্রা ও বন্দী হওয়া এবং পরিশেষে মাধবকে উদ্ধার করবার জন্য সুনাই-এর আত্মদান মধ্যযুগের য়ুরোপীয় রোমান্টিক বীরকাহিনীগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গীতিকায় ঘটনা-সংস্থানের নাটকীয়তা, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনীর অগ্রগতি, ঘটনাস্রোতের সরল একমুখিনতা এবং গম্ভীর ও উন্নত ট্রাজিক মহিমায় পরিসমাপ্তি। কাব্যটির গ্রন্থন হৃদয়গ্রাহী এবং

নিখুঁত। মহুয়া, কমলা ও চন্দ্রাবতী ছাড়া মৈমনসিংহ গীতিকার অপর কোন কাব্যেই এমন নাটকীয় সৌন্দর্য ও অসূচিভেদ্য গঠন-নৈপুণ্যের সন্ধান মিলবে না।

সুনাই-এর আত্মদানের বিশিষ্টতা যে সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একথা বলেছি। স্বামীর প্রাণরক্ষায় আত্মবিসর্জন এ-দেশীয় নারীজাতির মহান ঐতিহ্য। কিন্তু এর মধ্যেও সুনাই একটু অভিনব। প্রেমিককে বাঁচাতে সে মূর্তিমান কামের নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছে। বিষপানে মৃত্যু বাইরের রূপকমাত্র, না দেখালেও কাহিনীর মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব হত না, বৃদ্ধিই পেত।

মলুয়া

মলুয়ার গল্প-গ্রন্থনে ত্রুটি আছে। আরও পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে, কোন সচেতন কবির হাতের ছাপ এতে পড়েনি, বহুজনের হাতের চাপে এর অঙ্গ-বিকৃতি ঘটেছে। গল্পে ঐক্য নেই, ভাব-লক্ষ্য বহু-দীর্ণ, সমাপ্তির মুখোমুখি নূতনতর সমস্যা যোজনার চেষ্টা আছে—সর্বসাকুল্যে মৈমনসিংহ-গীতিকায় কাব্য গঠনের যে সাধারণ নৈপুণ্য, মলুয়ায় তার সাধর্ম লক্ষিত হয় না।

একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত গল্পের যে গতি দ্বাদশ অধ্যায় থেকে তা সম্পূর্ণ অবহেলিত। মলুয়া ও চাঁদবিনোদের সাক্ষাৎকার থেকে বিবাহ পর্যন্ত ঘটনার বিস্তৃতি সমগ্র কাহিনীটির অনধিক অর্ধাংশ। কাজীর লালসালোলুপ হস্তক্ষেপে সম্পূর্ণ নূতন গল্পের সূচনা। মলুয়া ও চাঁদবিনোদের পূর্বরাগ ও বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা এখানে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন দুটি কাহিনীকে অকারণে অপ্রয়োজনে এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

গল্পরসের বিচারেও প্রথম কাহিনীটি অনুত্তীর্ণ। চাঁদবিনোদের দারিদ্র্য, দারিদ্র্য-নিবারণের চেষ্টায় কোড়া শিকার, মলুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ, পূর্বরাগ ও পরিশেষে বিবাহে ঘটনার কালগত অগ্রগতি আছে, কার্যকারণগত যোগসূত্র নেই, শিশুমনের প্রশ্ন 'তারপর'-এর উত্তর আছে, কিন্তু 'তার ফলে'-এর উত্তর সেখানে অনুচ্চারিত। ঘটনা তাই সেখানে প্লট হয়ে ওঠেনি। কারণ গল্প কেবল কালের সূত্রে অগ্রগতি নয়, দ্বন্দ্বে ও তার সমীকরণ-চেষ্টায় পারম্পর্য-রক্ষা। অর্থাৎ মৌলদ্বন্দ্বের বীজেই গল্পের শাখাকাণ্ড সমন্বিত বৃক্ষের জন্ম, তার ফুল ফোটা। মলুয়ার প্রথম অংশে কোন দ্বন্দ্ব নেই, সমস্যা নেই, তাই ঘটনা সেখানে গল্প হয়ে ওঠেনি, শেষ দিকে মলুয়ার পিতা চাঁদবিনোদের দারিদ্র্যের কথা তোলায় একটা সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, তাকে রূপকথার আদলে মুহূর্তেই সমাহিত করা হয়েছে। সর্বরিক্ততা থেকে স্বচ্ছলতায় পৌছতে চাঁদবিনোদের সামান্য সময়ই ব্যয়িত হয়েছে, কাব্যে মাত্র দুটি শ্লোকের আয়োজনই যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন কবি।

বরং দ্বিতীয় অংশে গল্পরস আছে, কারণ বিরোধ আছে। কাজীর লালসার

বিরুদ্ধে মলুয়ার সদাজাগ্রত মানসিকতা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার পঞ্চভ্রাতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ আমাদের কৌতূহলকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ অংশে ঘটনার ঘন-সমাবেশ আছে, এমনকি এই সমাবেশে কিছুটা বাহুল্য ঘটেছে মনে করাও চলে। মলুয়াকে হরণ করবার আগে চাঁদবিনোদকে কবর দেবার চেষ্টা এবং পাঁচ ভাইয়ের বীরত্বে তার উদ্ধার সাধন ঘটনার বোঝা বাড়িয়েছে, গল্পের সুগভীর তাৎপর্যের কোন দ্বার উন্মুক্ত করেনি। আবার প্রায় সমাপ্তির কাছে এসে চাঁদবিনোদের কোড়া শিকারে গিয়ে সর্পাঘাতে মৃত্যু ও জীবনলাভ গল্পের এক নবতর উপশাখা যোজনার প্রচেষ্টা হিসেবেই উপস্থাপিত। এ জাতীয় 'late introduction of new design' গল্পকে জটিল করে, অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করে না।

একদিক থেকে আবার গল্পটি রূপকথার প্রান্তশায়ী। চাঁদবিনোদের অবস্থার রাতারাতি আমূল পরিবর্তন, কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই দেওয়ান কাজীর ভূমিকা আরোপ, মৃত চাঁদবিনোদের অতি সহজে জীবনলাভ এবং সবশেষে মলুয়ার মৃত্যুর রহস্যমণ্ডিত প্রক্রিয়া, মনপবনের নৌকার বারংবার উল্লেখ প্রভৃতিতে নিসংশয়ে রূপকথার স্পর্শ লেগেছে।

মলুয়া গল্পে বিভিন্ন গীতিকার নানা অংশের মিশ্রণ ঘটেছে কিন্তু তার আত্মীকরণ ঘটেনি। বহুলোকের যদৃচ্ছ লেখার সমন্বয় বলে তাই একে মাঝে মাঝে মনে হয়।

মলুয়ার ভাবকেন্দ্রে একারণে দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক। রূপমোহের প্রজ্বলিত অগ্নিতে তার আত্মদান অথবা সমাজের দুর্মর রক্ষণশীলতায় তার জীবনের যবনিকাপাত—ঠিক মূল থিম নয়। বরং বলা চলে সৌন্দর্যের দীপ্তি যে বিপর্যয়কে আকর্ষণ করেছে কাজী বা দেওয়ানের লালসা-লোলুপ চেষ্টায়, বিনোদের মাতুল ইত্যাদির সামাজিক সংস্কার তাকে সম্পূর্ণ করেছে। কাজী-দেওয়ানের গৃহে যদি তার মৃত্যুবাণ নির্মিত হয়ে থাকে তো তার বিষের যোগানে বিনোদের আত্মীয়-গোষ্ঠীর দান অনস্বীকার্য। কিন্তু কোন দিক দিয়েই এ অস্ত্র মলুয়ার ব্যক্তিচরিত্রের গভীরে লালিত হয়নি। ফলে মলুয়ার জীবনে করুণ ঘটনার যথেষ্ট—হয়ত একটু মাত্রাতিরিক্তই—সমাবেশ হয়েছে, ট্রাজেডির স্বাদ নেই।

মহুয়া[১]

মহুয়ায় ঘটনার প্রাচুর্য আছে, আপাতদৃষ্টিতে তাকে ভার বলেও মনে হতে পারে। মনে হতে পারে পুনরুক্তি বলে, কিন্তু গল্পটির কেন্দ্রবীজ থেকেই তাদের বিস্তার, তাই এর ভাবাবেদন অক্ষুণ্ণ রেখে কাহিনীর কোন অংশই বর্জন সম্ভব বলে মনে হয় না। মহুয়ার দেহ-সৌন্দর্যের মাদকতাময় আকর্ষণই এ গল্পের কেন্দ্রীয় শক্তি, এবং তার অগ্নিজ্বালার সার্বিক ধ্বংসে এর সমাপ্তি। সদাগর এবং সন্ন্যাসীর ব্যবহারের ঐক্য তাই কেবল পুনরুক্তি নয়। সদাগরের কামলোলুপতা সহজেই উদ্রিক্ত হতে পারে, কিন্তু

১ আগেই ট্রাজেডি ও রোমান্সরস প্রসঙ্গে এর বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

'মহুয়ার রূপে মুনির ভোলে মন' কবি বার বার সেই ধুয়াটি আমাদের কানের কাছে ধরে দিয়েছেন। কাজেই এ-কাহিনীর মূল রসটির প্রকাশে সন্ন্যাসী-উপ-কাহিনী কেবল নদেরচাঁদকে মৃত্যুপথ থেকে বাঁচাবার উপকরণই নয়, মহুয়া চরিত্রের সঙ্গে গভীর তাৎপর্যে যুক্ত।

মহুয়া-কাহিনীতে ঘটনার একটা গতি আছে এবং সে গতি একমুখিন। এই গতির দ্রুততা পাঠকচিত্তে কৌতূহল জাগায়, অথচ এর সমাপ্তির আসন্ন বিপর্যয় একান্ত আকস্মিক নয়। দীর্ঘ সুখস্বপ্নের পরে বাস্তবের রূঢ় মাটির স্পর্শে জেগে ওঠার মতো।

মহুয়া কাব্যকাহিনীর নাট্যরস স্বভাবতই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কাব্যটি যেন অভিনয়োপযোগী করেই রচিত। বেশির ভাগই—চরিত্র এবং ঘটনার অগ্রগতি—সংলাপে অভিব্যক্ত। এবং স্থানগত বিভাগে দৃশ্য পরিকল্পনার চিহ্ন মেলে। মহুয়া কাব্যের আঙ্গিকের নিপুণ-নিটোল গঠনে নাট্যরসের বাড়তি স্বাদের সহযোগ উল্লেখযোগ্য।

আখ্যান গ্রন্থনের কেন্দ্রসংযুক্ত নিপুণ-নিটোল ঐক্য, নাট্যরস, রোমান্সরস এবং প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা—এই চার উপকরণের রাসায়নিক সংযোগ মহুয়ার সাহিত্যমূল্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিদান।

মহুয়ার প্রেমচিত্রাঙ্কন বিশেষ আলোচনার যোগ্য। মৈমনসিংহ-গীতিকার প্রেমচিত্রণের ঐশ্বর্যের মধ্যে মহুয়ার বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্টি এড়াবার নয়। নদেরচাঁদ-মহুয়ার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে রোমান্টিক প্রেমস্বপ্নের যে মাধুর্য কবি সৃষ্টি করেছেন তাতে গীতিকার প্রেম-কল্পনার সব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও একক সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

সূর্য পাটে-বসা লাল-রক্ত সন্ধ্যায় সদ্য-জাগা চাঁদের আলোয় নদেরচাঁদ-মহুয়ার প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ : 'সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি। / ভরা কলসী কাঙ্খে তোমার তুল্যা দিবাম আমি॥' প্রথম প্রেম-বেদনার আগুন হৃদয়ে জলে ওঠা : 'নিজের আগুনে আমি নিজে পুড়্যা মরি।' যৌবনচেতনার অর্ধস্ফুট ইঙ্গিত : 'কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া। / এমন যৈবন কালে নাহি দিছে বিয়া॥'

একটি বক্র উপমার ক্ষণস্থায়ী কৌতুক অকস্মাৎ সব কামনাকে খুব সোজা, হয়ত বা একটু গ্রাম্য স্থূলতার সঙ্গে উজাড় করে দেওয়া। মৃদু ভৎর্সনার কটাক্ষপাত, আর হৃদয়ের অতি গভীর কামনা অতি তীব্র রূপসম্ভোগের চিত্রাঙ্কন : 'তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।'

প্রথম দর্শনের পর পালঙ সইয়ের কাছে মহুয়া আপনার হৃদয়কে উন্মোচিত করেছে। এই প্রেমের অবশ্যম্ভাবী বিফলতার বেদনার অশ্রুতে সে আত্মোন্মোচন সিক্ত হয়ে আছে।

তারপরে একদিন গভীর রাত্রে নদীর ঘাটে তাদের মিলন। ফাল্গুন-চৈত্রের

সন্ধিক্ষণে মাঠে মাঠে তখন শালিধানের গুচ্ছে পক্বতার স্বর্ণবর্ণ ইঙ্গিত। আকাশে 'বউ কথা কও'-এর কূজন। সেদিন দিতে কেউ কিছু বাকি রাখেনি। কিন্তু এই গভীর একাত্ম মিলনের অন্তরালে আসন্ন বিচ্ছেদের ঝড়ো মেঘের সজ্জা। কি নিবিড় চাওয়া আর পাওয়ার এমনি সঙ্কীর্ণ ক্ষণস্থিতি। ফুল হলে না হয় নিবিড় কালো কেশের আকুল বিস্তারে তাকে ঢেলে একাকার করে ফেলত মহুয়া, কিন্তু নদেরচাঁদের সঙ্গে তার ব্যবধান দুস্তর, তাই মিলন অসম্ভব।

প্রেমচিত্রণের এই বর্ণবিলসিত মাধুর্য ও গহন গভীর আর্তির জন্য মহুয়া কাব্য নিঃসংশয়ে মৈমনসিংহ গীতিকা সংকলনে অনন্য।

মহুয়া চরিত্রধর্মে গীতিকার প্রেমময়ী নারীদেরই সগোত্র, কিন্তু ব্যক্তিত্ববিকাশ তার চরিত্রে অনেকটা স্পষ্ট। তার সক্রিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তি গীতিকার সব চরিত্রে মেলে না। তার রূপের উচ্ছ্বসিত মাদকতার সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিপদে অবিচল ধৈর্যের সহজ সম্মিলন ঘটেছে। হুমরার আসন্ন ছুরিকাঘাতের মুখ থেকে পলায়ন কিংবা পলায়ন সন্ন্যাসীর লোভের সামনে থেকে। আর সদাগরের লোভকে প্রচণ্ড আঘাতে নির্জিত বা বিনষ্ট করা। হুমরার কাছ থেকে পলায়ন, কারণ হুমরা তাঁর পালক পিতা। তার বিরুদ্ধে আঘাতের হাত তোলা সম্ভব নয়। সন্ন্যাসীর কাছ থেকেও পলায়ন— কারণ নদেরচাঁদের প্রাণদানে তার ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। তার কামলোলুপতা সত্ত্বেও তাকে মহুয়া আঘাত করবে কোন প্রাণে? কিন্তু সদাগরের লোভের বিরুদ্ধে বিষকন্যার বিষনয়ন জ্বলে উঠেছে। মহুয়ার সৌন্দর্যের এক হাতে বিষপাত্র আর অন্য হাতে অমৃতের ভাণ্ড। সদাগরের কামবাসনায় তার বিষপাত্র থেকে মৃত্যুই উপচিয়ে পড়েছে।

মহুয়ার সমাজ-অসংবদ্ধ মুক্তপ্রেম তার চারপাশে এমন একটা বিদ্যুৎগতির সৃষ্টি করেছে, অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা জনশূন্য পর্বত উপত্যকায় অথবা পার্বত্য নদীর তীরে তীরে নদেরচাঁদের অন্বেষণে তার মুক্তচিত্ত সাহসিকতাকে খোদিত করেছে এমন একটা বলিষ্ঠতায় যে গীতিকার মুক্তপ্রেমের জগতে তার জুড়ি মেলা দুষ্কর। কিন্তু এই সক্রিয়তা কেন শেষবারে মহুয়াকে আত্মরক্ষার নতুনতর চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করতে পারল না?

অনেক বিপদ ডিঙিয়ে নদেরচাঁদ-মহুয়ার মিলনের যে সংক্ষিপ্ত চিত্রটি কবি এঁকেছেন তা যেমন কোমল তেমনি করুণ। তার ব্যবহারিকতায়, তার স্খলিত-ভাষণে এদের প্রথম সাক্ষাতের প্রবল উন্মাদনা নেই, আছে দীর্ঘ সংগ্রামের অবসানে একটু নিভৃত শান্তির কামনা-কামনা। এই চিত্রে এক অব্যক্ত ভাষায় আসন্ন ধ্বংসের ছায়াপাত করেছেন কবি। পালঙ-সইয়ের বাঁশীর সুরে যেন ভোরের স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠার খবর আছে। আত্মরক্ষার আর চেষ্টা করে লাভ নেই, তাই নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ। তবে মৃত্যুর মুখোমুখি মহুয়ার কথা : 'সোনার তরুয়া বন্ধু একবার পেখ। / আমার চক্ষু নিয়া নয়ান ভইরা দেখ॥'

কথা নয়, মৃত্যুর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার—'মৃত্যু তুমি নাই!' জীবনের জন্য অমর

কামনার অভিব্যক্তি—'I have immortal longings in me'। সব দিকের বিচারে মহুয়ার শ্রেষ্ঠত্ব গীতিকা সংকলনে অনস্বীকার্য ॥

রূপবতী

রূপবতীর আখ্যানগ্রন্থন নানা ত্রুটিসঙ্কুল পথে আত্মহারা। কাহিনীটির অসম্পূর্ণতাই প্রথমে চোখে পড়ে। অকস্মাৎ যেখানে এর উপরে যবনিকা টেনেছেন কবি, সেখানেই এর স্বাভাবিক সমাপ্তি বলে স্বীকার করতে মন চায় না—

কেবল সমাপ্তিতেই নয়, এই আকস্মিকতা কাহিনীভাগের সর্বত্রই দৃষ্ট। কোন ঘটনাই কাহিনীর প্রবাহকে খুব বেশিদূর অনুসরণ করেনি। ঘটনাগুলির মধ্যে যেন কিছুমাত্র স্থিতিস্থাপকতা নেই, সেগুলি যেন কাহিনীর বৃন্তে বিধৃত হয়নি, উড়ে বেড়াচ্ছে। রূপবতীর রূপের বর্ণনা শুনে নবাব তাকে পাবার জন্য ক্ষেপে উঠল, রাজা চিন্তিত হল, অবাস্তব একটি প্রতিজ্ঞা করে বসল। রানী গৃহ-ভৃত্যের সঙ্গে তার বিবাহ দিল। কিন্তু যে নবাবের হাত থেকে ধর্ম রক্ষা করবার জন্য এতগুলি আকস্মিক ঘটনার মালা গাথা হল, সেই নবাবের লোভ ও লালসার হাত অকস্মাৎই অন্তর্হিত হয়ে গেল। ঘটনাগুলি যেন মেঘখণ্ডের ন্যায় এসেছে এবং চলে গেছে, এদের অনিবার্যতা নেই। সমগ্র কাহিনীটি এই ঘটনাসজ্জায় তাৎপর্যময় হয়ে ওঠেনি। আখ্যানাংশের এরূপ শিথিল-গ্রন্থন আলোচ্য সংকলনের গীতিকাগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না। কারণ বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা মুছে দিয়ে এ গল্প রোমান্স অপেক্ষাও দূরে প্রায় রূপকথার রাজ্যে অপসৃত হয়েছে।

নারীসৌন্দর্য ও ফলে ভাগ্যবিপর্যয় এই কাব্যের মেরুদণ্ড হলেও তা কোথাও খুব স্পষ্ট ও সত্য হয়ে ওঠেনি। রূপবতীর দেহসৌন্দর্যের চমৎকারিত্ব কিংবা নবাবের রূপমোহ ও লালসার চিত্র খুব উজ্জ্বল ও একাগ্র হয়ে ধরা দেয়নি। দ্বিতীয়ত, রূপবতী ও মদনের মধ্যে পূর্বরাগের কোন পরিচয় নেই। এখানেই এই শ্রেণীর অন্যান্য গীতিকা থেকে এদের পার্থক্য স্পষ্ট। মুক্তপ্রেমের যে-চিত্র মৈমনসিংহ গীতিকার কবিরা বারংবার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে তা অনুপস্থিত। কাজেই প্রেমকাব্য হিসেবেও এর মূল্য একান্ত অকিঞ্চিৎকর। তৃতীয়, প্রেম নয় ধর্মরক্ষার প্রশ্নই এখানে প্রধান হয়েছে। ধর্মরক্ষার জন্যই রূপবতীকে মদনের হাতে সমর্পণ করা হল, আর রূপবতীও তাকে সহজেই গ্রহণ করে নিল, ধর্মের নামে স্বামী হিসাবে তার চরণে প্রাণ-মন সমর্পণও করল। মৈমনসিংহ গীতিকার ধারায় তাই এর স্থান একটু ভিন্ন।

রূপবতীর মধ্যে এমন কতকগুলি ভাব-বীজ ছিল যাতে কাব্যটির ট্রাজিক পরিণতির সম্ভাবনাই ছিল অধিক। মিলনান্ত পরিণতি কাব্যটির প্রাণধর্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই মনে হয়। নবাবের রূপমোহ থেকেই রূপবতীর ভাগ্যবিপর্যয়ের সূত্রপাত। কিন্তু বিনা কারণে রূপবতীর উপর থেকে তার লোলুপ-দৃষ্টি

অপসারিত হল। অন্যথা নবাবের এই লালসাই মলুয়া, দেওয়ান ভাবনা প্রভৃতি গীতিকার ন্যায় রূপবতীকেও বেদনার্ত পরিণতিতে সমাপ্ত করত। দ্বিতীয়ত, রূপবতী একটি লোককে স্বামীভাবে গ্রহণ করেছে যে তাদের গৃহভৃত্য মাত্র,—তার সঙ্গে হৃদয়ের কিছুমাত্র পূর্বসম্পর্ক ছিল না। রূপবতীর একধরনের ট্রাজিক হৃদয় ব্যাকুলতা দেখা দিতে পারত। কিন্তু রূপবতীকে ধর্মের নামে সবকিছু স্বীকার করবার ক্ষমতা দিয়ে কবি তার চরিত্রের প্রভূত সম্ভাবনাময় বৈশিষ্ট্যটিকে হেলায় হারিয়েছেন। তৃতীয়ত, রাজা যখন আপন অপমানের জ্বালা নিবারণের জন্য মদনকে হত্যার চেষ্টা করতে লাগলেন, তখনও যে অনিবার্য ট্রাজেডির আশঙ্কা অনুভূত হয় তাও যেন ভোজবাজির মতোই অপসারিত হয়েছে। কাজেই এর মিলনান্ত পরিণতিতে বাহ্যিক উপকরণের যে পরিমাণ সমাবেশ ঘটেছে, চরিত্রবৃত্তি বা ঘটনাগতির আভ্যন্তর তাৎপর্যে সেটুকু আভাসিত হয়নি।

ফলে রূপবতীর চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট রেখায় ধরা পড়ে না। তার মধ্যে কমলার দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা নেই, সুনাই-এর ন্যায় স্বাধীনভাবে স্বামীবরণের সাহসও নেই, আর মহুয়ার ন্যায় মুক্তহরিণীর লঘুপদ-গতিও নেই। তার অনেক কান্না সত্ত্বেও সে একান্ত মামুলী।

কমলা

কাহিনী-গ্রন্থনে কমলা কিন্তু প্রায় ত্রুটিহীন। কারাকুনের চক্রান্তে পিতা-ভ্রাতাসহ কমলার ভাগ্যবিপর্যয় এবং আপন বুদ্ধি ও সৌন্দর্যবলে লুপ্ত সম্পদ ও সম্ভ্রম পুনরুদ্ধারই হল মোটামুটিভাবে কাহিনীর বিষয়বস্তু। লেখক কাহিনীর অধিকাংশই নিয়োজিত করেছেন একদিকে কারাকুনের প্রণয়াভিলাষ, প্রত্যাখ্যান ও প্রতিশোধ গ্রহণে, অন্যদিকে প্রদীপকুমার ও কমলার প্রণয় এবং পিতা ও ভ্রাতার উদ্ধারের মধ্যে। কমলার ভাগ্য-বিপর্যয়ের পরে আরও দুটি ঘটনা কাহিনীর অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে,—মামার বাড়ি থেকে পলায়ন এবং মৈষাল বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ। কিন্তু ঘটনা দুটি কোথাও পল্লবিত হয়ে কাহিনীর অগ্রগমনকে বাধাগ্রস্ত করেনি। মামার বাড়ি কিংবা মামা-মামির কোন বিস্তৃত বর্ণনা নেই, আছে মামার পত্র এবং আত্মমর্যাদা রক্ষায় কমলার নীরবে গৃহত্যাগ,—কমলার জীবন-কাহিনী ও চরিত্রের পরিণতিতে এটুকুই প্রয়োজন। অপর ঘটনাটিও প্রয়োজনানুরূপ সংক্ষিপ্ত। পার্শ্বকাহিনীর একাগ্র একমুখিন সংক্ষেপিত উপস্থাপন সচেতন কবিমানসের পরিচয় বহন করে।

অন্যত্রও এ-পরিচয় দুর্লভ নয়। গল্পের বৃত্তাকার গঠনসৌষ্ঠব সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রারম্ভের পরিপূর্ণ সুখ ও আনন্দ থেকে বিপর্যয়ের ঘন অন্ধ তমিস্রা ভেদ করে আবার পরিপূর্ণতর সুখ ও আনন্দে প্রত্যাবর্তনে—এমন কি দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী কাহিনী-উপকাহিনীরও—বৃত্তাকার অনুবর্তন লক্ষণীয়। কারাকুনের লালসা-লোলুপ দৃষ্টি কমলার উপরে, সে দূতী নিয়োগ

করল, দূতী হল প্রত্যাখ্যাত,—কারাকুন প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করল। কমলার অজ্ঞাতেই তার জীবনচর্চা ধীরে ধীরে প্রারম্ভের আনন্দ ও সুখ থেকে বিচ্যুত। তারপর বিপদের কালোমেঘ আরও ঘনিয়ে উঠেছে, কমলার পিতা ও ভ্রাতা বন্দী হয়েছে, কারাকুনের অত্যাচার থেকে বাঁচবার চেষ্টায় মাতা-কন্যাকে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু আরও বিপদ অবশিষ্ট ছিল। মিথ্যা দুর্নামের হাত থেকে আপনার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে সেই শেষ আশ্রয়টুকু ত্যাগ করতেও বাধ্য হতে হল। ভাগ্যবিপর্যয়ের এ এক চরম অবস্থা,—অন্তত কমলা গল্পে এইটিই climax। এর পরে গোপালকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ। গল্পের গতি খুব ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বৃত্তের অপরার্ধে পরিক্রমা শুরু করেছে। হঠাৎ এক শুভ প্রভাতে মুস্কিল আসান এসে তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেয়নি। ধীরে ধীরে ঘটনা আপন অনিবার্যগতিতে এগিয়েছে, আর কমলার সক্রিয় ভূমিকা প্রতিটি ঘটনার সুযোগ্য ব্যবহারে ক্রমেই আপন পরিপূর্ণ প্রাপ্তির নৈকট্য পেয়েছে। কেবল কাহিনীর গতিপ্রবাহেই এই গোলাকৃতি সম্পূর্ণতা নেই, সুরের উত্থান-পতন, উল্লাসের দ্রুত লয়ে ও বেদনার বিলম্বিতেও এরই দ্যোতনা। হাস্য-কৌতুক রস-রহস্য থেকে গম্ভীর বিষন্নতা, সুগভীর সহনশীলতা এবং সমাপ্তির আনন্দোজ্জ্বল প্রসন্নতা। কমলার প্রণয় ব্যাপারটি কাহিনীর শেষের দিকে উপস্থাপিত হওয়ায় 'নতুনতর ভাব কেন্দ্রের বিলম্বিত উপস্থিতি' [late introduction of new purpose] বলে আপত্তি করা চলে। কিন্তু সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হবে যে প্রদীপকুমার কমলার জীবনে যত বড়ভূমিকাই গ্রহণ করুক, কমলার যে কাহিনী এখানে পরিবেশিত, তাতে তার প্রণয় থিমের অংশমাত্র। কমলার কাহিনী এক বীর্যময়ী নারীর সর্ববিঘ্ন-বিপর্যয় উত্তীর্ণ হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী—প্রদীপকুমারের সঙ্গে তার প্রণয় এরই একটি অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় মাত্র। তাই তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কমলা-বৃত্তান্ত পূর্বতন খাত পরিত্যাগ করে নব পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েনি। কমলার লেখক গল্প বলতে জানেন, কাহিনীর সচেতন গ্রন্থন-নৈপুণ্যে তারই প্রমাণ।

চিকণ গোয়ালিনীর চরিত্রটি বিস্তৃত পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে। রচনার কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত না থাকায় বিদ্যাসুন্দরের হীরা মালিনী অথবা কমলার চিকণ গোয়ালিনী কে কার পূর্বসূরী বলার উপায় নেই। তবে এ জাতীয় চরিত্রের জড় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াই বুড়িতে গিয়ে ঠেকতে পারে বলে মনে হয়। মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রাপ্ত অনেকগুলি গীতিকায় এ ধরনের চরিত্র-পরিকল্পনার পরিচয় মেলে। হয়ত গ্রামীণ সমাজজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এদের পরিকল্পনা। ভারতচন্দ্র এই গ্রামীণ অমার্জিত পরিকল্পনাকে সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু চিকণ গোয়ালিনীর চিত্রটি হীরামালিনীর পাশে দাঁড করালে শিল্পকর্মের বিচারে নেহাৎ অযোগ্য বিবেচিত হবে না। বিশেষ করে 'মলুয়া' কাব্যের নিতাই কুটনীর সঙ্গে তুলনা করলেই চিকণের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয় হবে।

চিকণ বিচক্ষণ ব্যবসায়ী, নারীদেহের ব্যবসায়ে সে সিদ্ধিলাভ করেছে। তার বিচক্ষণতা লোকমুখে অলৌকিকতার দ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে গৃহস্থের স্ত্রী-কন্যাদের কুলত্যাগের ব্যাপারে তার ভোজবাজি আর যাদুবিদ্যার অব্যর্থতা মানুষের ভীতিপূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করেছে। কমলাকে পাপকুণ্ডে নিমজ্জিত করবার জন্য যে চাতুর্যময় বক্রপন্থার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছিল তাতেই প্রমাণ তার সম্বন্ধে লোকশ্রুতির ভিত্তিতে কতটা সত্য ছিল। কমলা অতি সরল কৌতুকের সঙ্গে যখন বলল : 'পূর্ব-জন্ম কথা মোর শুন দিয়া মন। / স্বর্গেতে আছিনু মোরা রতি আর মদন॥ / শাপেতে পড়িয়া জন্ম মানুষের ঘরে॥। মানুষের সাধ্য নাই মোরে বিয়া করে॥ / দেখহ আমার রূপ চান্দের কিরণ। / আমারে ভোগিতে নাই মানুষ এমন॥ / সেই মনে চিন্তা করি বিরলে বসিয়া। / ধরায় থাকিব কেমনে মদনে ছাড়িয়া॥'

চিকণ কিন্তু এই সহজ সরল কৌতুককে আপন হীন প্রয়োজনের কটাহে গালিয়ে নিল : 'গোয়ালিনী কয় কন্যা শুন মোর কথা। / সত্য কহিবাম যত না হইবে অন্যথা॥ / একদিন দই লইয়া যাই স্বর্গপুরে। / পন্থেতে লাগাল পাই তোমার মদনেরে॥ / তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া। / আশমানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া॥ / মদন কহিছে তুমি থাক মর্তপুরে। / একদিন নি দেখিয়াছ আমার রতিরে॥ / দই দুধ বেচ তুমি যাও রাজার বাড়ী। / রতির বিরহানলে আমি জইল্যা মরি॥...... / আমি কইলাম রতি তোমার রাজার ঘর আলা। / জনম লইয়াছে কন্যা নামেতে কমলা। / বাড়ীঘরের কথা কইলাম বাপ-মায়ের নাম। / উবুৎ হইয়া মদন করে আমারে পন্যাম॥ / একখানি পত্র মদন যত্নেতে লিখিয়া। / যত্ন করি আঁচে মোর দিয়াছে বান্ধিয়া॥'

মদনের পত্র বলে সে কারাকুনের প্রস্তাবটি কমলার হাতে তুলে দিল। অননুকরণীয় বক্র সরস বাচনভঙ্গি এবং ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চাতুর্য এই হীনমনা ঘৃণ্য নারীকে সাহিত্যিক রসের দরবারে উচ্চ আসনে বসিয়ে রাখবে।

কমলা উপযুক্ত নায়িকা-চরিত্র। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত নিঃসন্দেহে সে-ই কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রধান নিয়ন্ত্রা শক্তি। সমগ্র কাহিনীতে কমলার doing ও suffering-ই সর্বাধিক। এবং তারই সচেতন সক্রিয়তা suffering থেকে উদ্ধারের কারণ আর বিপন্মুক্তির পটভূমিকায় তার হাস্যোজ্জ্বল সর্বকামনা-চরিতার্থতায় কমেডির রস নিষ্পত্তি। কমলাই কাব্যের নায়িকা [কিংবা নায়ক], এ কাব্যের কোন নায়ক নেই, বিরোধী শক্তি হিসেবে কারাকুনের এবং গৌণ সাহায্যকারী হিসেবে প্রদীপকুমারের ভূমিকা নিঃশেষিত। মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় এ-জাতীয় চরিত্র-কল্পনা আমাদের বিস্ময় জাগায়। তার চরিত্রে মুক্তপ্রেমের আদর্শই জয়যুক্ত নয়, পরিবারতন্ত্রের নানা প্রয়োজনে ও কর্তব্যে তার প্রেম সংযম-কঠোর এবং যুক্তিসীমিত। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান, দৃঢ়তর সংযম ও নিষ্ঠা

এবং দৈবের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামের দুঃসাহসী অটলতায় কমলা চরিত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কিন্তু ব্যক্তিত্ববোধক এই গুণধর্মের সমন্বয়ে সে তার যৌবনাবেগ বিস্মৃত নয়। যৌবনচেতনার বিচ্ছুরিত রসকৌতুকে তার স্বাতন্ত্র্য আরও স্পষ্টভাবে চিত্রিত।

কমলাকে সার্থক কমেডি হিসেবে অভিনন্দিত করা চলে। কমলার দেহ-সৌন্দর্য যেমন তাকে বিপদের গভীরে নিক্ষেপ করেছে তেমনি মহত্তর সার্থকতায়ও প্রতিষ্ঠিত করেছে, বিশেষ করে কমলার জীবনের বিপর্যয়ের কারণগুলি বহিরাগত। কামিনীর জন্য কারাকুনের ষড়যন্ত্র কাঞ্চনলাভে নিষ্ক্রিয়—এই তো স্বাভাবিক। রূপবতীর ন্যায় এর চরিত্রগত অন্যতর কোন তাৎপর্য নেই। সর্বোপরি কমলার চরিত্রবৈশিষ্ট্য, বিশেষত রহস্য-মধুরতা গল্পটির আবহাওয়াকে অনেকাংশে কমেডির উপযোগী করে তুলেছে।

দস্যু কেনারামের পালা

কেনারামের পালা তার ভাববস্তুর অভিনবত্বে সহজেই আমাদের হৃদয়াকর্ষণ করে। মৈমনসিংহ গীতিকায় সংকলিত পালাগুলি প্রেমকেন্দ্রিক। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার অন্য পালাগুলিতে বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য আছে। কেনারামের পালায় মানবজীবন ও চরিত্রের উপর কাব্যরসের সুগভীর প্রভাব কাহিনী-আকারে বিবৃত হয়েছে।

কেনারাম নামক দস্যুর জীবনের যে পরিবর্তনের চিত্র এখানে অঙ্কিত তার পরিকল্পনায় রত্নাকরের ঋষি বাল্মীকিতে রূপান্তর-কাহিনীর প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়। তবে কেনারাম-কাহিনীর বিশেষত্ব এখানে যে তার চরিত্রবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যরসের এক অপূর্ব অলৌকিক প্রভাবের ব্যঞ্জনা পাঠকমনে দানা বেঁধে ওঠে। বাল্মীকি-কাহিনীতে রামনামের প্রভাবের ধর্মীয় তাৎপর্য যে পরিমাণ মহিমান্বিত করবার চেষ্টা হয়েছে, কেনারামে তা মিলবে না। কেনারামের চিত্তে মনসা দেবী সম্পর্কীয় কোন একটা ধারণা সঞ্চারিত করবার চেষ্টা কাব্যমধ্যে আছে; তবে তার আত্যন্তিক মূল্য নেই। কাব্যসৌন্দর্যই যে মূলত এর জন্য দায়ী তা বর্ণনা সৌকর্যে সত্য হয়ে ওঠে।

কাহিনীতে ঘটনা বাহুল্য নেই। একমাত্র মনসার ভাসানগান একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। চবিত্রবিকাশে এর গুরুত্ব যতই থাক, আত্যন্তিক দৈর্ঘ্যে কাহিনী-সংহতির হানি ঘটেছে। পরবর্তী পালাগায়েনরা এই দৈর্ঘ্যের জন্য দায়ী কি না এমন সন্দেহ একেবারে অকারণ না-ও মনে হতে পারে। তবে লেখিকা মূলেও ভাসানগানের খানিকটা অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। কেনারামের চরিত্রের এইরকম আমূল পরিবর্তনের আকস্মিকতাকে কালগত বিস্তৃতিতে কিছুটা যুক্তিসঙ্গত করে নেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ভাসানগান বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কেনারামের চিত্তগত প্রতিক্রিয়া-সম্পর্কেও মন্তব্য লক্ষণীয়। তবে একথা নিঃসংশয়িত যে কোনও যুক্তিবলেই এই অতিরিক্ত বিস্তৃতি সমর্থনীয় নয়, কারণ সংহত রসাবেদন এর দ্বারা শিথিল হয়ে পড়েছে।

এ-পালায় দুটি মাত্র চরিত্র। বংশীদাস কবি রচয়িতার পিতা। কবি-কন্যা কবি-পিতার চরিত্র এঁকেছেন, তথ্য হিসেবে এটি কৌতূহলোদ্দীপক। বংশীদাসের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত কিন্তু উজ্জ্বল। কেনারাম যখন খাঁড়া হাতে সামনে দাঁড়াল, শিষ্যরা ভয়ে কাঁপতে লাগল, দস্যু অহঙ্কৃত বচনে জিজ্ঞাসা করল : 'কেমন, ঠাকুর তুমি চেন কি আমারে ?' দ্বিজবংশী অকম্পিতকণ্ঠে উত্তর করলেন : 'পাপেরে দেখিয়া বল কেবা নাহি চিনে ?'

সংক্ষিপ্ত দুটি কথায় নির্ভীক সাধক-কবির যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যের কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচয়ের দিক থেকে সুন্দর ও সার্থক। যখন দস্যুর হাতে জীবনের যবনিকা আকস্মিকভাবে পতনোন্মুখ, কবি শেষবারের মতো স্বরচিত ভাসান গাইতে চাইলেন। আপন রচনার সঙ্গে কবির সচেতন শেষ সম্পর্কের কারুণ্যজড়িত চমৎকারিত্ব মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তিতে জীবন্ত করে তুলেছেন কবি।

কেনারাম কাহিনীর মেরুদণ্ড। চরিত্রটি dynamic। ঘটনার উত্থান-পতন একে একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। কেনারাম মনসার বর-পুত্র। ভক্তচিত্তের এই উল্লেখের কাহিনী ও চরিত্রগত কোন গুরুত্বই রচনা-মধ্যে অনুসৃত হয়নি। কেনারামের জীবন-প্রবাহ-নিয়ন্ত্রণে এই দেবীটির কোনই হাত ছিল না, সবটাই তার স্বভাব ও পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ঘটেছে।

কেনারাম বাল্যবয়সেই মাতাকে হারিয়ে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। দুর্ভিক্ষের সময় শিশু কেনারামকে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। এই পরিবারের সাতটি পুত্রই ডাকাত। ফলে : 'থাকিয়াত কেনারাম তাদের সহিত। / অল্পেতে হইল এক মস্ত ডাকাত॥' বাস্তব পরিবেশ-বিশ্লেষণাত্মক মনস্তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে যেন কেনারাম-চরিত্রের এই প্রারম্ভ-অংশটি রচিত।

কেনারাম ডাকাত হল। নরহত্যা তার পেশা—বরঞ্চ বলা চলে নেশা—হয়ে দাঁড়াল। সমগ্র 'জালিয়া হাওর' তার ভয়ে কাঁপতে লাগল। কেনারামের নরহত্যার পিছনে অর্থলোভ নেই—আছে এক প্রচণ্ড জীবন-বিরোধী চেতনা। জীবনের কাছ থেকে সে যা পেয়েছে চরম আক্রোশে দিয়ে চলেছে যেন তারই প্রতিদান : 'বাঘ যেমন মারে জন্তু খেলিয়া খেলিয়া। / এহি মতে মারে দুষ্ট মানুষ ধরিয়া॥'

কিন্তু এর মধ্যেও কেনারাম চরিত্রের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের বীজ উপ্ত রয়েছে। সংসারের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে কোন স্নেহের সম্পর্ক রচনা করেনি কেনারাম, অর্থ-সম্পদের সঙ্গে নেই তার কোন প্রয়োজনের, কোন লোভের সম্পর্ক। একদিকে এই নির্লোভ, নিরাসক্ত মন আর অপরদিকে মানবজাতির প্রতি চরম ঘৃণাজাত প্রচণ্ড হিংসা। নরহত্যাজাত একটি কড়িও গ্রহণ করে না কেনারাম। সে বলে : 'না দেখে মানুষ জন বনের পশুপাখী। / যার ধন তার কাছে লুকাইয়া রাখি॥'

বংশীদাস অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কার ধন, আর কার কাছেই বা লুকিয়ে রাখ ? উত্তরে : 'কে না কহে, এ ধন সকলি মাটির। / মাটিতে লুকাইয়া রাখি বুদ্ধি

স্থির ॥ মাটিতে মিশিয়া ধন যাউক মাটি হইয়া। / মানুষ যেন নাহি পায় সে ধন খুঁজিয়া ॥

দুর্দান্ত এই নরঘাতকের মনে পার্থিব ভোগলালসার বিরুদ্ধে আসক্তিহীনতার এমন একটি স্পষ্ট সুর যদি না থাকত তা হলে অজস্র ভাসানগানের সৌন্দর্যও তার চরিত্রে পরিবর্তন আনতে পারতে না।

কেনারামের মনে শেষদিকে একটু পাপভীতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে সাহিত্যরসের অলৌকিক চমৎকারিত্বের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণই ব্যঞ্জিত হচ্ছে এখানে। দ্বিজ বংশীর গানে কেনারামের কাছে জীবনের অবগুণ্ঠিত একটি দিক খুলে গেল। এ এক নতুন জগৎ। জীবনের কঠিনতম বেদনার অশ্রুও এখানে আনন্দ-রসের নিটোল মুক্তা হয়ে জমে উঠেছে। এ রাজ্যে তাই কেবল মাধুর্য আর সৌন্দর্য। হিংসা-কুটিল, ধিক্কার, লাঞ্ছনার পুরনো জীবন সে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো পরিত্যাগ করল, হাতে তুলে নিল সুরে বাঁধা একতারা। মনসাভক্তির যে দু-একটি কথা আছে তা বাচ্যার্থেই সীমাবদ্ধ। ফলে মানবচিত্তের পরিচয় এবং শিল্পের সৌন্দর্য-স্ফুরণে দ্বিধা অল্প।

কাজলরেখা

এটি একটি রূপকথা। দীনেশবাবু এর নাম দিয়েছেন গীতিকথা। 'রূপকথা' নামটির মধ্যে কল্পনার ঐশ্বর্য ও বহু-ব্যবহৃত ভাবানুসঙ্গের যে ব্যঞ্জনা আছে 'গীতিকথা' শব্দটির মধ্যে তা নেই, কিন্তু এ নামটি এ-জাতীয় কাব্যের আঙ্গিকগত একটি বিশিষ্ট পরিচয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। গীতিকা-সাহিত্যের সঙ্গে এর আঙ্গিকের পার্থক্যটি সহজেই লক্ষণীয়। গীতিকা ও গীতিকথার আঙ্গিকগত পার্থক্যের প্রধান কারণ এদের জন্মের পরিবেশগত বিভিন্নতা ও পাঠক-শ্রোতাদের শ্রেণীগত পার্থক্য। গীতিকাগুলি গ্রামীণ মানুষের আসরে গীত হত, গীতিকথার আসরে শিশু-কিশোরদের একাধিপত্য, সেখানে কোন সঙ্গীত-শিক্ষিত গায়েন, দোহার ও বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ ছিল না। কাজলরেখা গীতিকথাটির প্রারম্ভেই সভাজনের নিকট আবেদনের যে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আছে মূল রূপকথার সঙ্গে তার কিছুমাত্র যোগ আছে বলে মনে হয় না। ঠাকুরমা-দিদিমার গীতশিক্ষা-অনভিজ্ঞ কণ্ঠই যথেষ্ট মূল্যবান বলে বিবেচিত হত। শিশুদের প্রাণে বৈচিত্র্যের চাহিদা সমধিক। তাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে হলে যেমন ঘটনার তেমনি বর্ণনাভঙ্গির বারবার পরিবর্তন প্রয়োজন। একটানা গদ্যের নীরসতা ও একটানা পদ্যের স্তিমিত ঘটনাহীনতা থেকে বাঁচবার জন্যই রূপকথার কথকরা গদ্য-পদ্যের মিশ্রিত আঙ্গিকের দিকে ঝুঁকেছিলেন বলে মনে হয়।

'কাজলরেখা'র কথন-ভঙ্গি একটু অনুসরণ করলেই এই গদ্য-পদ্য ব্যবহার পদ্ধতির পিছনে কিছুটা শিল্পবুদ্ধির পরিচয় মিলতে পারে। গল্পটি যখন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তখন গদ্য-কথনভঙ্গিই গ্রহণ করেছেন বক্তা। আবার কথোপ-

কথনের যে অংশে নায়ক-নায়িকার আত্যন্তিক বেদনা বা আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে কিংবা কাহিনীর যেসব স্থানে কথক তাঁর হৃদয়ের সব আলো ফেলতে বা শ্রোতাদের সমগ্র মনোযোগ ও সংবেদনা আকর্ষণ করতে চেয়েছেন সেখানে কবিতার ছন্দস্পন্দের আশ্রয় অনিবার্য হয়ে উঠেছে ; যদিও এ ব্যাপারে সচেতন শিল্পবুদ্ধির প্রয়োগ সর্বত্র ঘটেনি।

গীতিকথায় প্রযুক্ত গদ্যভাষাও বিশেষ আলোচনার সামগ্রী। অবশ্য কাজলরেখা প্রভৃতি রচনার গদ্য লোকের মুখে মুখে বহু পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে, কাজেই তার মূল চেহারা সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। যা হোক, এই গদ্যভাষার মধ্যে এমন একটা সহজ সাবলীল গতি আছে যা রূপকথার রূপনির্মাণে বিশেষ উপযোগী। এ গদ্যকবিতার অনেকটা কাছাকাছি। এর মধ্যে যেন একটা ছন্দের স্পন্দন শোনা যায়।

মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রহে এই একটিমাত্র রূপকথা স্থান পেয়েছে। এর সঙ্গে অন্যান্য কাব্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। শিশুদের জন্য উদ্দিষ্ট এই রচনায় কল্পনা-কাল্পনিকতা এবং বাস্তবের সীমারেখা মুছে গেছে। আর গীতিকা-গুলিতে রোমান্স-সুলভ কবিকল্পনার প্রাচুর্য থাকলেও বাস্তবের সঙ্গে তার সমস্ত যোগ ছিন্ন হয় না। সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন আছে, প্রাপ্য-অপ্রাপ্যের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা হয়েছে। কারণ এর রস-উপভোক্তার জীবন-অভিজ্ঞতা ব্যাপকতর, গভীরতর।

কাজলরেখায় একের পর এক অসম্ভব ঘটনা ঘটেছে। কথায় কথায় সদাগর এবং রাজার ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছে। সূচ-রাজার মৃত্যু ও জীবনলাভ সবই তো আমাদের দৃষ্টিতে একান্ত অবাস্তব। ধর্মমতি শুক যতই অলৌকিক বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় দিক তাকে সত্য বলে কোন্ বয়স্ক লোক স্বীকার করবে? অপরপক্ষে সোনাই ও মহুয়ার আত্মদান নিত্যকার ঘটনা না হলেও, কল্পনার কিছুটা রঙ্ লাগলেও, তা বাস্তব। কেনারামের মতো দস্যুর গান শুনে পরিবর্তিত হবার কথা সচরাচর শোনা যায় না, কিন্তু কেনারাম পালার ঘটনা ও চরিত্র-বিবর্তন সম্পূর্ণ সত্য [convincing] বলেই মনে হয়। লীলা ও মদিনা প্রিয়তমের বিরহে যে প্রাণত্যাগ করল—তার মধ্যে কবি-কল্পনার লীলা আছে ঠিকই, কিন্তু একে রূপকথার অবাস্তবতায় ঠেলে দিতে বোধ হয় কেউই রাজি হবে না।

বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কাজলরেখার পরিণতিতে সর্বব্যাপী আনন্দ থাকবেই। জীবনে যে আদর্শ সুখ দূরবর্তী রূপকথায় তারই খোঁজ মেলে। কিন্তু জীবনানুগ কাব্য-কথায় বেদনার্ত পরিসমাপ্তিকে অনেকসময়ই পরিহার করা যায় না। মৈমনসিংহ গীতিকার অনেক কবিতায়ই তার প্রমাণ মিলবে।

কাজলরেখার উপর নিয়তির অকারণ-উদ্ভত ক্রোধ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কাজলরেখার কি অপরাধ জানা যায় না, কিন্তু বারো বৎসর ধরে শাস্তি তাকে ভোগ

করতেই হবে। এই দুঃখ-জাল ছিন্ন করার চেষ্টা করলে তার দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। কাজলরেখাও নিয়তির এই প্রত্যাদেশকে মেনে নিয়েছে। কর্মফল বা জন্মান্তরবাদের চিন্তামাত্র এখানে নেই। গীতিকায় এ জাতীয় নিয়তিবাদ বা তার কাছে আত্মসর্পণের অবতারণা নেই। নারী সেখানে সমগ্র বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে—নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, তাকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছে—কখনও কমলার মতো সিদ্ধিলাভ, কখনও মহুয়ার মতো আত্মবিসর্জন করেছে। অবশ্য লীলা বা মদিনার মত আত্মঘাতী তপশ্চর্যা ও সহনশীলতা রূপকথার নায়িকা কাজলরেখার মধ্যেও মেলে। কাজেই মনে হয় রূপকথা আর গীতিকার নারীরা মূলত একই ধাতুতে গড়া।

রূপকথার বিশেষ রস-বিচারে কাজলরেখা সার্থক সৃষ্টি।: ধর্মমতি শুকের ভবিষ্যদ্বাণী যে আসন্ন বিপদের ঘনঘটায় শিশুচিত্তকে ভারাক্রান্ত করে তা-ই বনমধ্যে নায়িকার নির্বাসন, মন্দিরমধ্যে তার প্রবেশ ও সূচবিদ্ধ রাজপুত্র-দর্শন প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে যখন নিবিড়ভাবে ঘনিয়ে ওঠে তখন যে তার কৌতূহলবৃত্তি বিশেষভাবে চরিতার্থ হয়, তাতে সন্দেহ নেই।

□